রবিনসন ক্রুসো

ড্যানিয়েল ডিফো

রূপান্তর: নিয়াজ মোরশেদ

প্রথম প্রকাশ:১৯৮৪

এক

১৬৩২ সালে, ইয়র্ক শহরের এক ভদ্র পরিবারে আমার জন্ম। আমার বাবার আসল বাড়ি ছিলো ব্রেমেন-এ। সেখান থেকে ইংল্যাণ্ডে চলে এসে প্রথমে হাল-এ বসতি করেন তিনি। বিদেশী হওয়া সত্ত্বেও কয়েক বছরের ভেতরেই নিজের ব্যবসা দাঁড় করিয়ে ফেলেন বাবা। হাল-এ যখন রমরমা অবস্থা, তখন বিয়ে করেন। বিয়ের পর হঠাৎ করেই ব্যবসাপাতি গুটিয়ে ইয়র্ক-এ চলে আসেন এবং স্থায়ী ভাবে বসবাস শুরু করেন।

তিন ভাইয়ের ভেতর আমি সবচেয়ে ছোট। স্বভাবতই মা-বাবার আদরের বেশির ভাগই আমার কপালে জোটে। ফলে বখে না গেলেও, কোনো কম্মেরই হলাম না আমি। নানারকম উদ্ভট চিন্তা-ভাবনা গিজ গিজ করে মাথার ভেতর। সমুদ্র আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। বাবার ইচ্ছে আমি আইন পড়ি, কিন্তু আমি চাই সমুদ্রে যেতে। জাহাজে করে দুনিয়ার বন্দরে বন্দরে ঘুরে বেড়ানোর কথা ভাবলেই শিহরণ খেলে যায় শরীরে। দু'একবার বাবার কাছে বলেছিও কথাটা। কিন্তু বাবার এক কথা, 'উঁহু, ওসব ভাবনা ছাড়ো। বাড়িতে থেকে, আমি যেভাবে বলি, সেভাবে জীবনটাকে গড়ে নিতে হবে তোমার।'

আপাতত বাবার কথা মেনে নিলেও, মনে মনে আমি অজানার হাতছানি আগের মতোই দেখতে লাগলাম। শেষ পর্যন্ত পৃথিবীকে দেখবার ও জানবার আকাঙ্ক্ষা আমাকে এমন ভাবে পেয়ে বসলো যে, লেখাপড়া সব মাথায় উঠলো।

আঠারো পেরিয়ে উনিশে পড়লাম। এখনো কোনো কাজকর্মে লাগিনি আমি। আমার দ্বারা যে আইন পড়া হবে না তা অনেক আগেই বুঝে ফেলেছেন বাবা. সুতরাং ও নিয়ে আর কথা বাড়ান না। কিন্তু প্রতি মাসেই এক বা দু'বার আমাকে ডেকে নিয়ে নিজের কামরায় বসান। জিজ্ঞেস করেন, 'আর কতদিন এভাবে চলবে, বব? লেখাপড়ার পাট তো চুকিয়েছ, এবার কিছু একটা কাজের চেষ্টা দেখ। আর কিছু না হোক, আমার অফিসে এসে বসলেও তো পারো।'

আমি 'কানে দিয়েছি তুলো, পিঠে বেঁধেছি কুলো' ভাব করে দাঁড়িয়ে থাকি।

'বুঝতে পেরেছি, আমার হাড় জ্বালিয়ে খাবে তুমি,' শেষ পর্যন্ত খেঁকিয়ে ওঠেন বাবা। 'দূর হও আমার সামনে থেকে।'

আমিও এটাই চাই। নিঃশব্দে বেরিয়ে আসি।

দিন যাচ্ছে। সমুদ্রে যাওয়ার চিন্তাটা ক্রমেই ফেনিয়ে ফেনিয়ে পাকিয়ে উঠছে মাথার ভেতর। জানি, বাবার অনুমতি পাবো না কোনোদিন। তা হলে উপায়? উপায় একটাই, বাড়ি ছেড়ে পালানো। ঠিক করে ফেললাম, প্রথম সুযোগেই

পালাবো, যা হয় হবে।

কয়েক মাস পরেই সুযোগ এসে গেল। হাল-এ গিয়েছিলাম বেড়াতে। জাহাজঘাটার কাছ দিয়ে আসছি। নাবিকদের এক সরাইখানার সামনে হঠাৎ করে দেখা হয়ে গেল ছেলেবেলার এক বন্ধুর সাথে। পরদিনই ওর বাবার জাহাজে করে লণ্ডন যাবে সে।

অনেকক্ষণ আলাপ করলাম ওর সাথে।

'আমার সঙ্গে চলে এসো, বব,' সরাসরি প্রস্তাব করলো ও। 'এক পয়সাও খরচ হবে না তোমার।'

আশাতীত প্রস্তাব। সঙ্গে সঙ্গে আমি রাজি হয়ে গেলাম। বাড়ি যাওয়ার বা মা-বাবাকে জানানোর কোনো প্রয়োজন বোধ করলাম না। ১৬৫১ সালের পহেলা সেপ্টেম্বর এক অশুভ মুহূর্তে লণ্ডনের পথে জাহাজে চেপে বসলাম।

এমনই কপাল, জাহাজটা বন্দরের নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের গতি বাড়তে শুরু করলো। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে রীতিমতো ঝড়ের রূপ নিলো বাতাস। ঢেউগুলো পাহাড়ের মতো চেহারা নিয়ে ভেঙে পড়তে লাগলো জাহাজের পাটাতনের ওপর। ভয়ানক দুলতে লাগলো জাহাজ। এর আগে কখনো জাহাজে চড়িনি। তাই দুলুনি আর ঢেউয়ের ভয়ঙ্কর চেহারা দেখে এমন ভড়কে গেলাম যে মনে হতে লাগলো, এখনই যদি কোনোমতে মায়ের কোলে ফিরে যেতে পারতাম! সমুদ্রপ্রীতি, পৃথিবীকে দেখবার-জানবার আকাঙ্ক্ষা কোথায় পালিয়েছে!

ঝড় কমার কোনো লক্ষণ নেই। উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে বাতাসের গতি। বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারলাম না দুলুনি। গা গুলাতে লাগলো। তারপর শুরু হলো বমি। কয়েক বার বমি হতেই একেবারে কাহিল হয়ে পড়লাম। চেতন-অচেতনের মাঝামাঝি একটা অবস্থায় ঝুলে রইলাম আমি।

পরদিন সকালে থামলো ঝড়। সারারাত নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলো সবাই, আমার দিকে মন দেওয়ার অবসর পায়নি কেউ। সমুদ্র শান্ত হওয়ার পর বন্ধুর চেষ্টায় সুস্থ হয়ে উঠলাম। এই প্রথম এবং এই শেষ, এরপর আর কখনো সমুদ্রপীড়ায় কাবু হইনি আমি।

সমুদ্র শান্ত হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে, আমার পুরোনো অনুভূতিগুলো ফিরে আসতে লাগলো। বাড়িতে ফিরে যাওয়ার কথা ভুলে গেলাম। মনে মনে বললাম, 'এ-ই আমার নিয়তি; সমুদ্রে কাটবে আমার জীবন।'

পাঁচদিন কেটে গেছে। সেই ঝড়ের পর থেকে এ পর্যন্ত নিরুপদ্রবেই এসেছি। ছ'দিনের দিন ইয়ারমাউথ-এর কাছে নোঙ্গর ফেলতে হলো আমাদের। হঠাৎ করেই উল্টো দিক থেকে প্রবল বাতাস বইতে শুরু করেছে। যতক্ষণ পর্যন্ত না বাতাসের দিক বদলাচ্ছে ততক্ষণ আর এগোনো যাবে না।

পুরো পাঁচদিন নোঙ্গর ফেলে, পাল গুটিয়ে বসে রইলাম আমরা। ইতিমধ্যে আরো কয়েকটা জাহাজ নোঙ্গর ফেলেছে আমাদের আশপাশে। এখনো উল্টো দিক থেকে বয়ে চলেছে জোর হাওয়া। জাহাজের ক্যাপ্টেন–আমার বন্ধুর বাবা, প্রতিদিনই আশার বাণী শোনাচ্ছেন, কাল হয়তো অনুকূল বাতাস পাওয়া যাবে। কিন্তু কোথায় কি, সাতদিন পেরিয়ে গেল একভাবে বসে থেকে।

আট দিনের দিন সকালে বাড়তে শুরু করলো বাতাসের গতি। গোটানো পালগুলো নামিয়ে আনার নির্দেশ দিলেন ক্যাপ্টেন। বুঝতে পেরেছেন গতিক সুবিধার নয়। দুপুর নাগাদ মারাত্মক রকম অশান্ত হয়ে উঠলো সমুদ্র। মাস্তুলগুলোও নামিয়ে আনবেন কিনা ভাবতে লাগলেন ক্যাপ্টেন। নোঙ্গরের রশিগুলো টান টান হয়ে উঠেছে। কেবলই মনে হচ্ছে, এই বুঝি উল্টোপাল্টা বাতাসে নোঙ্গর ছিঁড়ে ছুটতে শুরু করলো জাহাজ।

দুশ্চিন্তায় শুকিয়ে গেছে ক্যাপ্টেনের মুখ। জাহাজটাকে বাঁচানোর চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠেছেন ভদ্রলোক। কিছুক্ষণ পরপরই একবার নিজের কেবিনে ঢুকছেন আবার বেরিয়ে আসছেন। বিড় বিড় করে কি যেন বলছেন। প্রার্থনা করছেন সম্ভবত।

কেবিনে শুয়ে শুয়ে প্রার্থনা করছি আমিও। একটু পরপরই ঢেউ আছড়ে পড়ার ধাক্কা অনুভব করছি। সেই সঙ্গে অনবরত দুলুনি। এখনো 'একবার কেবিন একবার ডেক,' করে চলেছেন ক্যাপ্টেন। একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছেন যেন। কিন্তু যখন অসহায় মুখে আমার মতো আনাড়ীর কেবিনে এসে ঢুকলেন তখন বুঝতে বাকি রইলো না, আর আশা নেই। তাড়াতাড়ি কেবিন ছেড়ে বেরিয়ে এলাম ক্যাপ্টেনের পেছন পেছন। যা দেখলাম তাতে আতঙ্কিত না হয়ে পারলাম না। কেবিনে ঢোকার আগে ঢেউয়ের আকার যা দেখেছিলাম এখন তার চেয়ে চার-পাঁচ গুণ বড় হয়েছে। প্রতি তিন বা চার মিনিট পরপরই এ রকম পর্বতপ্রমাণ একেকটা ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে ডেকের ওপর। কেবিন থেকে বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে পুরো ভিজে গেলাম। হাওয়ায় ভেসে আসা পানির বিন্দুগুলো সুঁচ ফোটাতে লাগলো চোখেমুখে। বাতাসের ঝাপটায় তাকাতে পারছি না ভাল করে। অনেক কষ্টে আশপাশের জাহাজগুলো দেখলাম—আমাদের চেয়ে মোটেই ভাল নয় ওদের অবস্থা। দুটো জাহাজ, মাস্তুল কেটে ফেলেছে। এক নাবিকের কাছে শুনলাম, কিছুক্ষণ আগে একটা জাহাজ সাহস করে পাল তুলে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলো। মাইলখানেক যাওয়ার আগেই উল্টে গেছে সেটা। আমাদেরও যদি সেই অবস্থা হয়? শিউরে উঠলাম কথাটা ভেবে। কেবিনে ফিরে আসার জন্যে পা বাড়াতে যাবো এমন সময় দেখলাম, মাস্তুল কাটা জাহাজ দুটোর একটা আর অন্য একটা জাহাজ প্রবল বাতাস আর ঢেউয়ের ঝাপটায় নোঙ্গর ছিঁড়ে ভেসে গেল। বাঁধন ছেঁড়া গতিতে সিকি মাইল মতো যাওয়ার পর উল্টে গেল দুটোই। শির শির করে ভয়ের একটা স্রোত নেমে এলো আমার শিরদাঁড়া বেয়ে। চোখ বন্ধ করে ফিরে এলাম কেবিনে। বিছানায় বসে কায়মনে ঈশ্বরকে ডাকতে লাগলাম।

বিকেল নাগাদ মেট আর সারেং সামনের মাস্তুলটা কেটে ফেলার অনুমতি চাইলো ক্যাপ্টেনের কাছে। প্রথমে রাজি হলেন না ক্যাপ্টেন। যতক্ষণ সম্ভব জাহাজটা তিনি অক্ষত রাখতে চান। কিন্তু সারেং যখন জানালো এ ছাড়া উপায় নেই, মাস্তুল না কাটলে ডুবে যাবে জাহাজ, তখন আর রাজি না হয়ে পারলেন না তিনি। কিন্তু সামনের মাস্তুলটা কেটে দেয়ার পর দেখা গেল হিতে বিপরীত হয়েছে। নড়বড় করছে প্রধান মাস্তুলটা। ভয়ানকভাবে কাঁপছে জাহাজ। বাধ্য হয়ে প্রধান মাস্তুলটাও কেটে দিতে হলো।

পনেরো মিনিটও হয়নি এমন সময় আরেকটা দুঃসংবাদ–খোলের ডান দিকে ফাটল দেখা দিয়েছে, সেই ফাটল দিয়ে গলগল করে পানি ঢুকছে খোলে।

জাহাজের প্রতিটা লোককে পানি সেচতে লাগিয়ে দিলেন ক্যাপ্টেন। আমিও বাদ গেলাম না। প্রাণপণে পানি সেচে চলেছি সবাই, কিন্তু প্রতি সেকেণ্ডে যেটুকু ফেলছি তার দ্বিগুণ পানি ঢুকছে খোলে। এভাবে চলতে থাকলে তলিয়ে যেতে বেশিক্ষণ লাগবে না। সাঁতার জানি ভালোই, কিন্তু সমুদ্রের যা অবস্থা তাতে দুনিয়ার সেরা সাঁতারুও বোধহয় কয়েক মিনিটের বেশি ভেসে থাকতে পারবে না।

শেষ চেষ্টা করলেন ক্যাপ্টেন–সাহায্যের আশায় কামান দাগলেন পরপর কয়েকবার। এই উত্তাল সমুদ্রে আমাদের যা অবস্থা অন্যদের তার চেয়ে ভালো নয় মোটেই। তবু ছোট আর হালকা জাহাজগুলোর অবস্থা তত খারাপ নয়। পালের সঙ্গে সঙ্গে দাঁড় টেনেও চলতে পারে ওগুলো।

ছোট একটা জাহাজ এগিয়ে এলো আমাদের দিকে। সবগুলো পাল নামানো, দাঁড় টেনে আসছে। আমাদের কাছাকাছি এসে একটা নৌকা নামিয়ে দিলো আমাদের তুলে নেয়ার জন্যে।

চারজন দাঁড়ী ছোট্ট নৌকাটা নিয়ে আমাদের জাহাজের গায়ে এসে ভিড়তে চেষ্টা করছে, কিন্তু ব্যর্থ হচ্ছে বার বার। ঢেউয়ের ধাক্কায় এদিক ওদিক চলে যায় নৌকা। শেষমেশ আমাদের লোকেরা একটা বয়ার মাথায় দড়ি বেঁধে ছুঁড়ে দিলো নৌকাটার দিকে। এখানেও বিপত্তি, লোকগুলো যতই কাছে পৌঁছুতে চেষ্টা করে, ততই এদিক ওদিক সরে যায় বয়া।

শেষ পর্যন্ত ধরতে পারলো ওরা। দড়ি টেনে টেনে, সাবধানে জাহাজের পেছনে নিয়ে এলো নৌকা। নৌকাটা ছোট হলেও আমরা সব ক'জন এঁটে গেলাম ওতে। সবাই মিলে দাঁড় টেনে এগোতে লাগলাম ছোট জাহাজটার দিকে। আমরা ডেকে ওঠার পাঁচ মিনিটের মাথায় ডুবে গেল ছেড়ে আসা জাহাজটা। সন্ধ্যার পর, ইয়ারমাউথ বন্দরের নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছুলাম আমরা। ঝড় তখনো চলছে।

দুদিন পর আমাকে ডেকে পাঠালেন ক্যাপ্টেন। গম্ভীর গলায় বললেন, 'তুমি আর কোনোদিন সমুদ্রে যাবে না। প্রথমবারেই যে অভিজ্ঞতা তোমার হলো, তাতে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো, সমুদ্র তোমার জন্যে নয়।'

'কেন, স্যার?' বললাম আমি, 'আপনি কি আর কোনোদিন সমুদ্রে…?'

'আমার কথা আলাদা। এটা আমার নিয়তি, সুতরাং কর্তব্যও। কিন্তু পয়লা বারেই ভাগ্য তোমার সাথে যে আচরণ করলো তাতে, ভবিষ্যতে আবার সমুদ্রে গেলে অবস্থা কি হবে বুঝতে পারছো? আমার ধারণা, তোমার কারণেই আমাদের এমন দুর্বিপাকে পড়তে হয়েছিলো। তাছাড়া, কেনই বা যাবে?'

সব কথা খুলে বললাম আমি। নাবিক হওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষার কথা, বাবার কথা না শুনে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে আসার কথা–সব গড়গড় করে বলে গেলাম। কিন্তু গললো না ক্যাপ্টেনের বরফ জমা মন। উল্টো আরো গম্ভীর হয়ে গেলেন তিনি। বললেন, 'এ সব কথা আগে জানলে, কোনোদিনই আমার জাহাজে উঠতে দিতাম না তোমাকে। এখন আর কোনো সন্দেহ নেই, তোমার মতো অলক্ষুণের জন্যেই খোয়াতে হলো আমার জাহাজটা।'

'কিন্তু, স্যার···,' বলতে চেষ্টা করলাম আমি।

পাত্তা দিলেন না ক্যাপ্টেন। 'উঁহু, হাজার পাউণ্ড দিলেও, তুমি যে জাহাজে থাকবে সে-জাহাজে আমি উঠবো না।'

কথাটা শুধু আমাকে জানিয়েই ক্ষান্ত হলেন না ক্যাপ্টেন, উদ্ধারকারী জাহাজের ক্যাপ্টেনকেও জানিয়ে দিলেন, আমাকে সঙ্গে নিলে জাহাজে থাকবেন না তিনি।

পরদিন সকালেই জাহাজ থেকে নামিয়ে দেয়া হলো আমাকে। পকেটে কিছু টাকা ছিলো, সুতরাং ঘাবড়ালাম না।

লণ্ডন চলে গেলাম স্থল পথে।

দুই

এবার কি করবো? বাড়ি ফিরে যাওয়ার কথা ভুলেও ভাবলাম না। বাবা-মার কথা বাদই দিলাম, পাড়া প্রতিবেশীদের কাছেই বা মুখ দেখাবো কি করে? সবাই আঙুল উঁচিয়ে বলবে, 'এ যে সেই ছোকরা, বাড়ি থেকে পালিয়ে দিগ্বিজয়ী হতে গিয়েছিলো। দিগ্বিজয়ী হওয়ার চেয়ে বাড়িতে থাকা আরামের, বুঝতে পেরে ফিরে এসেছে।'

লণ্ডন শহরে ভবঘুরের মতো ঘুরে বেড়ালাম কয়েকদিন। ফুরিয়ে আসছে পকেটের পয়সা। প্রতিদিনই জাহাজঘাটায় গিয়ে খোঁজ খবর করি–শিগগির কোনো জাহাজ ছাড়বে কিনা, ছাড়লে তাদের লোক লাগবে কিনা। কিন্তু ভাগ্যের কাছ থেকে কোনো সহায়তা পেলাম না। বেশ কয়েকটা জাহাজেরই খোঁজ পেলাম, পরবর্তী এক বা দু সপ্তাহের ভেতর ছাড়বে। লোকও লাগবে সেগুলোয়। কিন্তু আমার মতো অনভিজ্ঞ এবং অপরিচিত লোক নিতে রাজি নয় কেউ। এদিকে যতই পকেটের পয়সা ফুরিয়ে আসছে ততই হতাশ হয়ে পড়ছি আমি।

অবশেষে একদিন এক জাহাজের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে আলাপ হলো। মাত্র ক'দিন আগে গিনি উপকূল থেকে ফিরেছেন তিনি। যে সব জিনিসপত্র এনেছেন, মোটা অঙ্কের লাভ হয়েছে তা থেকে। ক'দিন পরে আবার রওনা হবেন। অল্প কিছুক্ষণ আলাপ করেই বুঝতে পারলাম এবার ঠিক জায়গায় এসেছি। আমার দুনিয়া দেখার আগ্রহের কথা শুনে খুব খুশি হলেন ভদ্রলোক। জানালেন, ইচ্ছে করলে আমি বিনা পয়সায় তাঁর সঙ্গে যেতে পারি। তাঁর মেস-মেট হিসেবে থাকবো, চাইলে ব্যবসার জন্যে কিছু জিনিসও সঙ্গে নিতে পারি।

সানন্দে আমি গ্রহণ করলাম প্রস্তাবটা। মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে চমৎকার একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠলো আমার আর ক্যাপ্টেনের ভেতর।

লণ্ডনে বাবার এক বন্ধুর কাছ থেকে চল্লিশ পাউণ্ড ধার করলাম। ক্যাপ্টেনের পরামর্শ মতো কাচের চুড়ি, মালা, ছোটখাটো খেলনা এবং এ ধরনের আরো কিছু তুচ্ছ জিনিসপত্র কিনলাম এই টাকা দিয়ে। দেখতে দেখতে কেটে গেল রওনা

হওয়ার আগের দিনগুলো। দ্বিতীয়বারের মতো জাহাজে চাপলাম আমি।

এটাই আমার একমাত্র সফল সমুদ্র যাত্রা। ক্যাপ্টেনের মতো সৎ এবং মিশুক লোকের বন্ধুত্ব পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করেছি। তাছাড়া, এ সময় আমি তাঁর কাছ থেকে গণিত শাস্ত্র এবং জাহাজ চালানোর কলাকৌশল সম্পর্কেও অনেক কিছু শিখে নিতে পেরেছি। সত্যি কথা বলতে কি এই যাত্রায় আমি পুরোপুরি একজন নাবিক এবং ব্যবসায়ী হয়ে উঠেছি।

যে সব তুচ্ছ জিনিসপত্র নিয়ে গেছিলাম, সেগুলোর বিনিময়ে গিনি থেকে প্রায় পাঁচ পাউণ্ড নয় আউন্সের মতো সোনার গুঁড়ো নিয়ে ফিরলাম। লণ্ডনের বাজারে এর দাম প্রায় তিনশো পাউণ্ড।

চল্লিশ পাউণ্ডের জিনিসের বিনিময়ে তিনশো পাউণ্ড পাওয়া সোজা কথা নয়। আবার গিনিতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম আমি। প্রস্তুতিও নিতে শুরু করলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য, কয়েকদিন পরেই মারা গেলেন আমার ক্যাপ্টেন বন্ধু।

চুপচাপ বসে রইলাম কিছুদিন। সিদ্ধান্ত পাল্টালাম না। বন্ধুর মৃত্যুশোক একটু থিতিয়ে আসতে আবার চেপে বসলাম আগের জাহাজে। জাহাজের মেট এবার ক্যাপ্টেনের দায়িত্ব পালন করছেন।

এবার নিলাম একশো পাউণ্ডের জিনিসপত্র। আগের বারের মতোই তুচ্ছ সব জিনিস। বাকি দুশো পাউণ্ড রেখে গেলাম ক্যাপ্টেনের বিধবা স্ত্রীর কাছে। বাবার বন্ধুর ধার শোধ দিতে গিয়ে জানলাম, আগেই বাবা শোধ করে দিয়েছেন সেই চল্লিশ পাউণ্ড।

নির্দিষ্ট দিনে অনুকূল বাতাসে পাল তুলে দিলাম আমরা। চমৎকার কাটলো প্রথম কয়েকটা দিন। তারপরেই আবার দুর্ভাগ্য এসে ভর করলো আমার কাঁধে। এবার আর ঝড় নয়, জলদস্যু।

ক্যানারি আইল্যাণ্ডের দিকে এগোচ্ছিল আমাদের জাহাজ। ভোর হয়েছে একটু আগে। সূর্যের আলোয় দ্রুত কেটে যাচ্ছে ভোরের ধূসর অন্ধকার। হঠাৎ খেয়াল করলাম, পেছন থেকে তেড়ে আসছে একটা জাহাজ। সবগুলো পাল তুলে দিয়ে ভয়ানক গতিতে ছুটে আসছে সেটা। আমি প্রথমে বুঝতে পারিনি। ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে যখন শুনলাম কারণটা তখন আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হওয়ার জোগাড়।

ইতিমধ্যে আমাদের জাহাজেরও সবগুলো পাল তুলে দেয়া হয়েছে। কিন্তু তবু জলদস্যুদের জাহাজের সমান গতি অর্জন করতে পারলাম না আমরা। দ্রুত কমে আসছে দূরত্ব। কয়েক ঘণ্টার ভেতরেই জলদস্যুদের জাহাজটা ধরে ফেলবে আমাদের।

যুদ্ধ করার জন্যে তৈরি হলাম আমরা। বারোটা কামান রয়েছে আমাদের জাহাজে।

দুপুরের কিছু পরে এসে পড়লো দস্যুজাহাজটা। সোজা চলে এলো আমাদের পাশে। ছোট ছোট কয়েকটা পাল নামিয়ে ক্রমশ কাছে চলে আসছে। একসঙ্গে আটটা কামান টানা হ্যাঁচড়া করে ডেকের ওপর নিয়ে এলাম আমরা। তাক করলাম দস্যু জাহাজটার দিকে। কামানে বারুদ ঠেসে গোলা ঢোকাতে যে সময় লাগলো, ততক্ষণে আরো কাছে এসে পড়লো জাহাজটা। এত কাছ থেকে কামান দেগে

কতটুকু ক্ষতি করা যাবে বুঝতে পারছি না।

কামান দাগা হলো। পর পর গর্জে উঠলো আটটা কামান। যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই—বেশির ভাগ গোলাই জাহাজের ওপর দিয়ে চলে গেল। সবচেয়ে বড় পালটায় একটা ফুটো করা ছাড়া আর কিছু করতে পারলাম না আমরা। ইতিমধ্যে দস্যুরাও কামান দাগতে শুরু করেছে।

কামানগুলোয় দ্বিতীয় বার বারুদ ঠেসে গোলা ছুঁড়বার আগেই দস্যুদের জাহাজটা ভিড়লো আমাদেরটার পাশে। জোর একটা ধাক্কা লাগলো আমাদের জাহাজে। ছিটকে পড়লো কয়েকজন নাবিক। প্রচণ্ড চিৎকার করতে করতে জলদস্যুরা লাফিয়ে নামতে লাগলো আমাদের জাহাজে। প্রত্যেকের হাতে খোলা তলোয়ার।

আমাদের মধ্যে পেশাদার যোদ্ধা কেউ ছিলো না। দু'একজন নাবিক যা-ও একটু লড়াই জানতো জলদস্যুদের সঙ্গে পেরে উঠলো না তারা। তাছাড়া দস্যুরা সংখ্যায় অনেক বেশি। ঘণ্টাখানেকেরও কম সময়ের মধ্যে আমাদের জাহাজ দখল করে তছনছ করে ফেললো ওরা। দড়িদড়া সব কেটে দিল, পালগুলো নামিয়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করলো, মাস্তুলগুলো কেটে ভাসিয়ে দিলো সাগরে। তিনজন মারা গেল আমাদের, আহত হলো আটজন। বাকি সবাই আত্মসমর্পণ করলাম। আমাদেরকে নিয়ে ওঠানো হলো দস্যু-জাহাজে।

মরক্কো উপকূলের দিকে চলতে লাগলো দস্যুজাহাজ। কয়েকদিন পর পৌঁছুলো মুর বন্দর সালীতে। আমাকে নিজের দাস হিসেবে রেখে দিলো দস্যুসর্দার। বাকি সবাইকে পাঠিয়ে দেয়া হলো মুর সম্রাটের দরবারে। রাতারাতি একজন উদীয়মান ব্যবসায়ী থেকে ক্রীতদাসে পরিণত হলাম আমি।

আমার নতুন প্রভু তার বাড়িতে নিয়ে গেল আমাকে। আশায় আশায় রইলাম—হয়তো আবার একদিন সাগর পাড়ি দিতে বেরুবে দস্যুসর্দার, আমাকেও হয়তো সঙ্গে নেবে। তখন যদি কোনো স্প্যানিশ বা পর্তুগীজ যুদ্ধ জাহাজের মুখোমুখি হয় ব্যাটা, তাহলে হয়তো মুক্তির একটা পথ পেয়ে যাবো।

অচিরেই আমার এ ইচ্ছার অপমৃত্যু ঘটলো। আবার সমুদ্রে গেল লোকটা, কিন্তু আমাকে রেখে গেল তার বাগান দেখাশোনার জন্যে।

কয়েক মাসের মধ্যেই ফিরে এলো দস্যুসর্দার। এবার আমাকে লাগানো হলো তার জাহাজ পাহারা দেয়ার কাজে।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম আমি—বাগানের কাজের চেয়ে জাহাজ পাহারা দেয়া অনেক সহজ। তাছাড়া পালানোর কিছু একটা উপায় করা যাবে হয়তো।

নানারকম ফন্দি ফিকির করলাম পালানোর। কিন্তু জাহাজে আমাকে ছাড়াও নিজের কয়েকজন বিশ্বস্ত লোক রেখেছে সর্দার, ফলে কোনো ফন্দিই কাজে লাগলো না।

দুবছর কেটে গেল এভাবে। এই দুবছরে একবারও জাহাজে পাল তোলেনি সর্দার। যতটুকু জানতে পেরেছি, টাকার অভাবেই এরকম হাত পা গুটিয়ে বসে আছে সে। সমুদ্রে মাছ ধরেই আপাতত দিন কাটছে আমাদের। সপ্তাহে এক দু'দিন, আবহাওয়া ভালো থাকলে আরো ঘন ঘন, জাহাজের ছোট নৌকাটা নিয়ে

বেরিয়ে পড়ি আমরা–সর্দার, আমি আর যুরি নামের এক মুর ছেলে। বেশির ভাগ সময় সর্দারই মাছ ধরে, আমি আর যুরি দাঁড় টানি, প্রয়োজন পড়লে সাহায্য করি সর্দারকে।

অল্প সময়ের ভেতরেই একজন দক্ষ মাছ ধরুয়া হয়ে উঠলাম আমি। সর্দারের চেয়ে ভালো না হলেও তার সমান সমান যে হয়ে উঠলাম তাতে সন্দেহ নেই। কারণ কদিন পর লক্ষ করলাম, নিজে আর মাছ ধরতে আসছে না সর্দার। মোলি নামের এক বিশ্বস্ত লোককে পাঠাচ্ছে আমার আর যুরির সঙ্গে। যুরি আর নতুন লোকটা দাঁড় টানে, আমি মাছ ধরি।

এমন সময় একদিন ঘটলো ঘটনাটা। চমৎকার সকাল। শান্ত সমুদ্র। মাছ ধরতে বেরিয়েছি আমরা। সর্দার নিজে রয়েছে আজ। উপকূল থেকে প্রায় আধলিগ এসে পড়েছি। হঠাৎ করেই ঘন কুয়াশায় ছেয়ে গেল চারদিক। নৌকার ওপর একে অন্যকে দেখতেও কষ্ট হচ্ছে আমাদের। ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিলো সর্দার। দাঁড় টানতে শুরু করলাম আমি আর যুরি। কিন্তু সারাদিন দাঁড় টানার পরও উপকূলে পৌঁছুতে পারলাম না।

রাত হলো। সারারাত চুপচাপ বসে রইলাম খোলা সাগরে। পরদিন সকালে আবার পরিষ্কার আকাশ। সূর্য দেখে বুঝতে পারলাম, উপকূলের দিকে না টেনে গভীর সমুদ্রের দিকে দাঁড় টেনেছি আমরা। যাহোক অল্পের ওপর দিয়ে বেঁচে গেলাম এ যাত্রা। সন্ধ্যা নাগাদ ফিরে আসতে পারলাম উপকূলে। মারাত্মক কোনো বিপদ না ঘটলেও পুরো দু'দিন না খেয়ে থাকার যে কি জ্বালা, তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি।

এই ঘটনার পর সর্দার সিদ্ধান্ত নিলো, আর কখনো কম্পাস এবং কিছু খাবার ছাড়া মাছ ধরতে বেরুবে না।

খুব মজবুত আর বড় একটা নৌকা ছিলো আমাদের জাহাজে। নিজের জাহাজের সঙ্গে বেঁধে সেই নৌকাটা নিয়ে এসেছিলো দস্যুসর্দার। এতদিন এমনি এমনি পড়ে ছিলো, এবার সেটা কাজে লাগানোর কথা ভাবলো সর্দার। নৌকাটা মেরামত করিয়ে সেটার মাঝামাঝি জায়গায় একটা কেবিন তৈরি করালো এবং ছোট একটা মাস্তুল লাগালো–যাতে বিপদের সময় দ্রুত চলবার জন্য পাল ব্যবহার করা যায়। কেবিনটায় মাছ ধরার সরঞ্জাম এবং খাবার দাবার রাখার ব্যবস্থা হলো। হাতুড়ি, করাত এ জাতীয় টুকটাক কিছু যন্ত্রপাতিও রাখা হলো।

এখন এত চমৎকার হয়েছে নৌকাটা যে, ছোটখাটো একটা সমুদ্রগামী জাহাজ বলা যায় সেটাকে। আজকাল মাছ ধরা ছাড়াও, মাঝে মধ্যেই নৌকাটা নিয়ে সমুদ্রে বেড়াতে বেরোয় সর্দার। দু'একজন বন্ধু-বান্ধবও থাকে সঙ্গে। এবং, কি মাছ ধরার সময়, কি বেড়ানোর সময়, আমাকে থাকতেই হয় নৌকায়।

একদিন বিকেলে সর্দার ডেকে পাঠালো আমাকে আর মোলিকে। অন্যান্য দিন যা নিই তার প্রায় তিনগুণ খাবার বোঝাই দেয়ার নির্দেশ দিলো। জাহাজ থেকে বেশ কিছুটা বারুদ, গুলি এবং তিনটে বন্দুক নিয়ে তৈরি রাখতে বললো নৌকায়। বুঝলাম মাছ ধরা ছাড়াও পাখি শিকার হবে কাল।

সর্দারের নির্দেশ মতো সব কিছু ঠিকঠাক করে অপেক্ষা করতে লাগলাম

পরদিন ভোরে। আমি, যুরি আর মোলি এর ভেতরে ধুয়ে মুছে সাফ সুতরো করে ফেলেছি নৌকা।

সূর্য ওঠার বেশ কিছুক্ষণ পরে এলো সর্দার। একা। বললো, 'আমার বন্ধুরা আসতে পারলো না। তোমরা তিনজনে মাছ ধরতে চলে যাও। দুপুরের ভেতর বড় কিছু মাছ চাই, না হলে খাওয়া হবে না।'

রওনা হয়ে গেলাম আমরা। মোলি হাল ধরে আছে, যুরি আর আমি দাঁড় টানছি। উপকূল ছেড়ে বেশ কিছুদূর চলে আসার পর বিদ্যুৎ চমকের মতো বুদ্ধিটা খেলে গেল আমার মাথায়।

উপকূলের কাছাকাছি এলাকায় মাছ ধরার চেষ্টা করলাম কিছুক্ষণ। কিন্তু লাভ হলো না কোনো। আসলে হতে দিলাম না আমি। যে সব কাজ করলে কোনো মতেই মাছ টোপ গিলবে না সেগুলোই করতে লাগলাম। খানিকক্ষণ পর বললাম, 'বুঝলে, মোলি, উপকূলের এত কাছে মাছ পাওয়া যাবে না আজ। আরো গভীর সমুদ্রে যেতে হবে।'

কিছুই সন্দেহ করলো না মোলি। 'ঠিক আছে, চলো,' বলে পাল খাটানোর জন্যে সে উঠে চলে গেল সামনে। হাল ধরলাম আমি। গভীর সমুদ্রের দিকে চালাতে লাগলাম নৌকা। প্রায় মাইল তিনেক যাওয়ার পর যুরিকে হালে বসিয়ে উঠে গেলাম আমি। মোলির পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। আপন মনে কিছু করছি, এমন ভান করে একটু ঝুঁকলাম সামনে। তারপর আচমকা লোকটার দুই পা ধরে দিলাম হ্যাঁচকা এক টান। চিৎ হয়ে পানিতে পড়ে গেল মোলি। তলিয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

একটু পরেই ভেসে উঠলো লোকটা। সাঁতার কেটে এগিয়ে আসতে লাগলো নৌকার দিকে। তাড়াতাড়ি কেবিনে ঢুকে একটা বন্দুক বের করে তাক করলাম মোলির দিকে। বললাম, 'এদিকে সাঁতরে লাভ হবে না, ডাঙার দিকে যাও।'

'তুমি পালাবে তো?' বললো মোলি। 'আমাকে সঙ্গে নাও। দুনিয়ার যেখানে যাও, তোমার সাথে থাকবো আমি। কখনো কোনো ক্ষতি করার চেষ্টা করবো না।'

'মস্করার আর জায়গা পাওনি! এক্ষুণি ঘোরো, নাহলে গুলি করলাম!'

'উপকূল পর্যন্ত সাঁতরে যেতে পারবো না তো আমি।'

যথেষ্ট ভালো সাঁতরাতে জানে লোকটা। বললাম, 'খুব পারবে। সমুদ্র শান্ত, না পারার কোনো কারণ নেই। চলে যাও, কিছু বলবো না। কিন্তু নৌকার দিকে এগিয়েছ কি, খুলি ফুটো করে দেবো।' গুলি করার ভঙ্গিতে একবার ঝাঁকুনি দিলাম বন্দুকটায়।

এবার ভয় পেলো মোলি। ঘুরে সাঁতরাতে শুরু করলো উপকূলের দিকে।

তিন

উপকূলের দিকে বেশ কিছুদূর চলে গেছে মোলি। এবার ছেলেটার দিকে মনোযোগ দিলাম আমি। বললাম, 'যুরি, এবার বলো তুমি কি করবে? আমার সঙ্গে থাকবে, না ফিরে যাবে সালীতে?'

'আপনার সঙ্গেই থাকতে চাই,' ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বললো যুরি। এতদিন আমার সঙ্গে থেকে কাজ চালানোর মতো ইংরেজি শিখে নিয়েছে ছেলেটা।

'ভালো কথা,' বললাম আমি, 'কিন্তু যদি বিশ্বাসঘাতকতা করো, খোদার কসম, সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দেবো। আর যদি ভালো হয়ে চলো তো, কোনো ভয় নেই তোমার।'

'সারা জীবন আমি আপনার বিশ্বস্ত থাকবো,' প্রতিজ্ঞা করলো যুরি। 'দয়া করে অবিশ্বাস করবেন না আমাকে।'

উত্তর উত্তর-পুব দিক থেকে বইছে বাতাস। অর্থাৎ দক্ষিণ দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে চলতে হবে আমাকে। যদিও উল্টো দিকেই যেতে চাই আমি। স্পেনের উপকূলে পৌছুনো যাবে তাহলে। কিন্তু আপাতত মরক্কোর উপকূল থেকে যতটা সম্ভব দূরে সরে যেতে হবে। সুতরাং বাতাসের অনুকূলেই হাল ধরলাম।

সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দিক বদলে দক্ষিণ দক্ষিণ-পুবে চলতে লাগলাম। জানি, যত দক্ষিণে যাচ্ছি, স্পেন থেকে তত দূরে সরে যাচ্ছি। কিন্তু এছাড়া উপায় নেই, বাতাসের প্রতিকূলে পাল তোলা সম্ভব নয়, আর নোঙ্গর ফেলে চুপ করে বসে থাকার তো প্রশ্নই ওঠে না।

এমন ভাবে হাল ধরেছি যাতে দক্ষিণ দিকে যেতে যেতে একটু একটু করে উপকূলের দিকেও এগোয় নৌকা। পরদিন বিকেল তিনটে নাগাদ আবার তীর দেখতে পেলাম। আমার বিশ্বাস, ইতিমধ্যে সালী থেকে কমপক্ষে দেড়শো মাইল দক্ষিণে এসে পড়তে পেরেছি।

পাঁচদিন কেটে গেল এভাবে, এর ভেতর একবারও দিক বদলায়নি বাতাস। তীরের অনেকটা দূর দিয়ে উপকূলের সঙ্গে সমান দূরত্ব রেখে চলেছি আমরা।

ছ'দিনের দিন দক্ষিণ দিক থেকে বইতে শুরু করলো বাতাস। এতদিন কোনো জাহাজ আমাদের পিছু পিছু এসেছে কিনা জানি না। যদি এসেও থাকে, এখন আর পারবে না। কারণ উল্টো দিক থেকে বইছে বাতাস। অনেকখানি নিশ্চিন্ত বোধ করতে লাগলাম। এবার উপকূলের দিকে যাওয়া যায়। নৌকার মুখ ঘুরিয়ে দিলাম।

সন্ধ্যা নাগাদ ছোট একটা নদীর মোহনায় নোঙ্গর ফেললাম। একটা লোকও দেখলাম না উপকূলের কাছে। দেখবো বলে ভাবিওনি অবশ্য। কোথায় এসেছি, কত অক্ষাংশ বা দ্রাঘিমাংশ, কোন্ দেশের উপকূল বা কি নদী ওটা কিছুই জানি না। জানতে চাইও না। এখন আমার সবচেয়ে দরকার যা তা হচ্ছে খাবার পানি।

রওনা হওয়ার আগে যেটুকু পানি নিয়েছিলাম তা শেষ হয়ে গেছে।

পানিতে নামার জন্যে তৈরি হতে লাগলাম–সাঁতরে ডাঙায় উঠে পানির খোঁজ করতে হবে। কিন্তু অন্ধকার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নানা রকম হিংস্র জীবজন্তুর গর্জন ভেসে আসতে লাগলো ডাঙার দিক থেকে। বেচারা যুরি ভয়ে একেবারে সিঁটিয়ে গেল, এসব হালুম হুলুম শুনে। কাঁদ কাঁদ স্বরে মিনতি করতে লাগলো, যেন সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করি।

'ঠিক আছে, যুরি, যাবো না,' বললাম আমি। 'কিন্তু সকালে হয় তো এমন সব লোক এসে হাজির হবে, যারা এ সিংহগুলোর চেয়ে কম খারাপ নয়।'

'যদি আসে তাহলে গুলি করবো আমরা,' হাসতে হাসতে বললো যুরি, 'ভয়ে পালাতে পথ পাবে না ব্যাটারা।'

বুদ্ধিটা মনে ধরলো আমার। নোঙ্গর ফেলে সারারাত চুপ করে বসে রইলাম। কিছুক্ষণ পরপরই শুনতে পাচ্ছি বুনো জন্তুর হিংস্র গর্জন। একবার দেখলাম বিশাল আকারের এক দল প্রাণী। ওগুলোর নাম যে কি তা বলতে পারবো না। সাগরে নেমে অদ্ভুত ডাক ছাড়তে ছাড়তে পানি ছিটাছিটি করলো কয়েকটা। ভয়ে কাঁপতে লাগলো যুরি। আমার অবস্থাও মোটেই ভালো না। কিন্তু যখন দেখলাম এ বিশাল প্রাণীগুলোর একটা সাঁতার কেটে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে, তখন আতঙ্কে আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হওয়ার দশা হলো একেবারে।

আবছা একটা অবয়ব ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না প্রাণীটার।

'সিংহ ওটা,' বললো যুরি।

হতে পারে। সিংহ কখনো দেখিনি আমি।

'নোঙ্গর তুলে চলে যাই চলেন,' আবার বললো যুরি।

'না, যুরি,' বললাম আমি। 'নোঙ্গর তুলবো না আমরা···,' কথাটা শেষ করতে পারলাম না, নৌকার একেবারে কাছে দেখতে পেলাম জন্তুটাকে, দুই দাঁড় সমানও হবে না দূরত্ব। তাড়াতাড়ি কেবিনের দরজার কাছ থেকে বন্দুকটা তুলে নিয়ে গুলি করলাম। গুলি লাগলো কিনা বুঝতে পারলাম না, তবে দেখলাম ফিরে যাচ্ছে জন্তুটা।

বন্দুকের শব্দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তীরে দাঁড়ানো জন্তুগুলো এমন ভয়াবহ রকম চিৎকার জুড়ে দিলো যে, সেই চিৎকার শুনেই মূর্ছা যাওয়ার দশা হলো আমাদের।

ভোর হলো। এবার পানির খোঁজে যেতে হবে। গতকালের পর থেকে এ পর্যন্ত একবিন্দু পানি মুখে দিতে পারিনি। যে ভাবেই হোক পানি জোগাড় করতে হবে।

নোঙ্গর তুলে, উপকূলের যতটা সম্ভব কাছে নিয়ে গেলাম নৌকা। তারপর আবার নোঙ্গর ফেলে সাগরে নামলাম যুরি আর আমি। পানির ভেতর দিয়ে হেঁটে তীরে গিয়ে উঠলাম।

নৌকাটাকে চোখের আড়াল করতে চাইছি না আমি। নদী পথে ক্যানো নিয়ে হাজির হতে পারে জংলীরা। কিন্তু মাইলখানেক দূরে একটা নিচু জায়গা দেখে দৌড়ে গেল যুরি। বাধা দেয়ার কোনো সুযোগই পেলাম না। অগত্যা আমিও হাঁটতে লাগলাম সেদিকে।

হঠাৎ দেখলাম ছুটতে ছুটতে আসছে যুরি। কি ব্যাপার? জংলীরা তাড়া করেছে? নাকি কোনো বুনো জন্তু? ওকে সাহায্য করার জন্যে দৌড়াতে শুরু করলাম আমি। কাছাকাছি পৌঁছে দেখি, খরগোশের মতো দেখতে একটা জন্তু ওর কাঁধে। ওঁৎ পেতে বসে মেরেছে ও জন্তুটা। মনে মনে খুশি হয়ে উঠলাম—অনেকখানি মাংস পাওয়া যাবে। আরো খুশি হলাম যখন যুরি জানালো, পানির খোঁজও সে পেয়েছে, এবং এখনো কোনো জংলী দেখেনি।

খরগোশ জাতীয় প্রাণীটা পুড়িয়ে ভূরিভোজ করলাম। তারপর পানির পাত্রগুলো ভরে নিয়ে নৌকায় এসে উঠলাম।

সঙ্গে আনা খাবারের অনেকখানি এখনো অবশিষ্ট আছে, পানিও জোগাড় হয়ে গেছে—সুতরাং চিন্তা কি? উপকূল ধরে চলতে শুরু করলাম।

আগেও এসেছি এ অঞ্চলে, ঠিক কোন্ জায়গায় আছি, না জানলেও আমাদের অবস্থান সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা করতে পারছি। ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জ এবং কেপ দ্য ভার্দে দ্বীপপুঞ্জের কাছাকাছি কোথাও। একমাত্র কম্পাস ছাড়া আর কোনো যন্ত্রপাতি নেই সঙ্গে, তাই সঠিক অবস্থানটা বের করতে পারছি না। যা হোক, উপকূলের সঙ্গে সমান্তরাল রেখায় চলতে থাকবো, কোনো ইংলিশ বাণিজ্য জাহাজের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে হয়তো।

একদিন পশ্চিম দিকে, অনেক দূরে একটা চূড়া মতো দেখতে পেলাম। চূড়াটাকে ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জের টেনেরিফ দ্বীপের পাহাড় চূড়া বলে মনে হলো। ধ্বক করে উঠলো আমার বুকের ভেতর। এবার বোধহয় সভ্য দুনিয়ায় ফিরে যাওয়া যাবে। সঙ্গে সঙ্গে হাল ঘুরিয়ে চলতে লাগলাম সেদিকে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, এক লিগও যেতে পারিনি, এমন সময় পাল্টে গেল বাতাসের গতিপথ। জাহাজ চালানোর যতগুলো কৌশল শিখেছিলাম, সব একে একে প্রয়োগ করেও বাতাসের প্রতিকূলে এগোতে পারলাম না। হতাশ হয়ে বাদ দিলাম ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জে যাওয়ার ইচ্ছা।

আবার সেই দক্ষিণ দিকে উপকূল রেখা বরাবর এগিয়ে চলা। এর ভেতর আরো কয়েকবার আমরা ডাঙায় নেমেছি। পানির পাত্রগুলো ভরে, কিছু ফলমূল জোগাড় করে আবার পাল তুলে দিয়েছি।

উপকূলের খুব কাছ দিয়ে এগোচ্ছি আমরা। যুরি একদিন পরামর্শ দেয়ার ভঙ্গিতে বললো, 'আরেকটু দূর দিয়ে চলুন।'

'কেন?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'এ দেখুন,' আঙুল দিয়ে তীরের দিকে ইশারা করলো ও। 'এ যে, এ পাহাড়টার পাশে ঘুমিয়ে আছে একটা দৈত্য।'

যুরির ইশারা অনুসরণ করে তাকালাম আমি। দৈত্যই বটে। বিরাট এক সিংহ শুয়ে আছে পাহাড়ের ছায়ায়। উপকূল থেকে সামান্য একটু দূরে।

'যুরি,' বললাম আমি, 'যাও, কূলে গিয়ে মেরে এসো ওটাকে।'

আতঙ্কিত চেহারা হলো যুরির। 'আমি মারবো! এক গালে খেয়ে ফেলবে আমাকে!'

আর কিছু বললাম না ছেলেটাকে। আমাদের সবচেয়ে বড় বন্দুকটা বের করলাম কেবিন থেকে। অনেকখানি বারুদ ঠেসে দুটো বড় গুলি ভরলাম। দ্বিতীয়

বন্দুকটাতেও দুটো বুলেট ঢোকালাম। সবশেষে তিন নম্বর—অর্থাৎ ছোট বন্দুকটা। পাঁচটা ছররা ভরলাম ওটায়।

উপকূলের আরেকটু কাছে নিয়ে গেলাম নৌকা। নোঙ্গর ফেলে তাক করলাম বড় বন্দুকটা দিয়ে। অনেক সময় নিয়ে সিংহটার মাথা বরাবর নিশানা করে গুলি ছুঁড়লাম…।

মাথায় না লেগে হাঁটুতে লাগলো গুলি। ভয়ঙ্কর এক গর্জন করে লাফ মেরে উঠে দাঁড়াতে গেল সিংহটা। কিন্তু পারলো না। পড়ে গেল হাঁটু ভেঙে। একটু পরেই তিন পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালো আবার।

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বন্দুকটা তুলে নিয়েছি আমি। তিন পায়ে ভর দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে শুরু করেছে সিংহ। দেরি না করে গুলি করলাম আবার। এবার কাজ হলো। পড়ে গেল সিংহটা। কিছুক্ষণ পা ছুঁড়ে গড়াগড়ি করে জীবন আঁকড়ে থাকার চেষ্টা করলো। নিথর হয়ে গেল তারপর।

'যাই আমি ওটার কাছে?' উৎফুল্ল গলায় অনুমতি চাইলো যুরি।

'যাও…।'

ছোঁ মেরে ছোট বন্দুকটা নিয়ে পানিতে লাফিয়ে পড়লো যুরি। এক হাতে বন্দুকটা মাথার ওপর ধরে, সাঁতরে গিয়ে উঠলো তীরে। একছুটে পৌঁছে গেল জন্তুটার কাছে। মরা সিংহটার কানের সঙ্গে বন্দুক ঠেকিয়ে গুলি করলো আবার।

হঠাৎ করেই কেমন একটা বেদনাবোধে ছেয়ে গেল মনটা—খামোকা মারলাম প্রাণীটাকে। ওর মাংস তো খেতে পারবো না, তা হলে কেন মারলাম?

আবার রওনা হওয়ার জন্যে যুরিকে ডাকতে যাবো, এমন সময় মনে হলো, চামড়াটা তো ছাড়িয়ে নিতে পারি!

আমিও সাঁতরে গিয়ে তীরে উঠলাম। দুজনে মিলে চামড়া ছাড়াতে শুরু করলাম। কিছুক্ষণের ভেতরেই বুঝতে পারলাম যুরি আমার চেয়ে অনেক পটু এ কাজে। তবু দিনের বাকি সময়টুকু লাগলো চামড়া ছাড়াতে। নৌকায় ফিরে কেবিনের ওপর মেলে দিলাম চামড়াটা। দু'দিনের ভেতরেই শুকিয়ে গেল ওটা। এরপর যতদিন নৌকায় ছিলাম চামড়াটার ওপরেই শুয়েছি আমি।

সিংহ শিকারের পর প্রায় বারো দিন পেরিয়ে গেছে। এখনো ইংলিশ বা ইউরোপীয় কোনো জাহাজের সঙ্গে দেখা হয়নি আমাদের। খাবার দাবার ফুরিয়ে এসেছে। একটানা অনেকদিন শান্ত গেল আবহাওয়া—যে কোন মুহূর্তে আবার ফুঁসে উঠতে পারে সাগর।

ইতিমধ্যে তীরে লোকজনের দেখা পেতে শুরু করেছি। গত কয়েক দিনে উপকূলের কাছে দু'তিন জায়গায় দেখেছি, হাঁ করে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে কালো কালো লোকেরা। আমি তীরে নেমে ওদের সাথে আলাপ করার ইচ্ছে প্রকাশ করতেই হা হা করে উঠলো যুরি, 'না না, যাবেন না আপনি।'

জাহাজের আশায় আশায় আরো কয়েক দিন কাটলো। কিন্তু বিড়ালের কপালে শিকা ছিঁড়লো না। আর বসে থাকা যায় না। এবার আলাপ করতেই হবে স্থানীয়দের সাথে।

পরদিনই সুযোগ পেয়ে গেলাম। লোকগুলোকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে তীরের

কাছে নিয়ে গেলাম নৌকা। দেখলাম, একজনের হাতে লম্বা একটা লাঠি ছাড়া কারো কাছে কিছু নেই। যুরি জানালো, ওটা বল্লম।

নৌকায় থেকেই আকার ইঙ্গিতে যতটুকু পারলাম আলাপ করলাম ওদের সাথে। বিশেষ করে যেটা বোঝাতে চাইলাম, তা হলো, খাবার দরকার আমাদের।

ভালোই বুঝলো লোকগুলো। ইশারায় নৌকা থামাতে বললো।

নিরীহই মনে হলো লোকগুলোকে। বোধহয় ভয়ের কিছু নেই। পাল নামিয়ে ফেললাম আমি। দেখে দুজন লোক ছুটে গেল ডাঙার ভেতর দিকে। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে যখন ফিরে এলো, তখন তাদের হাতে রয়েছে দুটো শুকনো মাছ আর কিছু শস্যদানা। মাছ এবং শস্যদানা দুটোই অপরিচিত আমার। তবু জিনিসগুলো নেবো ঠিক করলাম। কিন্তু সমস্যা হলো, কিভাবে? আমরা যেমন ঠিকমতো ওদের বিশ্বাস করতে পারছি না, তেমনি ওরাও পারছে না। ওরাই শেষ পর্যন্ত সমাধান করে দিলো। সৈকতের ওপর খাবারগুলো রেখে বেশ কিছুটা পিছিয়ে গেল ওরা। আমি নেমে জিনিসগুলো নৌকায় নিয়ে আসার পর আবার কাছে চলে এলো।

ইশারায় ধন্যবাদ জানানোর চেষ্টা করলাম ওদের। লোকগুলোকে খুশি করার মতো এছাড়া আর কিছুই নেই আমাদের কাছে। কিন্তু একটু পরেই চমৎকার একটা সুযোগ পেয়ে গেলাম ওদের খুশি করার।

তখনো উপকূল ছেড়ে দূরে আসিনি আমরা, এমন সময় বিশাল আকারের দুটো প্রাণী এসে হাজির হলো। গোঁ গোঁ করতে করতে একটাকে তাড়া করে আসছে অন্যটা। সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্কিত ছুটোছুটি শুরু হয়ে গেল লোকগুলোর ভেতর। সোজা পানিতে এসে নামলো জন্তু দুটো। কিছুক্ষণ হুটোপুটি করে, একটা জন্তু এগিয়ে আসতে লাগলো আমাদের দিকে। অত বড় জন্তুটা এত দ্রুত সাঁতরে আসছে যে আশ্চর্য না হয়ে পারলাম না। জরুরী মুহূর্তে ব্যবহারের জন্যে গুলি বারুদ ভরেই রেখেছিলাম বন্দুকগুলোয়। সবচেয়ে বড় বন্দুকটা তুলে নিলাম। আরেকটু এগিয়ে আসার সুযোগ দিলাম জন্তুটাকে। তারপর গুলি করলাম ওটার মাথা তাক করে। সঙ্গে সঙ্গে পানিতে ডুবে গেল জন্তুটা। একটু পরেই ভেসে উঠলো আবার। আবার তলিয়ে গেল। আবার ভেসে উঠলো। মরণ যন্ত্রণায় তড়পাচ্ছে। একটু একটু করে ফিরে যাচ্ছে তীরের দিকে। তীরে পৌঁছুনোর ঠিক আগমুহূর্তে নিথর হয়ে গেল বিশাল প্রাণীটা।

জন্তু দুটো দেখে স্থানীয় লোকগুলো আতঙ্কিত হয়েছিলো নিঃসন্দেহে, কিন্তু গুলির শব্দে ওদের যা অবস্থা হলো তা ঠিক মতো প্রকাশ করার ভাষা আমার জানা নেই। কয়েকজনের অবস্থা দেখে মনে হলো, মরার জন্যে তৈরি হয়ে গেছে। সটান মাটিতে শুয়ে কাঁপছে থর থর করে। কিন্তু যখন একটা জন্তুকে মরে সাগরে ডুবে যেতে দেখলো, তখন যেন নতুন করে প্রাণ পেলো লোকগুলো। ইশারায় ভয় পেতে নিষেধ করলাম। এবার একটু আশ্বস্ত হলো ওরা। দল বেঁধে পানিতে নেমে খুঁজতে লাগলো জন্তুটাকে।

অন্য প্রাণীটা গুলির শব্দ আর বন্দুকের নলে আগুন দেখে সঙ্গে সঙ্গে তীরে উঠে ভেগেছে পাহাড়ের আড়ালে। এবার আমিও পানিতে নেমে গেলাম। পরিষ্কার পানিতে লাল রঙ দেখে টের পেলাম কোথায় আছে জন্তুটা। নৌকা থেকে শক্ত

একটা দড়ি নিয়ে বেঁধে দিলাম সেটার এক পায়ের সাথে। নিগ্রোদেরকে ইশারা করলাম টেনে তোলার জন্যে।

অল্প সময়ের মধ্যেই লোকগুলো জন্তুটাকে উঠিয়ে ফেললো ডাঙার ওপর। এতক্ষণে আমি চিনতে পারলাম–বিরাট এক চিতাবাঘ। আমার পক্ষ থেকে ওদের জন্য উপহার ওটা, ইশারায় জানালাম আমি। সঙ্গে সঙ্গে খুশিতে চিতাটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো লোকগুলো। সুঁচালো আগাওয়ালা এক রকম কাঠ দিয়ে খুব অল্প সময়ের মধ্যে ছাড়িয়ে ফেললো চামড়া। আমাকে খানিকটা মাংস দিতে চাইলো। সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করে শুধু চামড়াটা চাইলাম আমি। আনন্দের সঙ্গে ওরা জিনিসটা দিলো। এরপর ওরা আরও শুকনো মাছ, কিছু ফলমূল এবং শস্যদানা এনে দিলো আমাদের। এবার পানির জন্যে ইশারা করলাম আমি। একটা পানির পাত্র উল্টো করে ধরে বোঝাতে চাইলাম যে, সেটা খালি, আমরা ভরে নিতে চাই ওটা। একজন নিগ্রো কিচিরমিচির করে কি যেন বললো। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চলে গেল কয়েকজন। একটু পরেই ফিরে এলো আবার। ওদের সঙ্গে দু'জন মহিলা–ধরাধরি করে বড়সড় একটা পানি ভর্তি মাটির পাত্র নিয়ে এসেছে। যুরিকে পাঠালাম আমাদের পানির পাত্রগুলো দিয়ে। এক এক করে তিনটে পাত্রই ভরে নিয়ে এলো ও। ইশারায় আরেকবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বিদায় নিলাম আমরা।

নিগ্রোদের কাছ থেকে বিদায় নেয়ার পর এগারো দিন কেটে গেছে। উপকূলের সঙ্গে একই রকম দূরত্ব বজায় রেখে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে চলেছি। আগের মতোই শান্ত সমুদ্র। এখনো কোনো ইউরোপীয় জাহাজের দেখা পাইনি। ক্রমেই হতাশ হয়ে পড়ছি–আর কতদিন এরকম ভাসতে থাকবো অকূল সাগরে?

যুরিকে হাল ধরতে বলে কেবিনে এসে বসলাম আমি। ফুরিয়ে এসেছে নিগ্রোদের কাছ থেকে আনা খাবার এবং পানি। আর একদিনও যাবে কিনা সন্দেহ। এরপর কি করবো? পানি না হয় পাবো ডাঙায় নামলে, কিন্তু খাবার? এতটুকু এক নৌকা নিয়ে উপকূল থেকে দূরে সরে যাওয়াও ঝুঁকিপূর্ণ–একবার বাতাস বেড়ে গেলে আর কোনোদিনই হয়তো কূলের কাছে ফিরে আসা যাবে না। এই রকম সাত-পাঁচ ভাবছি, এমন সময় হঠাৎ শুনতে পেলাম যুরির গলা, 'জাহাজ, জাহাজ! পালতোলা জাহাজ!'

সঙ্গে সঙ্গে প্রায় লাফ দিয়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে এলাম আমি। যুরির দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকাতেই দেখতে পেলাম জাহাজটা। বেশ দূরে। কিছুক্ষণের মধ্যে বুঝতে পারলাম–ওটা পর্তুগীজ জাহাজ। মনে হলো, গিনি উপকূলের দিকে যাচ্ছে। একটু পরেই দিক বদলালো জাহাজটা। তার মানে গিনি উপকূলের দিকে যাচ্ছে না! তাহলে? যা-ই হোক, যেখানেই যাক, ওটার কাছাকাছি পৌঁছুতে হবে। যুরিকে উঠিয়ে দিয়ে হাল ধরলাম আমি।

যতটা সম্ভব দ্রুতগতিতে নৌকা চালানোর চেষ্টা করছি। কিন্তু এর মধ্যে বুঝতে শুরু করেছি, কোনো ভাবেই জাহাজটার কাছাকাছি যেতে পারবো না আমরা। নৌকার চেয়ে অনেক দ্রুতগামী ওটা।

আবার হতাশায় ছেয়ে যেতে চাইছে মন। হঠাৎ খেয়াল করলাম, পাল গুটিয়ে

নিচ্ছে জাহাজটা। তড়াক করে লাফিয়ে উঠলো আমার হৃৎপিণ্ড। তার মানে দেখতে পেয়েছে ওরা! তাছাড়া পাল গুটিয়ে নেয়ার আর কোনো কারণ নেই। ওদের কাছে দূরবীন আছে নিশ্চয়ই। ইউরোপীয় ঢংয়ের নৌকা দেখে হয়তো ভেবেছে, জাহাজডুবির পর বেঁচে গেছি আমরা।

হাত পা নেড়ে আমাদের দুরবস্থার কথা বোঝাতে চেষ্টা করলাম। গুলি ছুঁড়লাম একবার। দুটোই দেখতে পেলো ওরা। পরে জেনেছিলাম বন্দুকের শব্দ শুনতে পায়নি, আগুন আর ধোঁয়া দেখেছিলো শুধু। ধীরে ধীরে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো ওরা। আমরাও এগোতে লাগলাম ওদের দিকে।

তিন ঘণ্টা পর পর্তুগীজ জাহাজটার কাছে পৌঁছুলো আমার নৌকা। প্রথমে পর্তুগীজ, পরে স্প্যানিশ এবং সবশেষে ফ্রেঞ্চ ভাষায় আমার সঙ্গে আলাপ করার চেষ্টা করলো ওরা। কিন্তু তিনভাষার একটাও বুঝি না আমি। শেষ পর্যন্ত জাহাজের এক স্কচ নাবিককে আনা হলো। এই লোকটার মাধ্যমে কথাবার্তা শুরু করলাম ক্যাপ্টেনের সঙ্গে। জানা গেল, ব্রাজিলের দিকে যাচ্ছে জাহাজটা।

জলদস্যুদের হাতে পড়ার পর থেকে যা যা ঘটেছে, খুলে বললাম সংক্ষেপে। সব শুনে জিনিসপত্র সমেত আমাকে এবং যুরিকে জাহাজে তুলে নিতে রাজি হলেন ক্যাপ্টেন।

গত দিনগুলো যে রকম দুঃসহ অবস্থার ভেতর কাটিয়েছি তা থেকে মুক্তি পেয়ে রীতিমতো বর্তে গেলাম আমি। পারলে সঙ্গে সামান্য যা কিছু আছে সবই দিয়ে দি ক্যাপ্টেনকে। মুখ ফুটে বললামও কথাটা।

'উঁহু,' বললেন ক্যাপ্টেন। 'কোনো প্রতিদান পাওয়ার আশায় তোমাকে বাঁচাইনি। ভবিষ্যতে আমিও তোমার মতো দুরবস্থায় পড়তে পারি। সে সময় যেন বাঁচতে পারি তাই একটু পুণ্য সঞ্চয় করে রাখলাম। তাছাড়া,' বলে যেতে লাগলো ক্যাপ্টেন, 'ব্রাজিলে পৌঁছে ওগুলো লাগবে তোমার। ওগুলো যদি আমি নিয়ে নেই, তাহলে ওখানে গিয়ে না খেয়ে মরতে হবে তোমাকে। না, সিনোর ইঙ্গল্স (মানে ইংরেজ), কিছু দিতে হবে না, এসব জিনিসের বিনিময়ে বাড়ি ফেরার টাকা সংগ্রহ করতে হবে তোমাকে।'

সুতরাং ও ব্যাপারে আর কথা বাড়ালাম না আমি। জাহাজের অন্য নাবিকদের কড়াকড়িভাবে নিষেধ করে দিলেন ক্যাপ্টেন, যেন আমার কাছ থেকে কেউ কিছু না নেয়।

আমার নৌকাটা খুব পছন্দ হয়ে গেল ক্যাপ্টেনের। ওটা কিনতে চাইলেন তিনি। আমি এমনিই দিয়ে দিতে চাইলাম, কিন্তু কিছুতেই রাজি করাতে পারলাম না তাঁকে। শেষ পর্যন্ত তাঁর উপরই ছেড়ে দিলাম দামের ব্যাপারটা। বললাম, 'আপনার যা ইচ্ছে হয় দেবেন।'

আশি ডুকাট দিতে চাইলেন ক্যাপ্টেন। ষাট ডুকাটের বিনিময়ে যুরিকেও কিনতে চাইলেন তিনি। রাজি হলাম না আমি। হতভাগ্য ছেলেটার স্বাধীনতা আমি বিক্রি করবো কিভাবে–বিশেষ করে পরম নির্ভরতার সঙ্গে, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমার সাথে যে এসেছে তার স্বাধীনতা? কেন আমি যুরিকে বিক্রি করতে চাই না খুলে বললাম ক্যাপ্টেনকে।

আমার যুক্তিটা বুঝতে পারলেন ক্যাপ্টেন। শেষে বললেন, 'ও যদি খ্রীষ্টান হয়, তাহলে দশ বছর পর ওকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দেবো আমি।'

যুরি জানালো, ওর কোন আপত্তি নেই। অতএব ক্যাপ্টেনের সম্পত্তিতে পরিণত হলো যুরি।

বাইশ দিন পর আমরা ব্রাজিলের 'তোদোস লস স্যান্টোস' বা অল সেইন্টস উপসাগরে পৌঁছুলাম। পরদিন ব্রাজিলের উপকূলে নোঙ্গর ফেললো জাহাজ।

ক্যাপ্টেনের চমৎকার ব্যবহারের কথা কোনোদিন ভুলতে পারবো না। আমাকে ব্রাজিল পর্যন্ত নিয়ে আসার ভাড়া হিসেবে এক পয়সাও নিলেন না, উপরন্তু দিলেন নৌকার দাম হিসেবে আশি ডুকাট, চিতাবাঘের চামড়ার জন্যে বিশ ডুকাট, সিংহের চামড়াটার জন্যে চল্লিশ ডুকাট এবং আমার অন্যান্য জিনিসের জন্যে আরও বিশ ডুকাট। মোট দুশো বিশ ডুকাট থলেতে নিয়ে ব্রাজিলের মাটিতে পা রাখলাম আমি।

চার

ব্রাজিলে খুব বেশি দিন বসে থাকতে হলো না, ক্যাপ্টেনের সুপারিশে তাঁর এক বন্ধুর খামারে কাজ পেয়ে গেলাম। আখের খামার, সেই সাথে আছে আখ থেকে চিনি তৈরির কারখানা। কিছুদিন কাটালাম এখানে। আখ চাষ এবং চিনি বানানোর কলাকৌশল শিখে নিলাম অল্প সময়েই। সঙ্গে সঙ্গে, কত দ্রুত বড়লোক হয় খামার মালিকরা, কত আরাম আয়েশে থাকে তারা, সে সম্পর্কেও ধারণা পেলাম। সব দেখে শুনে আপাতত ব্রাজিলেই বসতি করবো বলে ঠিক করলাম। লণ্ডনে যে টাকা রেখে এসেছিলাম সেগুলো আনানোর চিন্তা ভাবনা করতে লাগলাম। ইতিমধ্যে এখানে কাজ করে যে টাকা জমিয়েছি তা দিয়ে কিছু জমি কিনে ফেললাম। ছোট একটা খামার গড়ে তুললাম কয়েক মাসের ভেতর।

পড়ো জমিকে চাষোপোযোগী করে তুলতেই চলে গেল দুটো বছর। সামান্য কিছু খাদ্য ছাড়া আর কিছু ফলাতে পারিনি এই দুবছরে। তৃতীয় বছর, তামাক চাষ করলাম কিছু জমিতে। পরের বছর যাতে আখ চাষ করতে পারি সে জন্যে প্রাণপাত পরিশ্রম করে বড়সড় একখণ্ড জমিও তৈরি করে ফেলতে পারলাম। একা একা মাঠে কাজ করতে করতে জান বেরিয়ে যাবার দশা। যুরিকে ছেড়ে দেওয়ার কথা ভেবে প্রায়ই আজকাল দুঃখ হয়।

ওয়েলস নামে আমার এক পড়শী আছে—পর্তুগীজ। লোকটা লিসবনের হলেও তার বাপ-মা ছিলো ইংরেজ। ও-ও আমার মতো একা একা জমির কাজ করে। বেশ ভাব হয়ে গেছে ওর সঙ্গে। আশপাশের আরও দু'একজন খামার মালিকের সঙ্গেও খাতির হয়ে গেছে।

নিজের দেশ ছেড়ে পাঁচ হাজার মাইল দূরে, আত্মীয় স্বজনহীন এই বিদেশে

মোটামুটি ভালই আছি আমি। বাপ-মা এবং বন্ধুবান্ধবদের জন্যে মাঝে মাঝে মন কেমন করলেও; মাঠের কাজ, খামার করে বড়লোক হওয়ার স্বপ্ন আর নতুন বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মেরে ভালোই কেটে যাচ্ছে দিনগুলো। ইতিমধ্যে সেই পর্তুগীজ জাহাজের ক্যাপ্টেন অন্য এক ইংরেজ বণিকের সহায়তায়, ইংল্যাণ্ডে রেখে আসা আমার দুশো পাউণ্ডের অর্ধেক অর্থাৎ একশো পাউণ্ড খরচ করে খামারের জন্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, বাসনকোসন এবং আসবাবপত্র এনে দিয়েছেন। ছয় বছরের চুক্তিতে আমার সাথে কাজ করার জন্যে একটা চাকরও দিয়েছেন। প্ল্যান্টেশন থেকে টাকা আয় করে বড়লোক হওয়ার স্বপ্নটা যদিও এখনো স্বপ্নই রয়ে গেছে তবু আশা ছাড়িনি আমি। সবে তো তিনটে বছর মাত্র গেল। এই তিন বছর একা একাই কাজ করেছি। এবার সাহায্য করার মতো একজন লোক তো পাওয়া গেছে।

কয়েকদিন পর এক বুদ্ধি খেললো আমার মাথায়। নতুন আনা যন্ত্রপাতি, বাসনকোসন এমন কি কাপড়চোপড়গুলো পর্যন্ত খাস ইংল্যাণ্ডের তৈরি। এখানকার প্রতিষ্ঠিত খামার মালিকদের কাছে খুবই চাহিদা ওসব জিনিসের। একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো রেখে বাকিগুলো চারগুণ দামে বিক্রি করে দিলাম। বেশ কিছু নগদ টাকা চলে এলো হাতে। এই টাকা দিয়ে একটা নিগ্রো দাস কিনলাম এবং আরেকজন শ্বেতাঙ্গ চাকর রাখলাম।

এবার কোমর বেঁধে লাগলাম চাষ বাসের কাজে। প্রথম বছরেই অভাবনীয় সাফল্যের মুখ দেখলাম। আমার নিজের জমি থেকে পেলাম প্রায় পঞ্চাশ গাঁট তামাক। প্রত্যেকটা গাঁটের ওজন পাঁচ হন্দরের ওপর। তামাকও একেবারে প্রথম শ্রেণীর। সুতরাং দামটাও পেলাম প্রথম শ্রেণীর।

ব্রাজিলে আসার পর চার বছর কেটে গেছে। নিজের পায়ে দাঁড়াতে শুরু করেছে আমার খামার। আর আমি নিজে একমাত্র ভাষা শেখা ছাড়া আর সবদিক থেকে পুরোপুরি ব্রাজিলিয়ান হয়ে গেছি। আগেই বলেছি, স্থানীয় অনেক খামার মালিকের সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। প্রায়ই আমি ওদের কাছে আমার গিনি উপকূল ভ্রমণের গল্প করি। গল্প করতে করতে একদিন বলে ফেললাম, ছুরি-কাঁচি, কাচের চুড়ি, বাচ্চাদের খেলনা এসব তুচ্ছ জিনিসের বিনিময়ে সেখান থেকে শুধু সোনার গুঁড়ো, হাতির দাঁত এগুলোই না, প্রয়োজনে খুব সহজে কাজ করানোর জন্যে নিগ্রোদেরও ধরে আনা যায়।

মন দিয়ে কথাগুলো শুনলো ওরা। নিগ্রোদের ধরে আনার ব্যাপারে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে অনেক কিছু জেনে নিলো। আমিও যতটুকু জানা ছিলো বললাম।

পরদিন সকালে তিন খামার মালিক এসে হাজির। একথা সেকথার পর বললো, আফ্রিকায় একটা জাহাজ পাঠানোর কথা ভাবছে তারা। নিগ্রোদের ধরে এনে সবাই মিলে ভাগ করে নিতে চায়। কারণ কাজের লোকের অভাবে কেউই ঠিক মতো খামার চালাতে পারছে না। আর এখানে একেকটা নিগ্রো দাসের যা দাম, অত দাম দিয়ে দাস কেনার কথা কেউ কল্পনাও করতে পারে না। তাছাড়া প্রকাশ্যে দাস কেনা বেচার ব্যাপারে স্পেন ও পর্তুগালের রাজাদের অনুমতি

দরকার। 'সুতরাং, আমাদের প্রস্তাব হলো, তুমি একটা জাহাজ সংগ্রহ করে কিছু জিনিসপত্র নিয়ে আফ্রিকার দিকে রওনা হয়ে যাও। সব খরচ খরচা আমাদের। কষ্ট যেহেতু তুমি করবে, অতএব নিগ্রোদের ভাগ তুমি আমাদের সমানই পাবে।'

যুক্তিসঙ্গত প্রস্তাব–অবশ্য যাদের কিছু নেই তাদের জন্যে। এই মুহূর্তে আমার যা আছে, তা যদি ঠিক মতো কাজে লাগাই, এবং ইংল্যাণ্ডে রেখে আসা বাকি একশো পাউণ্ড বা সেই দামের জিনিসপত্র আনিয়ে নেই তাহলে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে কয়েকগুণ বাড়িয়ে ফেলতে পারবো আমার সম্পদের পরিমাণ। কিন্তু আমিই আমার সবচেয়ে বড় শত্রু: অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে রাজি হয়ে গেলাম ওদের প্রস্তাবে। শুধু বললাম, 'আমার খামারটা দেখাশোনা করার প্রতিশ্রুতি যদি দাও তোমরা তাহলে যেতে পারি।'

রাজি হলো ওরা। সেই পর্তুগীজ ক্যাপ্টেনকে জিম্মাদার করে একটা উইল করলাম। উইলে এরকম ব্যবস্থা রাখলাম যে, আমি যদি ফিরে আসতে না পারি, তাহলে আমার সম্পত্তির অর্ধেক পাবেন ক্যাপ্টেন, বাকি অর্ধেক পাঠিয়ে দেয়া হবে ইংল্যাণ্ডে।

কয়েক মাস কেটে গেল যাত্রার আয়োজন করতে। আমার অনুপস্থিতিতে খামারটার যাতে ঠিক মতো তদারকি হয় সে ব্যবস্থাও করে ফেললাম এ সময়ের মধ্যে।

ছাড়বার জন্যে তৈরি হয়ে বন্দরে অপেক্ষা করছে জাহাজ। প্রয়োজনীয় সব কিছু বোঝাই দেয়া শেষ। এখন শুধু পাল তুলে দিলেই হল। নিয়তির অমোঘ বিধান–বাবা-মাকে ছেড়ে আসার আট বছর পর একই দিনে, আর এক অশুভ মুহূর্তে, ১৬৫৯ সালের পহেলা সেপ্টেম্বর আবার জাহাজে চাপলাম আমি।

একশো বিশ টনি জাহাজ। ছ'টা কামান এবং চোদ্দ জন নাবিক রয়েছে ওতে। এছাড়া আছে ক্যাপ্টেন, তার ছেলে আর আমি। বড়সড় এবং ভারী কোনো মাল নেই জাহাজে। নিগ্রোদের সঙ্গে ব্যবসার জন্যে কাচের চুড়ি, মালা, ঝিনুক, ছোট ছোট আয়না, ছুরি, কাঁচি, ছোট কুঠার; এই ধরনের তুচ্ছ সব জিনিস সঙ্গে নিয়েছি আমরা।

আমি জাহাজে ওঠার কিছুক্ষণের ভেতরেই নোঙ্গর উঠিয়ে পাল তুলে দিলো মাঝি মাল্লারা। চমৎকার আবহাওয়া। তরতরিয়ে চললো জাহাজ। ক্যাপ্টেনের পাশে দাঁড়িয়ে দৃষ্টি মেলে দিলাম পুব দিকে। আফ্রিকার উপকূলে পৌঁছুতে হলে এই পুব দিকেই যেতে হবে।

ব্রাজিলের উপকূল ধরে চলেছি আমরা। চমৎকার আবহাওয়া। শুধু একটু বেশি গরম, এই যা। সেন্ট অগাস্টিনো অন্তরীপে এসে উপকূল থেকে সরে গভীর সমুদ্রের দিকে এগোতে লাগলো জাহাজ। উত্তর-উত্তর-পূর্ব দিকে জাহাজ চালাচ্ছেন ক্যাপ্টেন। এই দিকে যেতে থাকলে ফার্নান্দ দ্য নোরোনহা দ্বীপের পুব পাশ ঘেঁষে এগিয়ে যাবো আমরা।

বারো দিন চলার পর ৭ ডিগ্রি ২২ মিনিট উত্তর অক্ষাংশে পৌঁছুলো জাহাজ। এমন সময় সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে, কোনো রকম জানান না দিয়ে উঠলো ঝড়। প্রচণ্ড ঝড়। দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে শুরু হয়ে প্রথমে উত্তর-পশ্চিম দিকে তারপর

উত্তর-পূর্ব দিকে বয়ে যেতে লাগলো। ঝড়ের দাপটে অসহায় ভাবে ভেসে যাওয়া ছাড়া আর কিছু করতে পারলাম না আমরা। নিজেদেরকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়েছি—ঝড় তার ইচ্ছে মতো যেখানে নিয়ে ফেলে সেখানেই যেতে হবে আমাদের।

একদিন গেল। দুদিন গেল। সমানে বয়ে চলেছে ঝড়। কমার কোনো লক্ষণ নেই। প্রতিদিনই মনে হয়, এই বুঝি সাগর গিলে ফেললো আমাদের, এমন ভয়ানক ফুঁসছে সমুদ্র!

বারো দিনের দিন একটু কমলো বাতাস। সমুদ্রের ফোঁসফোঁসানিও কমলো একটু। কোথায় আছি তা জানার জন্যে সাধ্যমতো হিসেব নিকেষ করলেন ক্যাপ্টেন। দেখা গেল, ১১ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশে আছে আমাদের জাহাজ। কিন্তু দ্রাঘিমাংশ দেখেই ভীমরি খাওয়ার দশা হলো: সেন্ট অগাস্টিনো অন্তরীপ থেকে ২২ ডিগ্রি সরে এসেছি আমরা। ক্যাপ্টেন জানালেন; ব্রাজিলের উত্তর অংশে, আমাজন নদীর মোহনা থেকে বেশ দূরে, গায়না উপকূলের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছি আমরা।

একটানা বারো দিন ঝড়ের দাপট সয়ে বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছে জাহাজ। ক্যাপ্টেনের মতে ব্রাজিল উপকূলে ফিরে যাওয়াই মঙ্গলজনক হবে এখন।

সঙ্গে সঙ্গে আমি নাকচ করে দিলাম প্রস্তাবটা। সন্দেহ নেই, খুবই নড়বড়ে অবস্থা হয়েছে জাহাজের। এই জাহাজ নিয়ে আটলান্টিক পাড়ি দেয়ার সাহস অতি বড় দুঃসাহসীও পাবে কিনা সন্দেহ। তবু ফিরে যাওয়ার কথা আমি ভাবতে পারলাম না। আমেরিকার উপকূলীয় এলাকার মানচিত্রগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম। কিন্তু কাছাকাছি এমন কোনো জনবসতিপূর্ণ এলাকার খোঁজ পেলাম না যেখানে জাহাজটাকে মেরামত করে নেয়া যায়। শেষ পর্যন্ত ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জের বারবাডোসে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম।

জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন ক্যাপ্টেন। পশ্চিম-উত্তর-পশ্চিম দিকে চলতে লাগলো জাহাজ। কিন্তু আমাদের ভাগ্য অন্য ভাবে নির্ধারিত হয়ে ছিলো। ১২ ডিগ্রি ১৮ মিনিট অক্ষাংশে এসে আবার ঝড়ের কবলে পড়লাম আমরা। এবার ঝড় আমাদের ঠেলে এমন জায়গায় নিয়ে গেল যেটা জংলীদের রাজত্ব। এখানে যদি জাহাজডুবি হয় তো সাগরে ডুবে না মরলেও সাঁতারে তীরে ওঠার পর জংলীদের খাবার হওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না।

কয়েক দিন পার হয়ে গেল। এখনো ভেঙে পড়েনি বা ডুবে যায়নি আমাদের জাহাজ। ঝড়ের দাপটও কমেনি মোটেই, বরং বেড়ে চলেছে। আর কতক্ষণ এই দাপট সহ্য করতে পারবে আমাদের নড়বড়ে জাহাজ কে জানে?

এমনি যখন দুরবস্থা আমাদের তখন একদিন ভোরবেলা এক খালাসী চীৎকার করে উঠলো, 'তীর দেখা যায়! তীর দেখা যায়!'

লাফ দিয়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে এলাম আমরা। ঠিক সেই মুহূর্তে একটা ডুবো বেলে চরার সঙ্গে ধাক্কা খেলো জাহাজের তলা। থেমে গেল জাহাজ। ফুলে ওঠা সাগর প্রচণ্ড গর্জনে এসে ভেঙে পড়লো আমাদের ওপর। মড় মড় করে উঠলো জাহাজের কাঠামো। সমুদ্রের ফেনা আর ছিটকে আসা নোনাজলের হাত

থেকে বাঁচার জন্যে যে যে-কেবিনে পারলাম ঢুকে পড়লাম।

এরকম অবস্থায় যে কখনো পড়েনি তার পক্ষে কল্পনা করাও দুঃসাধ্য আমাদের দুরবস্থার স্বরূপ। কোথায় আছি না আছি বা ঝড়ের ধাক্কায় কোথায় এসে পড়েছি, বিন্দুমাত্র ধারণা নেই আমাদের। এরকম চরে ঠেকা অবস্থায় কতক্ষণ অক্ষত থাকবে জাহাজটা, তাও বলতে পারি না। এখনো সমানে বয়ে চলেছে ঝড়, ফুঁসে চলেছে সমুদ্র। কেবিনে বসে ঈশ্বরের নাম জপছি আর ভাবছি, এই বুঝি টুকরো টুকরো হয়ে গেল জাহাজ। প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর আশঙ্কা। কিন্তু ভাগ্য ভাল, ভেঙে পড়লো না জাহাজটা।

অবশেষে ঝড় কমলো একটু। প্রথম যে কথাটা আমাদের মনে হলো, প্রাণ বাঁচাতে হবে।

নৌকায় করে যদি কোনোরকমে তীর পর্যন্ত পৌঁছানো যায় তো বাঁচলেও বাঁচতে পারে প্রাণ। জাহাজের পেছন দিকে একটা নৌকা ছিলো। কিন্তু জাহাজটা যখন চরের সঙ্গে ধাক্কা খায়, তখন হালের সঙ্গে বাড়ি খেয়ে ভেঙে গেছে ওটা। আরেকটা নৌকা আছে, কিন্তু সেটাকে জাহাজের ধার পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে জলে ভাসানোই সমস্যা। তবু চেষ্টা করে দেখতে হবে। আসলে এছাড়া উপায়ও নেই। খোলের বেশ কয়েক জায়গায় ফাটল দেখা দিয়েছে ইতিমধ্যে। যে কোনো মুহূর্তে বিধ্বস্ত হয়ে যাবে পুরো জাহাজ।

মেট-এর নেতৃত্বে নাবিকরা অতিকষ্টে, টেনেটুনে জাহাজের এক পাশে নিয়ে গেল নৌকাটা। হাড় পানি করা পরিশ্রম করে অক্ষত অবস্থায় জলে ভাসানো হলো সেটাকে। একই রকম কষ্ট করে একে একে নৌকায় চড়ে বসলাম আমরা।

এবার আমাদের অবস্থা সত্যিই শোচনীয় হয়ে দাঁড়ালো। ঝড় একটু কমেছে ঠিকই, কিন্তু তা এমন কিছু নয় যাতে স্বস্তি বোধ করা যায়। এখনো সমুদ্র এমন চণ্ডমূর্তি ধরে আছে যে এর মধ্যে আমাদের এই ছোট্ট নৌকার পক্ষে টিকে থাকা প্রায় অসম্ভব। এখন হোক, একটু পরে হোক, ডুবতে আমাদের হবেই।

সবাই মিলে প্রাণপণে তীরের দিকে দাঁড় টানছি। দাঁড় টানছি ঠিকই, তবে এমুহূর্তে আমাদের মনের অবস্থা ফাঁসির মঞ্চের দিকে যাওয়ার সময় ফাঁসির আসামীর মনের অবস্থা যেমন হয় অনেকটা তেমন। কারণ, ভালো করেই জানি, এই ঝড়ের ভেতর তীরের কাছাকাছি পৌঁছুতে পারলেও নৌকা কূলে ভেড়াতে পারবো না আমরা। পাড়ের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে ছোট্ট নৌকাটা।

দাঁড় টেনে টেনে তীরের দিকে প্রায় দেড় লিগ মতো এগিয়ে এসেছি। এমন সময় ঘটলো ঘটনাটা—পেছন দিক থেকে পাহাড়ের মতো উঁচু একটা ঢেউ এসে পড়লো নৌকার ওপর। এমন আচমকা প্রচণ্ড রোষের সঙ্গে ঢেউটা আছড়ে পড়লো যে, সঙ্গে সঙ্গে উল্টে গেল নৌকা। মুহূর্তের মধ্যে নৌকা থেকে এবং একে অপরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম সবাই। ঈশ্বরের নাম মুখে আনারও সময় পেলাম না, গিলে ফেললো সমুদ্র।

খুব ভালো সাঁতার জানি আমি। কিন্তু প্রবল ঢেউয়ের কাছে পাত্তা পেলাম না মোটেই। পানির তলে হাবুডুবু খেতে লাগলাম। বাতাসের অভাবে দম বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে। প্রাণপণে পানির ওপরে মাথা তুলতে চেষ্টা করছি। কিন্তু পারছি

না। মনে হচ্ছে অনন্তকাল ধরে হাত পা ছুঁড়ে চলেছি।

আরেকটা ঢেউ বাঁচালো আমাকে। তার মাথায় তুলে নিয়ে তীরের দিকে এগোলো। ঢেউটা নিঃশেষ হয়ে ফিরে গেল যখন, তখন প্রায় ডাঙায় পৌঁছে গেছি। কিন্তু এর ভেতরেই আধমরা অবস্থা হয়েছে আমার। নোনাপানি খেয়ে ঢোল হয়ে গেছে পেট। কোনো রকমে উঠে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের দিকে তাকালাম। আঁতকে উঠলাম সঙ্গে সঙ্গে। সার বেঁধে একের পর এক ছুটে আসছে পাহাড়ের মত উঁচু উঁচু সব ঢেউ। ভেসে যাওয়ার ভয়ে ডাঙার দিকে ছুটতে শুরু করলাম আমি। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারলাম নিয়তিকে এড়ানো আমার সাধ্যের বাইরে।

আবার একটা ঢেউ এসে বিশ-ত্রিশ ফুট পানির নিচে কবর দিয়ে ফেললো আমাকে। অনুভব করলাম, প্রচণ্ড কোনো শক্তি অস্বাভাবিক দ্রুততায় আমাকে তীরের দিকে টেনে নিয়ে চলেছে। দম বন্ধ করে সাঁতরাতে লাগলাম। যতটুকু এগিয়ে যাওয়া যায় ততই মঙ্গল।

বাতাসের অভাবে যখন ফুসফুসের ফেটে যাওয়ার দশা তখন অনুভব করলাম ওপর দিকে উঠছি আমি। একটু পরেই পরম স্বস্তির সঙ্গে অনুভব করলাম আমার হাত এবং মাথা ভেসে উঠেছে পানির ওপর। প্রাণ ভরে শ্বাস টানলাম। নতুন করে জীবন পেলাম যেন। সাহসও ফিরে এলো মনে। কিন্তু মাত্র দু সেকেণ্ডের জন্যে। তারপরেই আবার একটা ঢেউ চাপা দিলো আমাকে। বেশ কিছুক্ষণ থাকলাম পানির নিচে। হাত পা ছুঁড়ে ভেসে উঠলাম এক সময়। ঢেউটা একটু ছোট হতেই পায়ের নিচে মাটি অনুভব করলাম।

দম নেয়ার জন্যে দাঁড়িয়ে রইলাম কয়েক মুহূর্ত। গায়ে যেটুকু শক্তি অবশিষ্ট ছিলো, সবটুকু একজায়গায় করে দৌড়াতে শুরু করলাম তীরের দিকে। কিন্তু বাঁচতে পারলাম না সাগরের রুদ্ররোষ থেকে। বার বার ঢেউ এসে ডুবিয়ে দিতে লাগলো আমাকে। তবে ভাগ্য ভাল আরো দুবার ঢেউ খানিকটা করে এগিয়ে দিলো আমাকে।

শেষ ঢেউটা আরেকটু হলেই মেরেছিলো আমাকে। প্রবল বেগে টেনে নিয়ে গিয়ে একটা পাথরের ওপর আছড়ে ফেললো। প্রবলভাবে ঠুকে গেল মাথাটা। সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারালাম আমি।

একটু পরেই অবশ্য জ্ঞান ফিরলো। সাগরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, আবার আসছে ঢেউ। তাড়াতাড়ি একটা বড় পাথরের টুকরো আঁকড়ে ধরে দম বন্ধ করে রইলাম। ঢেউটা ফিরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে শুরু করলাম আবার।

পরের ঢেউটা এসে পড়ার আগেই আমি তীরের দিকে অনেকটা পথ এগিয়ে যেতে পারলাম। এখন যদি ঢেউ আসেও, আমাকে ডুবিয়ে দিতে বা ভাসিয়ে নিতে পারবে না।

পরের ঢেউটা সত্যিই ডোবাতে পারলো না আমাকে। ঢেউটা চলে যেতেই আর এক দৌড়ে মূল ভূ-খণ্ডে পৌঁছে গেলাম। পানির হাতের বাইরে পরম নির্ভরতার সাথে বসে পড়লাম ডাঙার ঘাসের ওপর।

পাঁচ

ঈশ্বরের কৃপায় প্রাণে বেঁচে গেছি, নিরাপদে ডাঙায় পৌঁছেছি। নিজের জন্যে খোঁড়া কবরের কাছ থেকে ফিরে এলে মনের অবস্থা যেমন হয় এ মুহূর্তে আমার মনের অবস্থা ঠিক সেরকম। এই অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। শুধু এটুকু বলতে পারি নিশ্চিত মৃত্যুর দরজা থেকে ফিরে এসে অপার্থিব এক আনন্দে আপ্লুত হয়ে উঠেছে আমার হৃদয়।

একটু বিশ্রাম নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। সমুদ্র তীরে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ালাম কিছুক্ষণ। তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখলাম, আমার সাথীদের কেউ বেঁচে আছে কিনা। কিন্তু কারোই দেখা পেলাম না। পরেও আর কখনো ওদের দেখা পাইনি। তিনটে হ্যাট, একটা টুপি আর দুটো জুতো ছাড়া ওদের কোনো চিহ্নও চোখে পড়েনি।

সমুদ্রের দিকে চোখ ফিরিয়ে চরায় ঠেকে যাওয়া জাহাজটা দেখতে চেষ্টা করলাম। ঢেউগুলো এত বড় বড় আর জাহাজটা এত দূরে যে, প্রায় কিছুই দেখতে পেলাম না। খোদা! অত দূর থেকে কি করে এলাম এ পর্যন্ত!

কেমন জায়গায় এসে পড়েছি বোঝার জন্যে চারপাশটা ঘুরে দেখতে লাগলাম। সেই সাথে ভাবছি, এবার কি করা যায়? কিন্তু আশা করার মতো কিছু নজরে পড়লো না। অনাহারে অথবা বুনো জন্তুর খাদ্য হয়ে মরা ছাড়া কোনো উপায় আছে বলে মনে হচ্ছে না। সঙ্গে কোনো অস্ত্র নেই যা দিয়ে আত্মরক্ষা করতে পারি, বা ছোটোখাটো কোনো প্রাণী শিকার করে খাবারের অভাব মেটাতে পারি। পকেট হাতড়ে দেখলাম, একটা চাকু, একটা পাইপ আর একটা বাক্সে অল্প একটু তামাক ছাড়া আর কিছু নেই কাছে। হতাশায় ছেয়ে যেতে চাইছে মনটা। পাগলের মতো কিছুক্ষণ ছুটে বেড়ালাম এদিক সেদিক। সামনে রাত। জায়গাটা যদি হিংস্র জীব-জানোয়ারের রাজত্ব হয় তাহলে কি হবে কল্পনা করে শিউরে উঠলাম। হিংস্র পশুরা রাতেই বেরোয় শিকার ধরতে।

এই অবস্থায় প্রথম যে চিন্তা এলো আমার মনে তা হচ্ছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বড়সড় একটা গাছে উঠে আশ্রয় নিতে হবে। ফার গাছের মতো ঝোপ ঝোপ এবং কাঁটাওয়ালা হওয়া দরকার গাছটা। অল্প কিছুক্ষণের ভেতর পছন্দসই একটা গাছ পেয়ে গেলাম; বেশি খোঁজাখুঁজি করতে হলো না। কিন্তু গাছে ওঠার আগে পানি খাওয়া দরকার। পিপাসায় কণ্ঠতালু পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে। খাওয়ার মতো পানি পাওয়ার আশায় প্রায় এক ফার্লং এলাকা চষে ফেললাম। শেষে পেলাম পানি। প্রাণ ভরে পানি খেয়ে ফিরে এলাম গাছটার কাছে। গাছে উঠে বসার জন্যে এমন একটা ডাল বেছে নিলাম যে, রাতে ঘুমিয়ে গেলেও পড়ে যাবো না সেটা থেকে। প্রয়োজনে আত্মরক্ষা করার জন্যে ছোট একটা ডাল কেটে ছড়ি বানিয়ে নিলাম।

প্রচণ্ড ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে আছে শরীর, বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়লাম একটু পরেই।

*

ঘুম যখন ভাঙলো তখন পুরো দিন হয়ে গেছে। আবহাওয়া পরিষ্কার। ঝড়ের চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। সবচেয়ে আশ্চর্য হলাম আমাদের জাহাজটা দেখে। রাতে ঝড়ের ধাক্কায় তীরের অনেক কাছে এসে পড়েছে। তীর থেকে ওটার দূরত্ব এখন মাইলখানেকের বেশি না। এত ঝড় ঝড়াতেও জাহাজটার কিছু হয়নি যেন। মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জাহাজটায় যাওয়ার জন্যে মনে মনে একটা তাগিদ অনুভব করলাম। অন্ততপক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস রক্ষা করার জন্যে হলেও ওখানে আমার যাওয়া দরকার।

গাছ থেকে নেমে চারপাশটা আরেকবার দেখলাম ভালো করে। প্রথম যে জিনিসটা নজরে পড়লো: ডান দিকে মাইল দুয়েক দূরে সৈকতের ওপর একটা নৌকা। দ্রুত হাঁটতে শুরু করলাম সেদিকে। কিছুদূর যাওয়ার পর দেখতে পেলাম, প্রায় আধ মাইল চওড়া একটা খাঁড়ি দুটুকরো করে ফেলেছে সৈকতটাকে। এই খাঁড়ি পার হলে তবে পৌঁছানো যাবে নৌকাটার কাছে। আপাতত দরকার নেই ওখানে গিয়ে। এই মুহূর্তে নৌকাটার চেয়ে জাহাজটার কাছে যাওয়া জরুরী। ফিরে এলাম আগের জায়গায়।

দুপুরের একটু পরে একেবারে শান্ত হয়ে গেল সমুদ্র। ভাটার টানের পানি এত দূরে সরে গেছে যে হেঁটে অনায়াসে জাহাজের সিকি মাইলের ভেতর চলে যাওয়া যাবে।

রওনা হলাম আমি। হেঁটে পৌঁছুলাম পানির ধার পর্যন্ত। তারপর কাপড়-চোপড় খুলে রেখে পানিতে নেমে সাঁতরাতে লাগলাম জাহাজের দিকে। বেশিক্ষণ লাগলো না কাছে পৌঁছুতে। কিন্তু কিভাবে উঠবো ওতে? ডেকটা অনেক উঁচু। আর জাহাজের বাইরের দিকে নাগালের মধ্যে এমন কিছু নেই যা ধরে উপরে উঠতে পারি। সাঁতরে দুবার চক্কর দিলাম জাহাজটাকে। দ্বিতীয় চক্করের সময় খেয়াল করলাম, সামনের নোঙ্গরের জায়গা থেকে সরু একটা রশি ঝুলে আছে। রশিটা ধরে হাচড়ে-পাচড়ে উঠে পড়লাম জাহাজের ফোক্যাস্‌ল-এ।

দেখলাম, বেশ পানি জমেছে খোলে। জাহাজের পেছনটা চরায় ঠেকেছে, ফলে সামনের দিকটা নুয়ে পড়েছে পানির ভারে। ক্যাপ্টেন আর খালাসীদের থাকার জায়গা-গুলোয় পানি পৌঁছুতে পারেনি। আরো দেখলাম, জাহাজের প্রায় সব জিনিস অক্ষত এবং প্রায় শুকনো রয়েছে। প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে, তাই আর দেরি না করে ভাঁড়ার ঘরে ঢুকলাম। প্রচুর বিস্কুট রয়েছে সেখানে। গোগ্রাসে বিস্কুট খেয়ে পেট ভরালাম। কাজে লেগে গেলাম তারপর। একটু পরেই বুঝতে পারলাম, জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়ার জন্যে একটা নৌকা দরকার আমার। কিন্তু কোথায় পাবো নৌকা? জাহাজের একমাত্র অক্ষত নৌকাটা নিয়েই তো কাল সাগরে ভেসেছিলাম।

যা নেই তা পাওয়ার আশায় চুপচাপ বসে থেকে সময় নষ্ট করার মানে হয় না। একটা ভেলা তৈরি করবো ঠিক করলাম। প্রচুর দড়ি আছে জাহাজে। দু'তিনটে বড় বড় গুঁড়ি এবং একটা অতিরিক্ত মাস্তুলও আছে। প্রচণ্ড পরিশ্রম করে এক জায়গায় জড়ো করলাম গুঁড়িগুলো। প্রত্যেকটাকে আলাদা আলাদা করে

বাঁধলাম ভালো করে, যাতে পানিতে ফেললে ভেসে না যায়। তারপর সবগুলো একটা একটা করে নামিয়ে দিলাম পানিতে। আমিও নেমে গেলাম। চারটে গুঁড়ি পাশাপাশি রেখে বেঁধে ফেললাম প্রান্তগুলো। ছোট ছোট দুটো তক্তা বেঁধে দিলাম আড়াআড়ি ভাবে। তৈরি হয়ে গেল ভেলা। উঠলাম ভেলার ওপর। মোটামুটি ওজন নেওয়ার মতো হয়েছে মনে হচ্ছে। তবে বেশি জিনিস নিলে কি হয় বলা যায় না।

ভেলাটা জাহাজের পাশে বেঁধে আবার ডেকে উঠলাম। জাহাজের যন্ত্রপাতি রাখার ঘরে গিয়ে করাত নিয়ে এলাম। মাস্তুলটাকে তিন ভাগ করে ওগুলোও নামালাম পানিতে। তারপর জুড়ে দিলাম ভেলার সাথে। এবার ওটায় চড়েই বুঝতে পারলাম, যথেষ্ট ওজন নিতে পারবে।

মাল বোঝাই দেওয়ার পালা এবার। প্রথমে তিনটে জাহাজী সিন্দুক টানা-হ্যাঁচড়া করে নিয়ে এলাম ডেকে। সেগুলো খালি করে একটা একটা করে নামিয়ে দিলাম ভেলার ওপর। প্রথম সিন্দুকটা ভরলাম খাবার দিয়ে-যেমন: রুটি, চাল, তিনটে ওলন্দাজ পনির, পাঁচ তাল ছাগলের শুকনো মাংস আর সামান্য কিছু শস্যদানা। মুরগির খাবার হিসেবে আনা হয়েছিলো দানাগুলো। এখন অবশ্য সামান্যই অবশিষ্ট আছে। ইঁদুরে খেয়ে নষ্ট করে ফেলেছে বেশির ভাগ। মুরগিগুলো মারা গেছে ঝড়ে। ক্যাপ্টেনের কেবিনে পেলাম গ্যালন ছয়েক মদ আর কিছু কর্ডিয়াল ওয়াটার। অনেক খোঁজাখুঁজির পর ছুতোর মিস্ত্রীর বাক্সটা খুঁজে পেলাম। এক জাহাজ বোঝাই সোনার চেয়ে এই জিনিসটার দাম এখন অনেক বেশি আমার কাছে। ভেলার ওপর নামালাম সব।

জোয়ার আসতে শুরু করেছে। খুব ধীরে হলেও বাড়ছে পানি। তীরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, ভেসে যাচ্ছে আমার খুলে রেখে আসা কোট, শার্ট, ওয়েস্ট কোট। এবার তাহলে কিছু কাপড়-চোপড় খুঁজতে হয়। প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশিই পেলাম। কিন্তু আপাতত যা যা দরকার তার চেয়ে বেশি নিলাম না। ভেলার ওপর নামিয়ে রাখলাম ওগুলো।

কিছু অস্ত্রের খোঁজ করলাম এবার। দুটো বন্দুক আর দুটো পিস্তল পেলাম বড় কেবিনে। কয়েকটা বারুদের চোঙা, ছোট এক ব্যাগ গুলি এবং মরচে ধরা দুটো পুরনো তলোয়ারও পাওয়া গেল। যত্নের সাথে ভেলার ওপর নামিয়ে রাখলাম সব। তিন পিঁপে বারুদ আছে জাহাজে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর পেলাম সেগুলো। দুটো পিঁপে শুকনোই আছে, তৃতীয়টায় পানি ঢুকেছে। শুকনো পিঁপে দুটোও নামালাম ভেলায়।

এবার ফিরতে হবে। কিন্তু পাল নেই, দাঁড় নেই, হাল নেই; কিভাবে ভেলাটা তীর পর্যন্ত নিয়ে যাবো? তিনটে ব্যাপার দেখে একটু স্বস্তি পেলাম-প্রথমত, শান্ত সমুদ্র; দ্বিতীয়ত, জোয়ার আসছে বলে তীরের দিকে যাচ্ছে স্রোত; তৃতীয়ত, সামান্য যেটুকু বাতাস বইছে তা-ও তীরের দিকেই। যাহোক, আর একটু খোঁজাখুঁজি করতেই দু-তিনটে ভাঙা দাঁড়, দুটো করাত, একটা কুড়াল এবং একটা হাতুড়ি পেয়ে গেলাম। ছুতোর মিস্ত্রির বাক্সে যে-সব যন্ত্রপাতি আছে সেগুলোর অতিরিক্ত এই যন্ত্রগুলোও নিলাম সঙ্গে। তারপর ভাসিয়ে দিলাম ভেলা।

অনুকূল বাতাস আর স্রোতের টানে তীরের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো

ভেলা। কিছুদূর ভালোই চললো। তবে প্রথম যেখানে তীরে উঠেছিলাম সেখান থেকে একটু দূরে চলে এলো ভেলাটা। অনুমান করলাম, নদী বা খাঁড়ি জাতীয় কিছু একটা আছে তীরের এদিকটায়। জোয়ারের পানি বেগে তার ভেতর ঢুকছে বলেই ভেলাটা স্রোতের টানে চলে এসেছে এপাশে।

ঠিক তা-ই। আর একটু এগাতেই পাড়ের এক জায়গায় একটা খোলা মুখ দেখতে পেলাম। ছোট্ট একটা নদীর মোহনায় এসে পড়েছি। প্রবল স্রোত তৈরি করে জোয়ারের পানি ঢুকছে সেই নদীতে। ভাঙা দাঁড় দিয়ে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলাম স্রোতের মাঝামাঝি থাকার। কিন্তু পারা গেল না। জোয়ারের তোড়ে ভীষণভাবে ছুটে যেতে লাগলো ভেলা। একবার এদিকে যাচ্ছে একবার ওদিকে যাচ্ছে। হঠাৎ একটা চরের সঙ্গে ধাক্কা খেলো ভেলাটা। ঝাঁকুনিতে আর একটু হলেই জিনিসপত্র সব পড়ে যাচ্ছিলো পানিতে। একপাশে সরে গেল সিন্দুকগুলো। কাত হয়ে গেল ভেলা। দাঁড় ফেলে লাফ দিয়ে গিয়ে ধরলাম ওগুলো। দুটো হাতে তিনটে সিন্দুক ধরে থাকা সোজা কথা নয়। প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ার দশা হলো আমার। গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে ভেলার মাঝামাঝি রাখার চেষ্টা করলাম সিন্দুককটা।

প্রচণ্ড পরিশ্রমের পর আবার ভেলার মাঝামাঝি নিয়ে আসতে পারলাম সিন্দুকগুলো। এখন আর কাত হয়ে থাকছে না ভেলা। দাঁড় তুলে নিলাম আবার। ভাগ্য ভালো, এখনো নদীর ভেতর ঢুকে পড়েনি ভেলাটা। তবে খুব একটা বাকিও নেই। এখনই যদি তীরে পৌঁছুতে না পারি তাহলে ঢুকে পড়া ঠেকাতে পারবো না। নদীর ভেতর স্রোত অনেক বেশি, ভেলা নিয়ন্ত্রণে রাখা যাবে না।

এবারও ভাগ্যের সহায়তা পেলাম। খাঁড়ির ডান তীরে ছোট্ট একটা উপসাগর মতো রয়েছে। খুব একটা স্রোত নেই ওখানে। প্রচণ্ড পরিশ্রমের পর ভেলাটাকে নিয়ে যেতে পারলাম সে জায়গায়। দাঁড় নামিয়ে দিতেই মাটির নাগাল পেলাম। এখানে পাড় এমন খাড়া ভাবে উঠে গেছে যে, ভেলা তীরে ভেড়াতে পারলেও জিনিস পত্র নামাতে পারবো বলে মনে হল না। দুটো ভাঙা দাঁড় শক্ত করে গেঁথে দিলাম মাটির সঙ্গে। থেমে গেল ভেলা। অপেক্ষা করতে লাগলাম।

ভাটার সময় নেমে গেল পানি। মালপত্র সমেত ভেলাটাকে রেখে গেল সৈকতের ওপর।

এবার ঘুরেফিরে দেখতে হবে জায়গাটা। কোথায় আছি, এটা কি মহাদেশের অংশ নাকি দ্বীপ, এখানে লোক বসতি আছে না নেই, কিছুই জানি না। এখন যেখানে আছি সেখান থেকে মাইল খানেক দূরে বেশ উঁচু একটা পাহাড় খাড়া উপর দিকে উঠে গেছে। একটা বন্দুক একটা পিস্তল আর এক চোঙা বারুদ নিয়ে রওনা হলাম পাহাড়টার দিকে।

অনেকটা সময় ব্যয় করতে হলো চূড়ায় উঠতে। পরিশ্রমও হলো খুব। তবে চার-দিকে তাকাতেই আমার অবস্থা সম্পর্কে পরিষ্কার একটা ধারণা পেয়ে গেলাম। ছোট একটা দ্বীপে এসে উঠেছি আমি। চারদিকে সমুদ্র। দূরে কয়েকটা ছোট ছোট মাথা বের করা ডুবো পাহাড় আর পশ্চিম দিকে দুটো দ্বীপ ছাড়া আর কিছু নজরে পড়লো না।

দ্বীপটা জনশূন্য বলেই মনে হল। প্রচুর নাম না জানা পাখি ছাড়া অন্য কোনো প্রাণী চোখে না পড়লেও মনে হচ্ছে বন্য পশু ছাড়া আর কিছু নেই এখানে।

এই আবিষ্কারে মোটামুটি সন্তুষ্ট হয়ে ভেলার কাছে ফিরে এলাম। তীরে এনে রাখতে লাগলাম মালপত্র। দিনের বাকি সময়টুকু ব্যয় হয়ে গেল এই কাজে। রাতে কি করবো ভাবতে লাগলাম। মাটিতে থাকতে ভয় হচ্ছে। কি জানি কোনো হিংস্র জন্তু এসে যদি হামলা চালায়?

আর কোনো উপায় না দেখে শেষে জাহাজ থেকে আনা সিন্দুক, তক্তা এসব চারপাশে সাজিয়ে ছোট্ট একটা কুঁড়েঘর মতো তৈরি করলাম রাত কাটানোর জন্যে।

খাওয়ার মতো কিছু এখানে পাবো কি-না জানি না। এখন পর্যন্ত দু'একটা খরগোশ জাতীয় ছোট প্রাণী ছাড়া আর কোনো জন্তু আমার চোখে পড়েনি।

জাহাজ থেকে তো প্রয়োজনীয় আরো অনেক কিছুই সংগ্রহ করতে পারি–পাল, মাস্তুল, দড়াদড়ি এবং আরো অনেক কিছু–হঠাৎ করে চিন্তাটা এলো আমার মাথায়। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম, ভাঙা জাহাজটাতে আবার অভিযান চালাবো। ভালো করেই জানি, এর পর প্রথম যে ঝড় আসবে তাতেই টুকরো টুকরো হয়ে যাবে জাহাজটা। সুতরাং, তার আগে যত বেশি সম্ভব জিনিস সরিয়ে ফেলতে হবে এ জাহাজ থেকে।

পরদিন ভাটার সময় পানি নেমে যাওয়ার পর আবার রওনা হলাম। সাঁতরে গেলাম এবারও। আগের মতোই দড়ি বেয়ে উঠলাম জাহাজে। নতুন আরেকটা ভেলা তৈরি করলাম। এবারেরটা আর আগেরটার মতো ভারি করলাম না। মালপত্রও তুলনামূলকভাবে কম বোঝাই দিলাম। প্রথমেই সংগ্রহ করলাম ছুতোর মিস্ত্রির জিনিসপত্র–প্রায় তিন থলে ভর্তি পেরেক ও তারকাঁটা, একটা বড়সড় ওজন তোলার যন্ত্র (স্ক্রু জ্যাক), ডজনখানেক ছোট কুড়াল ইত্যাদি। সবচেয়ে দরকারী যে জিনিসটা পেলাম তা হলো, শান দেওয়ার পাথর একটা। এগুলো সব যত্ন করে ভেলায় নামালাম। এরপর সংগ্রহ করলাম গোলন্দাজদের প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস। যেমন–তিনটে লোহার শাবল, দু'পিঁপে বন্দুকের গুলি, সাতটা বড় আর একটা ছোট বন্দুক। আর কিছুটা বারুদও পেয়ে গেলাম।

এ সব জিনিস ছাড়াও পুরুষদের ব্যবহার করার মতো যতগুলো কাপড় পেলাম সব নিলাম। একটা জাহাজী দোলনা (হ্যামক), ছোট একটা অতিরিক্ত পাল, আর কিছু বিছানাপত্রও সংগ্রহ করলাম। এগুলো ভেলায় বোঝাই দিয়ে নিরাপদে ফিরে এলাম তীরে।

তীড় ছেড়ে যতক্ষণ জাহাজে ছিলাম, সারাক্ষণ খুঁত খুঁত করেছে মন। মনে হয়েছে, হয়তো তীরে গিয়ে দেখবো রেখে আসা জিনিসগুলো কেউ নিয়ে গেছে, খাবারগুলো কেউ খেয়ে গেছে। কিন্তু ফিরে এসে অনাহূত কোনো অতিথির চিহ্ন কোথাও দেখলাম না।

জাহাজ থেকে আনা পালের কাপড় দিয়ে ছোট একটা তাঁবু তৈরি করবো বলে ভাবলাম। আশপাশের গাছ থেকে খুঁটির মতো কয়েকটা ডাল কেটে এনে অল্প সময়ের মধ্যে চলনসই একটা তাঁবু খাড়া করে ফেললাম। রোদ বা বৃষ্টিতে নষ্ট

হওয়ার মতো প্রতিটি জিনিস ঢোকালাম তাঁবুর ভেতর। ইতিমধ্যে রাত হয়ে গেছে। সামান্য কিছু মুখে দিয়ে, মাটিতে একটা বিছানা পেতে, পিস্তল দুটো মাথার কাছে আর একটা বন্দুক পাশে নিয়ে শুয়ে পড়লাম। একটু পরেই ঘুম নেমে এলো চোখে। দ্বীপে ওঠার পর এই প্রথম বিছানায় ঘুমালাম। নিশ্ছিদ্র ঘুমে কেটে গেল রাত।

কয়েক দিনের মধ্যে যথেষ্ট জিনিসপত্র সংগ্রহ করতে পারলাম। একজন মানুষের যা দরকার তার চেয়ে অনেক বেশি। তবু সন্তুষ্ট হতে পারলাম না। ঠিক করলাম, জাহাজটা যখন সামনেই রয়েছে তখন ওতে যা যা আছে সব আমি তীরে নিয়ে আসবো। কখন কোন্ জিনিসটা কাজে লাগবে, কেউ বলতে পারে না। সুতরাং প্রতিদিন্ ভাটার সময় পানি নেমে গেলে জাহাজে গিয়ে কিছু না কিছু জিনিস নিয়ে আসতে লাগলাম।

ছয়

তীরে ওঠার পর তেরো দিন কেটে গেছে। এর ভেতর এগারো বার আমি জাহাজে গিয়ে জিনিসপত্র এনেছি। আবহাওয়া যদি শান্ত থাকতো তাহলে হয়তো পুরো জাহাজটাই টুকরো টুকরো করে খুলে নিয়ে আসতে পারতাম।

বারো বারের বার রওনা হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি, এমন সময় খেয়াল করলাম, বাতাসের বেগ বাড়তে শুরু করেছে। দমলাম না আমি। ভাটার সময় ঠিকই জাহাজে গিয়ে চড়লাম। জানি, তেমন মূল্যবান বা দরকারী কিছু আর অবশিষ্ট নেই। তবু খোঁজাখুঁজি করলাম অনেকক্ষণ। বন্ধ একটা দেরাজে আবিষ্কার করলাম দুটো ক্ষুর, একজোড়া বড় কাঁচি, ডজনখানেক ভালো ছুরি আর কাঁটা। আরেকটা দেরাজে পেলাম, প্রায় ছত্রিশ পাউণ্ডের সমান ইউরোপীয় এবং ব্রাজিলীয় মুদ্রা, কিছু সোনা আর কিছু রূপা।

টাকাগুলো দেখে হাসি এসে গেল আমার। জোরে জোরে বললাম, 'আমার কি কাজে আসবে তোমরা? আমার কাছে তোমাদের চেয়ে এই ছুরিগুলোই বেশি দামী। এখানেই থাকো আর পানির তলেই চলে যাও, কিছু এসে যায় না আমার।'

তবু দ্বিতীয়বার ভাবলাম ব্যাপারটা নিয়ে। এবং টাকাগুলো সহ জিনিসগুলো একটুকরো কাপড়ে জড়িয়ে ছোট একটা পোঁটলা বানিয়ে ফেললাম। আরেকটা ভেলা তৈরি করার কথা ভাবছি, এমন সময় চোখ গেল আকাশের দিকে। মেঘ জমতে শুরু করেছে। বাতাসের বেগও বেড়েছে একটু। পনেরো মিনিটের ভেতর তীরের দিক থেকে ঝড় বইতে শুরু করলো।

আকাশের চেহারা দেখার সঙ্গে সঙ্গে পানিতে লাফিয়ে পড়েছিলাম। ঝড় উঠতে সাঁতার কাটা দুঃসাধ্য হয়ে উঠলো। একে বড় বড় ঢেউয়ের ধাক্কা, তার ওপর হাতে একটা বোঝা। বাতাসের বেগ বেড়েই চলেছে। ক্রমশ শোচনীয় হয়ে উঠছে আমার অবস্থা। পোঁটলাটা ফেলে দেবো কিনা ভাবছি, এমন সময় পা

ঠেকলো মাটিতে। ঝোড়ো বাতাস ঠেলে অনেক কষ্টে তীরে উঠলাম।

ছোট্ট তাঁবুটার ভেতর আমার সব সম্পদের মাঝে বসে নিজেকে বেশ নিরাপদ মনে হলো।

প্রচণ্ড ঝড় বইলো সারারাত। সকালে উঠে যখন সমুদ্রের দিকে তাকালাম, জাহাজের কোনো চিহ্নও খুঁজে পেলাম না! ওতে আর কিছুই প্রায় ছিলো না। সবই নিয়ে আসতে পেরেছি ভেবে বেশ তৃপ্তি পেলাম মনে মনে।

দ্বীপে বুনো মানুষ বা জীবজন্তু আছে কি নেই সে সম্পর্কে এখনো কিছু জানি না। এবার নিজের নিরাপত্তার দিকে মন দিতে হবে। একটা নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজ করতে লাগলাম। আমার এখনকার আস্তানা সমুদ্রের খুব কাছাকাছি। তা ছাড়া খাওয়ার মতো পানির উৎসও নেই আশেপাশে।

সামান্য খোঁজাখুঁজি করতেই নতুন আস্তানা বানানোর মত একটা চলনসই জায়গা পাওয়া গেল। এক পাহাড়ের পাশে ছোট্ট একটুকরো সমতল ভূমি। পাহাড়ের পাশটা এখানে খাড়া উঠে গেছে, ঘরের দেয়ালের মত। খাওয়ার পানির উৎসও আছে কাছাকাছি। সবচেয়ে বড় কথা, সমুদ্রের একটা অংশ পরিষ্কার দেখা যায় এখান থেকে। আমার চোখ এড়িয়ে কোনো জাহাজই যেতে পারবে না ওদিক দিয়ে।

পাহাড়ের গায়ে মোটামুটি বড় একটা গর্ত, অনেকটা গুহামুখের মতো, তবে পুরোপুরি গুহা নয়। এই গর্তটার সামনে সমান মাটিতে তাঁবু খাটাবো বলে ঠিক করলাম। চওড়ায় একশো গজের বেশি হবে না জায়গাটা, লম্বায় প্রায় দ্বিগুণ। সুন্দর সবুজ ঘাসে ছাওয়া। পাহাড়টার উত্তর-উত্তর-পশ্চিম দিকে বলে দিনের বেশির ভাগ সময়ই ছায়া থাকে এখানে।

তাঁবু খাটানোর আগে গর্তটার মাঝামাঝি জায়গাকে কেন্দ্র করে একটা অর্ধবৃত্ত আঁকলাম। ব্যাসার্ধ নিলাম দশ গজ। ফলে অর্ধবৃত্তটার শুরু এবং শেষের মাঝখানের দূরত্ব হলো বিশগজ।

অর্ধবৃত্ত বরাবর দুই সারি শক্ত খুঁটি গাড়লাম। মাটি থেকে সাড়ে পাঁচ ফুট উঁচু খুঁটিগুলো। ছ'ইঞ্চি ফাঁক থাকলো সারি দুটোর মাঝে। গাড়বার আগে সুঁচালো করে নিলাম আগাগুলো। তারপর জাহাজ থেকে আনা মোটা রশি বেড়ার মতো করে বেঁধে দিলাম সেগুলোর সাথে। যথেষ্ট মজবুত হলো বেড়াটা। কোনো মানুষ বা জন্তু এই বেড়া ভেঙে ভেতরে ঢুকতে পারবে বলে মনে হয় না। কাজটা করতে অনেকখানি সময় আর শ্রম ব্যয় করতে হলো। বিশেষ করে খুঁটিগুলো মাপ মতো কেটে, মাথা সুঁচালো করে, মাটিতে গর্ত করে গাড়তে প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হলো।

ঘেরা জায়গার ভেতর ঢোকবার জন্যে ছোট একটা দরজা রাখলাম। বেড়ার চেয়ে মোটেই কম মজবুত হলো না দরজাটা। আমার ধারণা ছোটখাটো একটা দুর্গের মতো নিরাপদ হয়েছে জায়গাটা। কয়েকদিন পরেই অবশ্য বুঝতে পেরেছিলাম, নিরাপত্তার জন্যে এত পরিশ্রম করার কোনো দরকার ছিলো না। দ্বীপটায় বুনো মানুষ তো দূরের কথা, হিংস্র কোনো জন্তুও নেই। অপরিসীম পরিশ্রম করে আমার সব সম্পত্তি–খাবার দাবার, গোলা বারুদ এবং মালপত্র এনে ঢোকালাম এই দুর্গে। তারপর তাঁবু খাটিয়ে ফেললাম গর্তটার সামনে। এবারের

তাঁবুটা আগেরটার চেয়ে বড় করে বানালাম। বৃষ্টি বা রোদে নষ্ট হওয়ার মতো প্রতিটা জিনিস নিয়ে গেলাম তাঁবুর ভেতর। শোয়ার জন্যে বিছানার বদলে জাহাজ থেকে আনা দোলনাটা ব্যবহার করতে লাগলাম।

পাহাড়ের গায়ে গর্তটা বড় করতে শুরু করলাম এবার। প্রতিদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনি করে মাটি আর পাথর খসাই সেখান থেকে। তারপর বয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলি দুই বেড়ার মাঝখানের ফাঁকে। বেড়াটা আরো মজবুত এবং দুর্গটা আরো নিরাপদ হয়ে উঠতে লাগলো ধীরে ধীরে। কয়েকদিনের ভেতর ছোট কামরার আকৃতির একটা গুহা তৈরি হয়ে গেল পাহাড়ের গায়ে। ভাঁড়ার ঘর হিসেবে ব্যবহার করতে লাগলাম গুহাটাকে!

প্রচণ্ড পরিশ্রম আর অনেকগুলো দিন ব্যয় করার পর মোটামুটি নিখুঁত একটা চেহারা নিলো সবকিছু। এরপর বৃষ্টি নামলো একদিন। প্রবল বৃষ্টি, সেই সাথে বজ্রপাত। একটু পরপরই আকাশ চিরে বিদ্যুৎ ঝলসে উঠছে। তাঁবু থেকে সামান্য দূরে প্রবল শব্দে একটা বাজ পড়লো। চমকে উঠলাম আমি—বজ্রপাতের শব্দে নয়, অন্য একটা ব্যাপার মনে করে। পিঁপেগুলো! বারুদ ভর্তি পিঁপেগুলোর ওপর যদি বাজ পড়ে তাহলে কি হবে কল্পনা করে শিউরে উঠলাম। কমপক্ষে দুশো চল্লিশ পাউণ্ড বারুদ একজায়গায় গাদা করা রয়েছে। বারুদটুকু তো যাবেই সেই সাথে আমার খাবার-দাবার এবং অন্য জিনিসপত্রও নষ্ট হবে। আমার অস্তিত্ব নিয়েই টানাটানি পড়ে যাবে তখন।

বৃষ্টি থামার সঙ্গে সঙ্গে কাজে লেগে গেলাম। অনেকগুলো ছোট ছোট থলে এবং বাক্স বানালাম। সবটুকু বারুদ ভাগ ভাগ করে থলে আর বাক্সগুলোয় ভরলাম। তারপর পাহাড়ের অনেকগুলো খাঁজে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখে দিলাম সেগুলো। একটা খাঁজে একটার বেশি থলে বা বাক্স রাখলাম না। কোন কোন খাঁজে বারুদ রেখেছি তা যেন ভুলে না যাই সেজন্যে প্রত্যেকটা খাঁজে চিহ্ন দিয়ে রাখলাম। প্রায় পনেরো দিন লেগে গেল এই কাজ করতে।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে প্রতিদিনই অন্তত একবার বন্দুক নিয়ে বাইরে যাই আমি। আশা, খাওয়ার মতো কিছু শিকার হয়তো পেয়ে যাবো। প্রথমদিন বেরিয়েই আবিষ্কার করলাম, ছাগল আছে দ্বীপে। খুশি হয়ে উঠলাম মনে মনে। কিন্তু ছাগলগুলো এত লাজুক আর দ্রুত ছুটতে পারে যে প্রথম কয়েকদিন কাছেই ঘেঁষতে পারলাম না ওদের। হতাশ হলাম না আমি। পরপর কয়েকদিন পর্যবেক্ষণ করে বুঝলাম ছাগলগুলো যখন উপত্যকায় চরে বেড়ায় তখন যদি আমি পাহাড়ে থাকি তাহলে আমাকে খেয়াল করে না ওরা। কিন্তু উল্টোটা হলেই মুশকিল—আমাকে দেখে ফেলে এবং মুহূর্তের মধ্যে হাওয়া হয়ে যায়। তাই এখন আর উপত্যকায় না গিয়ে প্রথমেই পাহাড়ে উঠে পড়ি আর তক্কে তক্কে থাকি।

প্রথম যে ছাগলটা মারলাম সেটা একটা মাদী। ছোট্ট একটা বাচ্চা ছিলো ছাগলটার। মারার আগে বাচ্চাটাকে দেখিনি আমি। পরে যখন দেখলাম, তখন সত্যিই দুঃখ পেলাম। যতক্ষণ না আমি এসে ধরলাম ততক্ষণ পর্যন্ত ধাড়ি ছাগলটার কাছে দাঁড়িয়ে রইলো বাচ্চাটা। ধাড়িটাকে কাঁধে তুলে নিয়ে ফিরে এলাম

গুহায়। বাচ্চাটাও এলো পেছন পেছন। পোষ মানানোর আশায় বেড়ার ভেতর নিয়ে এলাম বাচ্চাটাকে। কিন্তু দু'দিন পরেই খেয়াল করলাম কিছু খায় না ওটা। আসলে বাচ্চাটা এত ছোট যে দুধ ছাড়া আর কিছু খেতে শেখেনি এখনো। শেষ পর্যন্ত ওটাকেও মেরে ফেলতে হল। এমনিই মরে যেতো, তার চেয়ে আমার খাবারের অভাব মেটাবে।

সাত

দ্বীপে ওঠার দশ-বারো দিন পর হঠাৎ আমার খেয়াল হলো সময়ের কোনো হিসেব রাখছি না। এভাবে চললে পরে মুশকিলে পড়ে যাবো! কোনদিক দিয়ে দিন, মাস, বছর, চলে যাবে টের পাবো না। কাজের দিন আর প্রার্থনার দিনও আলাদা করতে পারবো না। কি করে মুক্তি পাওয়া যায় সমস্যাটার হাত থেকে ভাবতে লাগলাম। বেশি ভাবতে হলো না, পেয়ে গেলাম সমাধান।

বড় একটা কাঠের ফলকের ওপর ছুরি দিয়ে কেটে কেটে লিখলাম–'১৬৫৯ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর এখানে আমি তীরে উঠি'। প্রথম যেখানে তীরে উঠেছিলাম সেখানে একটা খুঁটি গেড়ে লাগিয়ে দিলাম ফলকটা। এরপর থেকে প্রত্যেক দিন কাঠটার ওপর ছুরি দিয়ে একটা করে আঁচড় কাটি। প্রত্যেক সপ্তম দাগটা অন্যগুলোর দ্বিগুণ মাপের দেই এবং মাসের প্রথম দিনটাও লম্বা দাগ কেটে চিহ্ন দিয়ে রাখি। এইভাবে আমি দিন, মাস, বছরের হিসেব রাখতে লাগলাম।

জাহাজ থেকে যেসব জিনিস এনেছি সেগুলোর ভেতর কম দামী কিছু জিনিস আছে। দাম কম হলেও জিনিসগুলো কম প্রয়োজনীয় নয় মোটেই। যেমন: কয়েকটা কলম, কালি, কাগজ; কয়েকটা কম্পাস, কিছু গাণিতিক যন্ত্রপাতি, মানচিত্র, জাহাজ চালনার কৌশল সম্পর্কিত বই ইত্যাদি। তিনটে খুব ভালো বাইবেলও আছে। আরেকটা কথা আগে বলিনি–জাহাজে একটা কুকুর এবং দুটো বিড়াল ছিলো। প্রথমবার ভেলায় করে নিয়ে এসেছিলাম বিড়াল দুটো, আর কুকুরটা পরদিন সাঁতরে চলে এসেছিলো আমার কাছে। পরে অনেকদিন পর্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে আমাকে সঙ্গ দিয়েছে কুকুরটা।

আমার যা আছে তা তো আছেই। কয়েকদিনের ভেতর বুঝতে পারলাম আরো কয়েকটা জিনিস–যেমন: গাঁইতি, বেলচা, ঝুড়ি এবং সুঁই-সূতো থাকলে কাজ করতে অনেক সুবিধা হতো। এই কয়েকটা সরঞ্জামের অভাবে যা করলে চলতো তারচেয়ে কয়েকগুণ বেশি পরিশ্রম করতে হচ্ছে আমাকে। আস্তানাটা ঠিকমতো তৈরি করতেই প্রায় এক বছর লেগে গেল। ভারি ভারি সব খুঁটি তৈরি করতে হয়েছে গাছ কেটে। বয়ে আনতে হয়েছে আস্তানা পর্যন্ত। একেক সময় এমনও হয়েছে, একটা খুঁটি কেটে বাড়ি পর্যন্ত আনতে দুদিন লেগে গেছে। তারপর তৃতীয় দিনে মাটিতে গেড়েছি সেটা।

মোটামুটি একটা চেহারা নিয়েছে আমার আস্তানা। এবার জাহাজ থেকে আনা

জিনিসপত্রগুলোর দিকে মনোযোগ দেয়ার ফুরসত পাওয়া গেল। তাঁবুর ভেতরে কিছু, গুহায় কিছু–স্তূপ হয়ে আছে মালপত্র। কি কি আছে না আছে, ভালো করে দেখলাম। ওগুলো যখন আনি তখন ভালো করে দেখবার অবসর পাইনি। জাহাজ থেকে ভেলায় তুলেছি, তারপর তীরে এনে গাদা করে রেখে দিয়েছি। কোন্‌টা কখন লাগবে ঠিক নেই, তাই ওরকম গাদা করে রেখে দিলে মুশকিল। জিনিসগুলো সাজিয়ে গুছিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত নিলাম। দরকারের সময় প্রয়োজনীয় জিনিসটা খুঁজে পেতে দেরি হবে না তাহলে।

কিন্তু জিনিসগুলো রাখার মতো জায়গা মাত্র দুটো–তাঁবুটা আর গুহাটা। সাজাতে গিয়ে দেখলাম এই দুটো জায়গায় ধরবে না সব জিনিস। এখন কি আরেকটা তাঁবু খাটাবো?

পছন্দ হলো না বুদ্ধিটা। তাঁবু জিনিসটা খারাপ না–রোদ এবং বৃষ্টি থেকে মোটামুটি রক্ষা করতে পারে। কিন্তু ঝড়? ঝড়ের সময় তাঁবু নিজেকে রক্ষা করবে না ভেতরের জিনিস বাঁচাবে? সুতরাং গুহাটাকেই আরো বড় করবো, ঠিক করলাম।

একটানা আঠারো দিন পরিশ্রমের পর শেষ হলো কাজটা। যে মাটি আর পাথর বেরোলো সেগুলো বয়ে এনে বেড়ার গোড়ায় ফেললাম। আঠারো দিন পরে দেখলাম মাটি আর পাথরের বেশ বড় একটা স্তূপ জমে গেছে বেড়ার কাছে।

গুহাটা আয়তনে বড় হওয়ায় ওটাকে একই সঙ্গে আমার কাজের ঘর, রান্না ঘর, খাওয়ার ঘর এবং ভাঁড়ার ঘর হিসেবে ব্যবহার করতে পারবো। গুহার মাটি খোঁড়ার কাজ শেষ হওয়ার পর মজবুত কয়েকটা খুঁটি দিয়ে ছাদটাকে ঠেকা দিলাম, যাতে ধসে না পড়ে। গুহার একপাশে তাক তৈরি করলাম কয়েকটা। যন্ত্রপাতি, পেরেক এবং যাবতীয় লোহার জিনিস সাজিয়ে রাখলাম তাকগুলোর ওপর। বন্দুকগুলোও ঠেকনা দিয়ে রাখার মতো একটা ব্যবস্থা করলাম। ঝুলিয়ে রাখার মতো জিনিসগুলো ঝুলিয়ে দিলাম।

এবার টেবিল-চেয়ারের মতো দরকারি কিছু জিনিস তৈরি করবো বলে ঠিক করলাম। ওগুলো ছাড়া খুব যে অসুবিধা হচ্ছে তা নয়, তবে ওসব থাকলে জীবনটা অনেক বেশি আরামের হয়ে উঠবে–আরাম করে লিখতে পারবো, খেতে পারবো; আরো অনেক কিছুই করতে পারবো।

কাজে লেগে গেলাম। এবার সত্যিই একটু মাথা খাটাতে হলো। মাপজোক–গণিত, জ্যামিতির দরকার পড়লো। আসলে মানুষ সত্যিকারের প্রয়োজনের সময় অনেক অসাধ্যই সাধন করতে পারে, দুনিয়ার যাবতীয় বিষয়ে দক্ষ হয়ে উঠতে পারে। কতটুকু প্রয়োজন সেটাই আসল কথা। তা না হলে আমার মত লোক–জীবনে কখনো কোনো যন্ত্রপাতিতে হাত দিইনি, কি করে এত সব কাজ করছি? কঠোর পরিশ্রম আর নিষ্ঠা দিয়ে শিখে নিচ্ছি সব।

টেবিল চেয়ার বানাতে গিয়ে প্রথমেই দরকার পড়লো তক্তা। কোথায় পাবো? জাহাজ থেকে যেগুলো এনেছিলাম সেগুলো কাজে লাগিয়ে ফেলেছি। তৈরি করে নেয়া ছাড়া উপায় নেই। লেগে গেলাম তক্তা তৈরি করতে। একটা গাছ কেটে গুঁড়িটাকে ছোট ছোট কয়েকটা টুকরো করলাম। তারপর কুড়াল দিয়ে ছেঁটে ছেঁটে

তক্তার আকার দিলাম টুকরোগুলোকে। টেবিল এবং চেয়ার বানানোর মতো পাতলা হওয়ার পর র‍্যাঁদা দিয়ে চেঁছে সমান করলাম তক্তাগুলো। এই পদ্ধতিতে একটা গাছ থেকে একটার বেশি তক্তা পাচ্ছি না ঠিক, কিন্তু এছাড়া আর কি করতে পারি আমি?

শেষ পর্যন্ত তৈরি হয়ে গেল আমার টেবিল-চেয়ার। আগের তাকগুলো বানিয়েছিলাম জাহাজ থেকে আনা তক্তা দিয়ে। স্বভাবতঃই ছোট হয়েছিলো ওগুলো। এবার নিজের বানানো তক্তা দিয়ে আরো কয়েকটা বড় বড় তাক তৈরি করলাম। জিনিসপত্র রাখা আরো সহজ হলো এতে।

কয়েকদিনের ভেতর রাতের আঁধার অসহ্য হয়ে উঠলো আমার কাছে। সন্ধ্যার আগে আগে সব কাজ সেরে নিতে হয়। রাতের খাবারও খেয়ে নিতে হয় সন্ধ্যার আগেই। তারপর চুপচাপ বসে থাকতে হয় অন্ধকারে। দু'একটা মোমবাতি যদি থাকতো! খুব বেশি দিন অবশ্য অন্ধকারে থাকতে হলো না–যে ছাগলটা মেরেছিলাম ওটার চর্বি দিয়ে প্রদীপ জ্বালানোর ব্যবস্থা করে ফেললাম। ছোট্ট একটা মাটির পাত্র তৈরি করে রোদে শুকিয়ে নিলাম। চর্বি গলিয়ে ঢেলে দিলাম তাতে। ন্যাকড়া পেঁচিয়ে সলতে বানিয়ে নিলাম। এই প্রদীপ মোমবাতির মতো পরিষ্কার আর স্থির আলো না দিলেও কাজ চলে যায় আমার।

এবার দৈনিক কাজকর্মের একটা বিবরণ (জার্নাল) রাখতে শুরু করলাম। কাজের সময় ভাগ করে নিলাম। প্রত্যেক দিন ভোরে উঠে, যদি বৃষ্টি না থাকে, বন্দুক নিয়ে বেড়িয়ে পড়ি। দু'তিন ঘণ্টা ঘুরি। এই সময় শিকারের চেষ্টা করি, অথবা কোন জাহাজ দেখা যায় কিনা উপকূলে তা খেয়াল করি। ফিরে এসে প্রায় এগারোটা পর্যন্ত কাজ করি। তারপর খেয়ে দেয়ে বারোটা থেকে দুটো পর্যন্ত ঘুম। ঘুম থেকে উঠে আবার ঘরের কাজ।

একদিন সকালে বন্দুক আর কুকুরটাকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছি। একটা বন বিড়াল শিকার করলাম এদিন। মাংসটা কোনো কাজে না লাগলেও চমৎকার নরম তুলতুলে চামড়া পাওয়া গেল। যে প্রাণীগুলোকে মারছি, প্রত্যেকটার চামড়া রেখে দিচ্ছি। কি জানি কখন কি কাজে লাগে?

শাবলগুলো দিয়ে গাঁইতির কাজ চালিয়ে নিচ্ছি। কিন্তু বেলচার অভাব পূরণ হয়নি এখনো। কি করা যায় ভাবতে ভাবতে একটা বুদ্ধি এলো মাথায়। কাঠ দিয়েই তো একটা বেলচা বানিয়ে নিতে পারি! কাঠটা অবশ্য খুব মজবুত হতে হবে। পরদিনই কাঠের খোঁজে বেরোলাম। মনে মনে যা খুঁজছিলাম, সেই বিশেষ গাছ পেয়ে গেলাম। প্রচণ্ড শক্ত কাঠ হয় গাছটায়। ব্রাজিলে লোহা গাছ বলে। ভীষণ পরিশ্রম করতে হলো দরকার মতো একটা টুকরো কেটে আনতে। কুড়ালটার প্রায় বারোটা বেজে গেল।

বেশ কয়েকদিন একটানা পরিশ্রমের পর মোটামুটি একটা বেলচার চেহারা দেয়া গেল কাঠটাকে। হাতলটা ভালোই হলো–ইংল্যাণ্ডে আমরা যে ধরনের বেলচা ব্যবহার করি অনেকটা সেরকম।

একদিন গুহার ভেতর জিনিসপত্র সব নতুন করে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখছি। এমন সময় হঠাৎ ছোটএকটা থলে চোখে পড়লো আমার। দেখেই মনে পড়লো,

সেই শস্যদানার থলেটা। মুরগির খাবার হিসেবে আনা হয়েছিলো। থলেটা খুলে দেখলাম, ভেতরে খানিকটা তুষ কুড়ো ছাড়া আর কিছু নেই। থলেটা হয়তো অন্য কোনো কাজে লাগানো যাবে ভেবে বেড়ার কাছে গিয়ে ঝেড়ে ফেলে দিলাম তুষটুকু।

ডিসেম্বরের ২৪ এবং ২৫ তারিখে প্রবল বৃষ্টি হলো। ঝর ঝর করে একটানা ঝরেই চললো। একবারের জন্যেও বাইরে বেরোতে পারলাম না এই দুদিন। ২৬ তারিখে থামলো বৃষ্টি। এমনিতে প্রচণ্ড গরম এখানকার আবহাওয়া। দুদিন বৃষ্টির পর বেশ ঠাণ্ডা মনে হলো দিনটা। বৃষ্টির ফলে জায়গায় জায়গায় কাদা-পানি জমে আছে। ঘর থেকে বেরোলেও বেশিদূর যেতে ইচ্ছে হলো না কাদা ঠেঙিয়ে।

পরদিন একটা ছাগল মারলাম। খোঁড়া করলাম আরেকটা। মরাটাকে কাঁধে করে আর খোঁড়াটাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে টেনে টেনে নিয়ে এলাম বাড়িতে। বাড়িতে এনে পট্টি বেঁধে দিলাম জ্যান্ত ছাগলটার ভাঙা পায়ে। কয়েকদিন খুব যত্ন নিলাম ওটার। ভাঙা পা জোড়া লেগে ঠিক হয়ে গেল। ইতিমধ্যে আমার সেবা পেয়ে পেয়ে একটু একটু করে পোষ মানতে শুরু করেছে ছাগলটা। তাঁবুর সামনের ঘাসে ছাওয়া ছোট্ট আঙিনায় চরে বেড়ায়। আরো কিছু ছাগল বা এ জাতীয় কিছু প্রাণী পোষ মানানোর কথা ভাবলাম এই সময়। কারণ–এখন না হয় বন্দুক আছে, বারুদ আছে, গুলি আছে; আরাম করে শিকার করছি আর খাচ্ছি। বারুদ যেদিন ফুরিয়ে যাবে সেদিন কি হবে?

মাসখানেক পর একদিন, বেড়ার কাছে তাকিয়ে দেখি কচি সবুজ রঙের কয়েকটা চারা বেরিয়ে এসেছে মাটি ফুঁড়ে। অনেকটা ঘাসের মতো কিন্তু ঠিক ঘাসও না। ভাবলাম নতুন ধরনের কোনো ঘাস হবে হয়তো। কিন্তু আরো কয়েকদিন পর, সত্যিই আশ্চর্য হয়ে গেলাম–বেড়ার পাশের চারাগুলো আর কিছু নয়, কচি যবের গাছ। দশ-বারোটা। ভেবে পেলাম না চারাগুলো কোত্থেকে এলো, কি করে গজালো।

ঈশ্বর বা ধর্মকর্ম নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাই না আমি। কিন্তু এই মুহূর্তে প্রথম যে কথাটা মনে হলো, ঈশ্বরের দয়া–ঈশ্বরের দয়া ছাড়া এ হতেই পারে না! শস্য উৎপাদনের মতো আবহাওয়া নয় এ দ্বীপের। এই অবস্থায় বীজ না লাগাতেই গাছ জন্মানোকে ঈশ্বরের দয়া ছাড়া আর কি বলা যায়? আমি ঈশ্বরকে মনে না রাখলেও ঈশ্বর আমার কথা ঠিকই মনে রেখেছেন। চোখ দিয়ে পানি এসে গেল আমার। এ ধরনের আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছে বলে ভাগ্যবান মনে হতে লাগলো নিজেকে।

আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলাম চারাগুলোর দিকে। যব গাছগুলোর কাছে অন্য রকম কয়েকটা চারা দেখে আরো আশ্চর্য হলাম। চিনতে পারলাম ওগুলো–ধানের চারা।

নিশ্চয়ই দ্বীপে এ সব গাছ আরো আছে, ভাবলাম আমি। দ্বীপের যেখানে যেখানে আগে গেছি, প্রত্যেকটা জায়গা খুঁজে দেখলাম। প্রতিটা কোনায়, প্রতিটা পাথরের নিচে তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম। কিন্তু আর একটা চারাও দেখতে পেলাম না। না যবের, না ধানের। অবশেষে মনে পড়লো, মুরগির খাবারের একটা থলে

আমি ঝেড়েছিলাম এ জায়গায়। এতক্ষণে পরিষ্কার হলো রহস্যটা।

অত্যন্ত সতর্কতার সাথে যত্ন করতে লাগলাম চারাগুলোর। ঠিক করলাম, ওখান থেকে উঠিয়ে আবার রোপণ করবো চারাগুলো। আশা, কোনোদিন হয়তো খেতে পারার মতো পরিমাণ যব বা ধান পাবো। কিন্তু চার বছরের আগে একটা দানাও মুখে তুলতে পারিনি আমি। প্রথম বছর যে বীজগুলো লাগিয়েছিলাম, ঠিক সময়ে লাগাতে পারিনি বলে, নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো সব। শুকনো মৌসুম শুরু হওয়ার আগে লাগিয়েছিলাম, ফলে একটা বীজ থেকেও চারা বের হয়নি।

জানুয়ারির শুরু থেকে এপ্রিলের মাঝামাঝি পর্যন্ত একটানা পরিশ্রম করে আমার আস্তানার চারপাশে দেয়াল দিয়ে ফেললাম। চারপাশে না বলে তিনপাশে বলাই ভালো, পাহাড়টা একপাশের দেয়ালের কাজ করছে। আসলে বেড়াটাকেই দেয়ালে পরিণত করলাম। আগেই বলেছি, প্রথমবার গুহা খুঁড়ে বেরোনো মাটি আর পাথর ফেলেছিলাম দুই বেড়ার মাঝের ফাঁকে। এ সময়ই মাটি থেকে প্রায় দেড়ফুট উঁচু একটা দেয়াল তৈরি হয়ে গিয়েছিলো। এখন এ দেয়ালটাকেই আর একটু উঁচু করে বেড়ার সমান করে নিলাম। দ্বিতীয়বার গুহা খুঁড়ে যে মাটি এবং পাথর বেরিয়েছিলো সেগুলো ব্যবহার করলাম এই কাজে। যব এবং ধান গাছগুলোর পরিচর্যাও চলতে লাগলো ফাঁকে ফাঁকে।

কাদা দিয়ে পাথর গেঁথে চললাম একটা একটা করে। ধীরে ধীরে উঁচু হয়ে উঠতে লাগলো দেয়াল। হাড়ভাঙা খাটুনি বলতে যা বোঝায়, ঠিক তা-ই করতে হলো দেয়ালটার জন্যে। প্রচণ্ড বৃষ্টির কারণে খাটুনির পরিমাণ বেড়ে গেল অনেক। কোনো কোনো সময় একটানা কয়েক দিন চললো বৃষ্টি। বৃষ্টি থামার পর গিয়ে দেখি, পানিতে ধুয়ে গেছে কাদা, ধসে পড়বো পড়বো করছে দেয়াল। আবার শুরু করতে হলো প্রায় গোড়া থেকে।

দেয়াল তোলার ফাঁকে ফাঁকে শিকারের খোঁজে চক্কর দিতে যাওয়া বন্ধ করিনি এক দিনের জন্যেও। বৃষ্টির দিনগুলো ছাড়া প্রতিদিন নিয়মিত একবার বন থেকে ঘুরে আসি। প্রতিদিনই কিছু না কিছু নতুন জিনিস আবিষ্কার করি। এক জাতের বুনো পায়রা দেখলাম একদিন। গাছে নয়, পাহাড়ের ফাঁকে বাসা বানায় ওরা। কয়েকটা বাচ্চা ধরে নিয়ে এলাম, দেখি পোষ মানে কিনা। কিন্তু উড়তে শেখার সঙ্গে সঙ্গে পালালো সবগুলো।

এপ্রিলের চোদ্দ তারিখে দেয়ালের কাজ শেষ হলো। এবার আর কোনো দরজা রাখিনি দেয়ালে। ভেতরে ঢোকা বা বাইরে বেরোনোর জন্য মই ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। মই বেয়ে দেয়ালের ওপরে উঠি। তারপর মইটাকে ভেতরে এনে নেমে আসি সেটা বেয়ে। কখনো কখনো লাফিয়ে নামি। পুরোপুরি নিশ্চিন্ত আমি এখন।

দেয়ালের কাজ শেষ হওয়ার পরদিন ভয়ানক এক ঘটনা ঘটলো! আরেকটু হলেই আমার গত কয়েক মাসের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের ফসল নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছিলো। আমি নিজেও মরতে বসেছিলাম।

সেদিন তাঁবুর পেছনে, গুহার ঠিক মুখের সামনে বসে কি যেন করছি, হঠাৎ

কেঁপে উঠলো পায়ের তলের মাটি। চমকে মুখ তুলে তাকাতেই দেখতে পেলাম, গুহার ছাদ থেকে খসে পড়ছে মাটি আর পাথর। ছাদ ঠেকা দিয়ে রেখেছিলাম যে খুঁটিগুলো দিয়ে, মড় মড় করে উঠলো তার দুটো। ভেঙে পড়েনি এখনো, তবে খুব একটা বাকিও নেই। কি ব্যাপার! কি ঘটছে? ভয় পেয়ে গেলাম ভীষণ। মাথার ওপর কি একটা শব্দ হতে ঝট করে তাকালাম ওপর দিকে। আতঙ্কে চোখ বেরিয়ে আসার দশা–বড় বড় কয়েকটা পাথর আর ঝুরো মাটি নেমে আসছে পাহাড়ের চূড়া থেকে। প্রায় অর্ধেক এসে গেছে। আর দুসেকেণ্ডও বোধহয় লাগবে না নিচে এসে পড়তে। লাফিয়ে সরে এলাম একপাশে। পাথরগুলো আমার গায়ের ওপর পড়লো না বটে, তবে ধুলো আর মাটিতে ভরে গেল সারা শরীর। পায়ের নিচে মাটির কাঁপুনি থেমে গেছে ইতিমধ্যে। কিন্তু পাহাড়ের ওপর থেকে পাথর আর মাটির চাঙড় নেমে আসা থামেনি। জ্যান্ত কবর হয়ে যাওয়ার ভয়ে মইয়ের দিকে দৌড়ালাম তাড়াতাড়ি। পাহাড়ের কাছ থেকে দূরে সরে না গেলে বাঁচতে পারবো না। এখন আর বুঝতে বাকি নেই আমার, ভূমিকম্প হচ্ছে! মই বেয়ে দেয়ালের ওপর উঠে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এলাম বাইরে।

দেয়ালের বাইরে এসে আধ মাইল দূরে আর একটা পাহাড়ের দিকে তাকালাম। পাহাড়টার মাথা থেকে বিশাল একটা পাথর ভয়ানক শব্দে গড়িয়ে নেমে আসছে। অমন ভয়ানক শব্দ জীবনে কখনো শুনিনি আমি। পাথরটার ঘায়ে আবার থর থর করে কেঁপে উঠলো মাটি। সাগরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, ভয়ানক ভাবে আলোড়িত হচ্ছে পানি।

আগে কখনো এ ধরনের ঘটনার মুখোমুখি হইনি। এরকম পরিস্থিতিতে কি করতে হয় না হয় কিছুই জানি না। চরম অসহায় এবং আতঙ্কিত বোধ করতে লাগলাম।

কয়েক মিনিট পর দ্বিতীয় বারের মতো কেঁপে উঠলো মাটি। এবার আরো জোরে। পাহাড়ের ওপর থেকে নেমে আসা পাথরের ঢল একটু কমেছিলো, শুরু হলো আবার। স্পষ্ট বুঝতে পারছি, এরকম আর কিছুক্ষণ চললে, তাঁবু, গুহা সেই সাথে আমার যাবতীয় জিনিসপত্র চলে যাবে মাটির তলে। আর সত্যিই যদি সেরকম কিছু ঘটে তো আমার আর কোনো আশা নেই। এই নির্জন দ্বীপে যন্ত্রপাতি ছাড়া বাঁচবো কি করে?

তৃতীয় বার কাঁপলো মাটি। প্রথমবারের কাঁপনের পর মাত্র আট মিনিট পেরিয়েছে। এর ভেতর পুরো দ্বীপটার চেহারাই পাল্টে গেছে যেন। এখনো সমানে পাথর গড়িয়ে নেমে আসছে পাহাড়ের ওপর থেকে। কি করবো বুঝতে পারছি না। নড়ার শক্তিটাও যেন লুপ্ত হয়ে গেছে আমার।

তৃতীয় দফা ভূমিকম্পের পর অনেকটা সময় পেরিয়ে গেছে। আর কাঁপেনি মাটি। তাঁবুর ওপর পাথর পড়া বন্ধ হয়েছে। গেছে বোধহয় বিপদটা, কিন্তু ঠিক ভরসাও করতে পারছি না। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছে এই বুঝি শুরু হলো আবার। আরো কিছুক্ষণ পেরিয়ে যাওয়ার পর একটু একটু করে সাহস ফিরে আসতে লাগলো আমার। কিন্তু এখনো দেয়ালের ভেতরে ঢোকার সাহস পাচ্ছি না। আবার যদি শুরু হয়? জ্যান্ত কবর হয়ে যাবে একেবারে। বসে রইলাম চুপচাপ।

বসে থাকতে থাকতেই দেখলাম, গাঢ় মেঘে ছেয়ে গেল আকাশ, ভারি হয়ে উঠলো বাতাস; বৃষ্টি নামার আগে যেমন হয় সেরকম। একটু পরেই বাড়তে শুরু করলো বাতাসের গতি। কিছুক্ষণের ভেতর শুরু হলো ঝড়। বেড়ে চলেছে ক্রমশ। আধ ঘণ্টার ভেতর প্রচণ্ড হারিকেনের রূপ নিলো। সাগর ছেয়ে গেল নোনা জলের ফেনাময় ঢেউয়ে। বিক্ষুব্ধ ঢেউগুলো এসে আছড়ে পড়তে লাগলো বেলাভূমির ওপর। চোখের সামনে দেখতে পেলাম, শিকড়শুদ্ধ উপড়ে গেল বড় বড় কয়েকটা গাছ। একটানা তিন ঘণ্টা চললো ঝড়। তারপর কমতে লাগলো একটু একটু করে। দুঘণ্টা পর মোটামুটি থেমে গেল। এবার শুরু হলো বৃষ্টি, মুষলধারে।

এখন আর গুহায় না ঢুকে উপায় নেই। এমন প্রবল বর্ষণের ভেতর বাইরে থাকা সম্ভব নয়। আস্তে আস্তে দুরু দুরু বুকে দেয়াল পেরোলাম। বসে রইলাম তাঁবুর ভেতর। কিন্তু এত জোরে বৃষ্টি পড়ছে যে, মনে হতে লাগলো, এই বুঝি ভেঙ্গে পড়লো তাঁবু। অনিচ্ছা সত্ত্বেও গুহার ভেতর ঢুকলাম এবার।

সারা রাত বৃষ্টি হলো। পরদিনও বেশির ভাগ সময় চললো বৃষ্টি। এমন প্রচণ্ড বৃষ্টি সত্যি খুব কম দেখেছি জীবনে। দেয়ালের ভেতরের প্রাঙ্গণটায় এক হাঁটু পানি দাঁড়িয়ে গেছে। গুহার ভেতরে এখনো ঢুকতে শুরু করেনি বটে, তবে খুব একটা বাকিও নেই। পানি বের করে দেয়ার জন্যে দেয়ালের গোড়ায় এক জায়গায় একটা ছিদ্র করতে হলো।

চারদিন চলে গেছে। ভূমিকম্প হয়নি আর। কিন্তু স্বস্তি পাচ্ছি না তবু। কেবলই মনে হচ্ছে, যে কোনো সময় আবার শুরু হতে পারে। কি করা যায় ভাবছি। একটা কথা ঠিক, দ্বীপে যদি প্রায়ই এরকম ভূমিকম্প হয় তো আর যা-ই হোক গুহায় থাকা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। তা হলে কি করবো?

অনেক ভাবনা চিন্তার পর সিদ্ধান্ত নিলাম, ফাঁকা কোনো জায়গায় একটা কুটির বানিয়ে নিতে হবে। হিংস্র প্রাণী এবং জংলী মানুষের হাত থেকে বাঁচার জন্যে এ জায়গার মতো সে-জায়গাটাও দেয়াল তুলে ঘিরে নেবো। এখানে যদি থাকি, তাহলে নির্ঘাত পাথর চাপা পড়ে মরতে হবে একদিন।

এই সব ভেবে আপাতত তাঁবুটা যেখানে আছে সেখান থেকে সরিয়ে নেয়ার পরিকল্পনা করলাম। খাড়া পাহাড়টার ঠিক নিচেই রয়েছে তাঁবুটা। পরের ভূমিকম্পে পাহাড়ের চূড়াটা ভেঙ্গে পড়তে পারে তাঁবুর ওপর।

এপ্রিলের উনিশ এবং কুড়ি এই দু'দিন নতুন আস্তানার জন্যে জায়গা বাছতেই চলে গেল। ভূমিকম্পের আশঙ্কায় এমন আতঙ্কিত হয়ে আছি যে, রাতের ঘুম হারাম হয়ে গেছে আমার। সব সত্ত্বেও গুহাটার দিকে যখন তাকাই মনে হয়, এখানেই ভালো আছি। সব কিছু কি সুন্দর সাজানো গোছানো।

জায়গা বাছার কাজ শেষ হওয়ার পর বুঝতে পারলাম, বেশ সময় লাগবে আরেকটা আস্তানা বানাতে। অতদিন খোলা আকাশের নিচে থাকা যাবে না। সুতরাং যতদিন না দেয়াল তুলে কুটির বানানোর কাজ শেষ করতে পারছি ততদিন এখনকার জায়গায়ই থাকতে হবে। যাহোক, আর সময় নষ্ট না করে লেগে গেলাম কাজে।

প্রথমেই লাগতে হলো যন্ত্রপাতিগুলো নিয়ে। গত কয়েক মাস একটানা ব্যবহারে দফা রফা হয়ে আছে সেগুলোর। বেশ কয়েক দিন লেগে গেল ধার দিতে। এর ভেতর একদিন জাহাজ থেকে আনা খাবারের হিসেব নিতে গিয়ে দেখি, সামান্যই অবশিষ্ট আছে। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে, দৈনিক মাত্র একটা বিস্কুটে নামিয়ে আনলাম বরাদ্দ।

পহেলা মে সকালে সাগরের দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। অদ্ভুত দর্শন কি সব পড়ে আছে সৈকতের ওপর। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে দেখলাম, ছোট একটা পিঁপে আর আমাদের ধ্বংস হয়ে যাওয়া জাহাজের দু'তিনটে ভাঙাচোরা টুকরো। একপাশে তাকিয়ে দেখি, ভাঙা জাহাজটা আবার এসে পড়েছে উপকূলের কাছে। দেখলেই বোঝা যায় ভেসে নেই ওটা। সম্ভবত এখন ভাটা বলেই দেখা যাচ্ছে, জোয়ারের সময় আবার তলিয়ে যাবে পানির নিচে। কি করে আবার তীরের এত কাছে চলে এলো ওটা? অনেকক্ষণ ভাবলাম, কিন্তু কোনো কূল-কিনারা পেলাম না। মনে হয় ভূমিকম্প এবং সেই প্রবল হারিকেনই আবার উপকূলের দিকে তাড়িয়ে এনেছে ডুবে যাওয়া জাহাজটাকে।

পিঁপেটা গড়িয়ে ডাঙার আরো কিছুটা ওপরে নিয়ে এলাম। তারপর চললাম জাহাজটার ধ্বংসাবশেষের দিকে। এখন ভাটা চলছে। তাই সহজেই পৌঁছে গেলাম ওটার কাছে। জাহাজে উঠে দেখলাম, ফোক্যাসেলটা প্রায় পুরোই বালির তলে, পেছনটা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেছে। আলগা ভাবে ছড়িয়ে আছে টুকরোগুলো।

একবার মনে হলো, দ্বীপে যখন ভূমিকম্পের ভয় তখন এখানে এসে উঠি। সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য বাতিল করে দিতে হলো বুদ্ধিটা। কারণ, দ্বীপে যেমন ভূমিকম্পের ভয়, এখানে তেমন ঝড়ের ভয়। তাছাড়া, জোয়ারের সময় এটার সামান্য অংশই পানির ওপর থাকবে। শেষে ঠিক করলাম, জাহাজের ভাঙাচোরা অংশগুলো খুলে খুলে তীরে নিয়ে যাবো।

শুরু করে দিলাম কাজ। প্রত্যেক দিন ভাটা লাগার সঙ্গে সঙ্গে রওনা হয়ে যাই, জোয়ার আসার আগে আগে ফিরে আসি। একটু একটু করে ডাঙায় এনে তুলতে লাগলাম জাহাজটার কাঠ, লোহা এবং অন্যান্য জিনিস।

এর ভেতর একদিন সমুদ্রের তীরে, বিরাট এক কচ্ছপ দেখলাম। দ্বীপে ওঠার পর এই প্রথম। আশ্চর্য হয়ে গেলাম কচ্ছপটার আকার আকৃতি দেখে। অনেক কষ্ট করে বয়ে নিয়ে এলাম ব্যাড়ি পর্যন্ত।

পরের দিনটা পুরো ব্যয় করতে হলো রান্নার কাজে। কচ্ছপটার পেটে ষাটটা ডিম পেলাম। খালি ছাগল আর পাখির মাংস খেয়ে পচে গেছে মুখ। অত্যন্ত তৃপ্তির সাথে স্বাদ বদলানো গেল।

আট

দ্বীপে আসার পর প্রায় দশ মাস কেটে গেছে। যে দুরবস্থায় পড়েছি এ থেকে যে কবে মুক্তি পাবো, জানি না। আদৌ মুক্তি পাবো কিনা তা-ই বা কে বলতে পারে? তবে এ ক'মাসে যতটুকু বুঝেছি, আমার আগে আর কোনো মানুষের পা পড়েনি দ্বীপের এ অংশে। অন্যান্য অংশের অবস্থা কি, জানার একটা তাগিদ অনুভব করছি মনে মনে।

১৫ জুলাই তারিখে বের হলাম। প্রথমে গেলাম সেই খাঁড়ি বা ছোট নদীমুখটার কাছে। জাহাজ থেকে জিনিসপত্র নিয়ে আসার সময় এখানেই ভেলা ভিড়িয়েছিলাম আমি। নদীর পাড় ধরে এগোতে শুরু করলাম দ্বীপের ভেতর দিকে। প্রায় দু'মাইল যাওয়ার পর বুঝতে পারলাম, জোয়ারের পানি আর এগোচ্ছে না। শীর্ণ একটা জলস্রোতে পরিণত হয়েছে নদী। একেবারে স্বচ্ছ টলটলে পানি। শুকনোর দিন বলে নদীর অনেক জায়গায়ই পানি নেই বললেই চলে। চমৎকার সবুজ তৃণভূমির ভেতর দিয়ে বয়ে গেছে ছোট্ট নদীটা।

তৃণভূমির পর একটু উঁচু এক জায়গায় প্রচুর তামাক গাছ দেখলাম। কচি অথচ বিরাট বিরাট পাতা গাছগুলোর। আর এক জায়গায় দেখলাম বুনো আখের গাছ। এছাড়া আরো নানা ধরনের গাছের দেখা পেলাম, যেগুলো আগে কখনো দেখিনি আমি। এসব গাছের ভেতর একটা বিশেষ গাছ আমি খুঁজতে লাগলাম। কাসাবা শিকড়। ইণ্ডিয়ানরা রুটি বানায় ওজিনিসের গুঁড়ো দিয়ে। পেলে আমার খাবারের সমস্যা কমতো একটু। কিন্তু চোখে পড়লো না একটাও।

আজকের মতো যথেষ্ট হয়েছে। ফিরে এলাম আস্তানায়। পরদিন আবার বেরোলাম। একই পথ ধরে এগোতে লাগলাম। কাল যে পর্যন্ত গিয়েছিলাম সে জায়গা ছাড়িয়ে আরো কিছুদূর যাওয়ার পর দেখলাম, শেষ হয়ে যাচ্ছে তৃণভূমি। ক্রমশ বুনো হয়ে উঠছে প্রকৃতি। বড় বড় গাছপালা দেখা দিতে শুরু করেছে। নানান ধরনের ফলের গাছ এখানে ওখানে। বিশেষ করে তরমুজ এবং আঙুর গাছ প্রচুর। বড় বড় গাছের ওপর দিয়ে লতিয়ে উঠে গেছে আঙুর গাছ। পেকে টস টস করছে আঙুরের থোকাগুলো।

ইচ্ছে হলো ঝাঁপিয়ে পড়ে খাওয়া শুরু করি। কিন্তু দমন করলাম ইচ্ছেটা। মনে পড়লো, বারবারি উপকূলে এরকম পাকা আঙুর খেয়ে মারা গিয়েছিলো বেশ কয়েকজন ইংরেজ ক্রীতদাস। ঠিক করলাম আঙুরগুলো বাড়ি নিয়ে গিয়ে শুকিয়ে কিশমিশ বানিয়ে রাখবো।

সারা বিকেল ঘোরাঘুরি করে কাটালাম। রাতে আস্তানায় ফিরলাম না। একটা গাছে উঠে বসে রইলাম। পরদিন সকালে আবার রওনা হলাম দ্বীপের অবস্থা দেখতে।

অবশেষে একটা পাহাড়ের কাছে পৌঁছালাম। পশ্চিম দিকে ঢালু হয়ে নেমে গেছে পাহাড়টা। তার গায়ে এক জায়গায় একটা ফাটল থেকে ঝর ঝর করে নেমে

আসছে একটা ঝরণা। ঝকঝকে পরিষ্কার পানি। জায়গাটাকে এমন তরতাজা আর সবুজ দেখাচ্ছে যে মনে হলো, সযত্নে তৈরি করা বাগান একখানা। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নামতে নামতে অপূর্ব এক অনুভূতি হল আমার। মনে হলো এসব–সব আমার। আমিই এখানকার একমাত্র অধিপতি।

প্রচুর কোকো, কমলা, লেবু এবং সিট্রন গাছ দেখলাম দ্বীপের এই অংশে। কিন্তু সবই বুনো। খুব কম গাছেই ফল আছে। এটা বোধহয় ফলের সময় নয়। একটা গাছ থেকে কয়েকটা কাঁচা লেবু পেড়ে খেয়ে দেখলাম, কাঁচা হলেও চমৎকার স্বাদ। মনে হয় স্বাস্থ্যকরও।

খালি হাতে, এবং কাপড়-চোপড়ের ভেতরে করে যতটা সম্ভব লেবু, কমলা এবং আঙুর নিয়ে রওনা হলাম আস্তানার দিকে। ঠিক করলাম কয়েকদিন পরেই বস্তা নিয়ে এসে যত বেশি সম্ভব ফল নিয়ে যাবো এখান থেকে।

তিনদিন লাগলো বাড়ি ফিরতে। কিন্তু বাড়ি পৌঁছানোর আগেই আঙুরগুলোর বারোটা বেজে গেল। লেবুর চাপে গলে গেল সব। লেবুগুলো অবশ্য অক্ষতই আছে।

পরদিন আবার গেলাম সেই জায়গায়। সঙ্গে দুটো ছোট ছোট থলে নিয়েছি এবার। প্রথমেই গেলাম আঙুর গাছগুলোর কাছে। থোকার পর থোকা আঙুর পেড়ে ঝুলিয়ে দিলাম আশপাশের গাছগুলোর ডালে। এভাবে কয়েকদিন থাকলে শুকিয়ে কিশমিশ হয়ে যাবে সব। থলে দুটো ভর্তি করে লেবু নিয়ে ফিরে এলাম আস্তানায়।

প্রচুর ফল ফলালির গাছ এবং চমৎকার পরিবেশ দেখে ভীষণ লোভ হতে লাগলো ওখানে চলে যাওয়ার। মনে হলো, এখনকার আস্তানা ছেড়ে এ জায়গায় নতুন একটা আস্তানা তৈরি করে নেই। কিন্তু সব দিক বিবেচনা করে, যেখানে আছি সেখানে থাকাই ঠিক করলাম। প্রথমত, নতুন একটা আস্তানা বানাতে প্রচুর পরিশ্রম করতে হবে, দ্বিতীয়ত, যেখানে আছি সে-জায়গাটা সমুদ্রের তীরে, হয়তো কোনোদিন কোন জাহাজের দেখা পেয়ে যাবো, যাতে করে আবার ফিরে যেতে পারবো লোকালয়ে। নতুন জায়গাটা সমুদ্রতীর থেকে অনেক দূরে, ওখানে থাকলে সাগরের দিকে নজর রাখতে পারবো না। তবু, অনেক ভেবে চিন্তে ঠিক করলাম, ওখানে ছোট একটা কুটির তৈরি করবো। বেশির ভাগ সময় সমুদ্রতীরের আস্তানায়ই থাকবো, মাঝে মাঝে ওখানে গিয়ে কাটিয়ে আসবো দু'তিনদিন।

কাজ শুরু করে দিলাম। সমান একটা জায়গা বেছে নিয়ে আগে বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেললাম। তারপর ছোট একটা তাঁবু খাটালাম। পালের কাপড় যথেষ্টই আছে, সুতরাং অসুবিধা হলো না তাঁবু খাটাতে। অগাস্টের শুরুতেই শেষ হয়ে গেল কাজ।

অগাস্টের তিন তারিখে দেখলাম, গাছে ঝুলিয়ে দেয়া আঙুরগুলো পুরোপুরি শুকিয়ে চমৎকার কিশমিশে পরিণত হয়েছে। গাছ থেকে নামিয়ে থলে ভর্তি করে নিয়ে এলাম গুহায়। পরদিন থেকে এমন বৃষ্টি শুরু হলো যে, বেশ কয়েকদিন গুহা ছেড়ে বেরোতে পারলাম না। অক্টোবরের মাঝামাঝি পর্যন্ত একটানা বৃষ্টি চললো। ভাগ্যিস সে-দিন কিশমিশগুলো সব নিয়ে এসেছিলাম। না হলে, এই বৃষ্টিতে নষ্ট

হয়ে যেতো।

বৃষ্টির জন্যে প্রায় একমাস গুহায় বন্দী থাকতে হলো। খাওয়া আর ঘুমানো ছাড়া আর কোনো কাজ রইলো না হাতে। তাই আর কি করবো, প্রত্যেকদিনই নিয়মিত দু'তিন ঘণ্টা করে সময় ব্যয় করতে লাগলাম গুহাটাকে বড় করার কাজে। একটা বিশেষ দিকে মাটি কাটতে কাটতে একদিন পাহাড়ের উল্টো পাশ দিয়ে বেরিয়ে এলাম গুহার বাইরে। নতুন গুহা মুখটায় একটা দরজা লাগিয়ে দিলাম। এই পথটা হওয়ায় এখন পাঁচিল টপকাটপকি না করে অনেক সহজে গুহায় ঢুকতে বা বেরোতে পারি।

এরই মধ্যে একদিন ত্রিশে সেপ্টেম্বর দিনটা এসে গেল। এই অভিশপ্ত দ্বীপে ওঠার এক বছর পূর্ণ হলো আমার। দিন তারিখের হিসেব রাখি যে কাঠের ফলকটার ওপর সেটায় প্রথম বছর পূর্তির চিহ্ন কাটলাম ছুরির আগা দিয়ে।

এর কিছু পরে একদিন খেয়াল করলাম, কালি শেষ হয়ে এসেছে আমার। দোয়াতটার তলে সামান্য একটু অবশিষ্ট আছে। আরো সাবধানে খরচ করতে হবে, মনে মনে বললাম। এর পর থেকে স্মরণীয় ঘটনাগুলোর কথাই শুধু লিখতে লাগলাম দিন লিপিতে।

আগেই বলেছি, কয়েকটা যব এবং ধানের গাছ হয়েছিলো আমার প্রাঙ্গণে। যত্ন করে বড় করার পর যথাসময়ে ফল এসেছিলো গাছগুলোয়। বেশ খানিকটা যব এবং ধান পেয়েছিলাম। বীজ হিসেবে ব্যবহার করার জন্যে রেখে দিয়েছিলাম সবটুকু। এবার বীজগুলো কাজে লাগাতে হবে।

আমার ধারণা, ইতিমধ্যে দ্বীপের আবহাওয়া সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা লাভ করতে পেরেছি; কখন শুকনো, কখন বর্ষা জেনে গেছি। আমার হিসেব মতো সামনে বর্ষা। সুতরাং মাটিতে কয়েকটা গর্ত করে পুঁতে দিলাম বীজগুলো। কি মারাত্মক ভুলই না ভেবেছিলাম আমি। ভাগ্য ভালো, সবগুলো বীজ না লাগিয়ে এক তৃতীয়াংশ মতো রেখে দিয়েছিলাম।

পরের কয়েকটা মাস এক বিন্দু বৃষ্টি হলো না। তীব্র খটখটে রোদে একটা বীজ থেকেও চারা বের হলো না।

কয়েক মাস পর বৃষ্টি নামলো। আর দেরি করলাম না। সেই ফল বাগানের ভেতর আমার নতুন কুটিরের কাছে এক টুকরো জমি বেছে নিয়ে লাগিয়ে দিলাম বাকি বীজগুলো। ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ দিকের কথা এটা। ক'দিন পর চারা বেরোলো বীজ থেকে। মার্চ এবং এপ্রিলের পুরো বৃষ্টি পেয়ে তরতরিয়ে বেড়ে উঠলো গাছগুলো। সময়মতো ফল ধরলো। ফলন হলো আশাতীত। প্রায় আধ পেক (১ পেক=১/৪ বুশেল) করে চাল এবং যব পেলাম।

এই সময় আরো কিছু কাজ জুটে গেল আমার। ঝুড়ির অভাবে অনেক কাজ দ্বিগুণ পরিশ্রম করে করতে হচ্ছে আমাকে। তাই ঝুড়ি বানানোর উপযোগী কিছু ডালপালা খুঁজছিলাম অনেক দিন ধরে। কিন্তু পাইনি। যেগুলো পেয়েছি সেগুলো কোনো কাজে লাগাতে পারিনি, মটমটিয়ে ভেঙে যায় সব।

একদিন হঠাৎ খেয়াল করলাম, আমার গ্রামের বাড়ির (নতুন কুটিরটার এই নাম দিয়েছি) চারপাশে বেড়া দেয়ার কাজে যে ডালগুলো ব্যবহার করেছি, খুবই

নমনীয় সেগুলো। প্রায় বেতের মতো। একটা ডালের দু'মাথা বাঁকিয়ে এক জায়গায় করে ফেললেও ভাঙে না। আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম আমি। তাড়াতাড়ি কিছু সরু ডাল কেটে নিয়ে রোদে শুকোতে দিলাম। ভালো করে শুকিয়ে কাজের উপযোগী হওয়ার পর গুহায় নিয়ে এলাম সেগুলো। তারপর শুরু করলাম ঝুড়ি বানানো।

ইয়র্ক-এ আমাদের বাড়ির খুব কাছেই এক ঝুড়িওয়ালার দোকান ছিলো। ছেলে-বেলায় এ দোকানের সমনে দাঁড়িয়ে তন্ময় হয়ে ঝুড়ি বানানো দেখতাম। কখনো ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেতো, আমার দেখা শেষ হতো না। কখনো কখনো মনের আনন্দে সাহায্য করতাম লোকগুলোকে। এ সময় ঝুড়ি বানানোর কায়দা পুরোপুরি রপ্ত হয়ে গিয়েছিলো আমার। সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগলো এবার। একদিনেরও কম সময়ে খাড়া করে ফেললাম একটা ঝুড়ি।

তারপর আরো ডাল সংগ্রহ করে আনলাম। অল্প কিছুদিনের ভেতর, ছোট বড় নানা আকারের অনেকগুলো ঝুড়ি তৈরি হয়ে গেল। সেই সাথে মাটি, ফলমূল বা অন্যান্য জিনিস বহন করার কাজও অনেক সহজ হয়ে গেল।

দ্বীপের বাকি অংশগুলো দেখতে হবে এবার। যে পাশে আমার আস্তানা তার উল্টোদিকের উপকূল সম্পর্কে এখনো পুরোপুরি অজ্ঞ আমি। ওদিকে কি আছে না আছে জানার জন্যে বেরিয়ে পড়লাম একদিন। বন্দুক এবং কুকুরটা ছাড়াও সঙ্গে নিলাম একটা ছোট কুড়াল, সাধারণত যা সঙ্গে রাখি তারচেয়ে বেশি পরিমাণ বারুদ এবং গুলি, দুটো বিস্কুট আর বড় এক থলে কিশমিশ।

ছোট্ট নদীটার তীর ধরে হাঁটতে শুরু করলাম। ফল বাগানের ভেতর দিয়ে গিয়ে আমার কুটিরটা পেরোলাম। পশ্চিম দিকে আরো কিছুদূর হাঁটার পর ধীরে ধীরে দৃষ্টিপথে ভেসে উঠলো সমুদ্র। পরিষ্কার আকাশ। উজ্জ্বল দিন। সমুদ্র ছাড়িয়ে আরো পশ্চিমে চোখ গেল। ঝাপসাভাবে ডাঙ্গা দেখতে পেলাম। পনের বিশ লিগের কম হবে না দূরত্ব। কি ওটা? দ্বীপ, না মহাদেশের অংশ? এত দূরে যে ঠিক বুঝতে পারলাম না।

নিশ্চয়ই ওটা আমেরিকা মহাদেশের অংশ, ভাবলাম আমি। সম্ভবত স্প্যানিশদের দখলে জায়গাটা। একবার মনে হলো কোনো অলৌকিক উপায়ে যদি চলে যেতে পারতাম ওখানে!

একটু পরেই অবশ্য মনে হলো, আমেরিকার এ অঞ্চলটা হয়তো জংলীদের রাজত্ব, ওখানে গেলে এখানকার চেয়ে খারাপ অবস্থায় পড়তে হতে পারে। একথা ভেবে আক্ষেপ দূর হয়ে গেল আমার। অলস ভঙ্গিতে এগোতে লাগলাম সামনে।

দ্বীপের এই অংশটাকে অন্যান্য অংশের চেয়ে–বিশেষ করে এখন যেখানে আমার আস্তানা রয়েছে, তার চেয়ে অনেক অনেক গুণ ভালো মনে হচ্ছে। বিস্তৃত জায়গা জুড়ে সুন্দর সবুজ ঘাস, মাঝে মাঝে ছোট ছোট দু'একটা গাছে বুনো ফুল ফুটে রয়েছে। চমৎকার কাঠ হওয়ার মতো বড় গাছও আছে অনেক। প্রচুর তোতা পাখি দেখলাম গাছের ডালে। ভাবলাম, সম্ভব হলে ধরবো একটা পাখি। পুষবো এবং কথা শেখাবো। সরু একটা ডাল কেটে নিয়ে চেষ্টা করতে লাগলাম, যদি

বাড়ি মেরে ফেলতে পারি একটাকে। অনেকক্ষণ চেষ্টা করার পর মোটামুটি বাচ্চা একটা পাখি ফেলতে পারলাম। কাছে গিয়ে কুড়িয়ে নিলাম ওটা। আঘাত মারাত্মক কিছু নয় দেখে আশ্বস্ত হলাম। বেঁচে যাবে। সঙ্গে করে নিয়ে চললাম পাখিটাকে। (বাড়িতে নিয়ে ওটাকে কথা শেখাতে পেরেছিলাম বটে, কিন্তু সেজন্যে কয়েক বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছিলো আমাকে।)

উপকূলে পৌঁছুলাম অবশেষে। অসংখ্য কচ্ছপে ছেয়ে আছে বেলাভূমি। আশ্চর্য, এখানে এত কচ্ছপ, অথচ আমার ওদিকে, গত দেড় বছরে তিনটে মাত্র দেখেছি। বিভিন্ন জাতের অসংখ্য পাখিও দেখলাম এখানে। কিছু পরিচিত, কিছু অপরিচিত।

উপকূল ধরে এগোতে লাগলাম পুব দিকে। প্রায় বারো মাইল যাওয়ার পর থামলাম। যথেষ্ট হয়েছে, আর না। চিহ্ন রাখার জন্যে এক জায়গায় শক্ত একটা খুঁটি গেড়ে রেখে বাড়ির পথ ধরলাম। যে পথে এসেছি সে পথে না গিয়ে, আমার আস্তানার অবস্থান আন্দাজ করে নিয়ে, সে অনুযায়ী আড়াআড়ি একটা পথ ধরলাম।

এমনিতে প্রচণ্ড গরম, তার ওপর বন্দুক এবং গোলাবারুদের ওজন। এই অবস্থায় অতটা পথ হাঁটতে সত্যিই খুব কষ্ট হবে। সময়ও লাগবে বেশি। তাছাড়া নতুন একটা পথ ধরে গেলে সে-পথের আশপাশের জায়গা সম্পর্কেও একটা ধারণা পেয়ে যাবো। এসব ভেবেই আড়াআড়ি যাওয়ার বুদ্ধি করলাম। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারলাম কাজটা উচিত হয়নি।

নতুন পথ ধরে দু'তিন মাইল আসার পর ঢালু একটা বড় পাহাড় ঘেরা উপত্যকায় পৌঁছুলাম। জঙ্গলে ছাওয়া জায়গাটা। অল্প সময়ের মধ্যেই দিক হারিয়ে ফেললাম। গত কয়েকদিন ধরে মেঘলা আবহাওয়া চলছে। ফলে সূর্য দেখে দিক ঠিক করবো তার উপায় নেই।

পরের তিন চারটে দিনও মেঘলা গেল। বৃষ্টি হলো না ঠিক, তবে সূর্যের মুখও দেখা গেল না। শেষ পর্যন্ত আগের পথেই ফেরার সিদ্ধান্ত নিলাম। খুঁজে খুঁজে সেই চিহ্ন দেয়া খুঁটিটার কাছে পৌঁছুলাম। তারপর হাঁটতে লাগলাম যে পথে এসেছিলাম সে-পথ ধরে।

ফেরার পথে একটা বাচ্চা ছাগল দেখে সেটার ওপর ঝাঁপিয়ে গিয়ে পড়লো আমার কুকুরটা। আমি তাড়াতাড়ি দৌড়ে গিয়ে কুকুরটার হাত থেকে বাঁচালাম ছাগল ছানাটাকে। বাড়িতে যে খোঁড়া ছাগলটা আছে, সেটার সাথে এটাকেও পুষবো বলে ঠিক করলাম। গলায় দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে চললাম বাচ্চাটাকে। গ্রামের বাড়িতে পৌঁছে ওটাকে ছেড়ে দিলাম বেড়ার ভেতর। বাড়ি যাওয়ার জন্যে অস্থির হয়ে পড়েছি। এমনিতেই দেরি হয়েছে অনেক, ছাগলের বাচ্চাটাকে নিতে গেলে আরো দেরি হয়ে যাবে। আপাতত এখানে থাক, পরে এসে নিয়ে যাবো ওকে।

নয়

গুহায় ফিরে সোজা আমার দোলনা-বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। গত কয়েকদিন উল্টো-পাল্টা হাঁটাহাঁটিতে ভয়ানক পরিশ্রম হয়েছে। ঠিক করলাম, আর কখনো এত লম্বা সময় বাড়ির বাইরে থাকবো না।

পাক্কা এক সপ্তাহ বিশ্রাম নিলাম। বিশ্রামের ফাঁকে ফাঁকে পাখিটার জন্যে একটা খাঁচা তৈরি করে ফেললাম। ইতিমধ্যে পাখিটা খাপ খাইয়ে নিতে শুরু করেছে আমার বাড়ির পরিবেশের সঙ্গে। পোষ মানতে খুব বেশিদিন লাগবে বলে মনে হয় না।

ছাগল–ছানাটার কথা ভাবলাম এবার। এই ক'দিনে কি অবস্থা হয়েছে বেচারার কে জানে? ঠিক করলাম, কালই গ্রামের বাড়িতে যাবো। সম্ভব হলে নিয়ে আসবো ওটাকে, নয় তো কিছু খাবার দিয়ে আসবো।

রওনা হলাম পরদিন সকালে। যেখানে রেখে গিয়েছিলাম সেখানেই আছে ছাগল-ছানাটা। তবে খাবারের অভাবে প্রায় মরতে বসেছে। তাড়াতাড়ি আশপাশের গাছ-পালা থেকে কিছু পাতা, কচি ডাল এসব সংগ্রহ করে এনে দিলাম। ঝাঁপিয়ে পড়ে খেতে শুরু করলো ছাগলটা। খাইয়ে-দাইয়ে আগের মতো আবার ওটার গলায় দড়ি বেঁধে রওনা হলাম বাড়ির দিকে। একটু পরেই বুঝতে পারলাম না বাঁধলেও চলতো। ক'দিন না খেয়ে থেকে এমনিতেই পোষ মেনে গেছে ওটা। দড়ি বেঁধেছি বটে, কিন্তু একটুও টানতে হচ্ছে না। নিজে নিজেই আসছে পেছন পেছন প্রভুভক্ত কুকুরের মত। বাড়িতে ফিরেও নিয়মিত আদর-যত্ন এবং খাবার দিতে লাগলাম ওটাকে। ক'দিনের ভেতর ভীষণ ভক্ত হয়ে গেল আমার।

বৃষ্টির দিন এলো। আগের মতোই ভাবগম্ভীর পরিবেশে তিরিশে সেপ্টেম্বর–দ্বীপে ওঠার দ্বিতীয় বার্ষিকী উদযাপন করলাম। দুবছর হয়ে গেল এখানে এসে উঠেছি। কিন্তু আমার ভবিষ্যৎ দ্বীপে এসে উঠি যেদিন সেদিনও যেমন ছিলো আজও তেমনই অন্ধকারাচ্ছন্ন রয়েছে। মাঝে মাঝে ভবিষ্যতের কথা ভেবে শিউরে উঠি। আর কতদিন এরকম নিঃসঙ্গ, একাকী থাকতে হবে এখানে? মাঝে মাঝে অবশ্য এক রকম আনন্দের অনুভূতিতেও মনটা ছেয়ে যায়। মনে হয়, আমার এখনকার জীবনই ভালো। যথার্থই একজন খাঁটি মানুষের মতো নিজের পরিশ্রম দিয়ে নিজের বেঁচে থাকার চাহিদা পূরণ করছি। আসলে অনেক বদলে গেছি আমি। আমার আগের অনুভূতি আবেগ আর এখনকার অনুভূতি-আবেগের মাঝে দুস্তর ব্যবধান। এখন বোধহয় ইচ্ছে করলেও আর আগের জীবনে ফিরে যেতে পারবো না।

নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে ফসল তোলবার সময় হলো। বর্ষার শুরুতে আধ পেক যব এবং ধানের কিছুটা রেখে বাকিটা লাগিয়ে দিয়েছিলাম জমিতে। এবার আর আগের মতো ভুল করিনি। বৃষ্টি হবে আশা করে বীজ না লাগিয়ে, বৃষ্টি

হওয়ার পর লাগিয়েছি। ফলে খুব তাড়াতাড়িই অঙ্কুর বেরিয়েছে। কয়েক দিনের ভেতর খুবই তেজী চেহারা নিয়ে বেড়ে উঠলো চারাগুলো। শেষ পর্যন্ত যদি এরকম তেজ বজায় থাকে তাহলে আশা করা যায় ভালোই হবে ফলন। কিন্তু কয়েকদিনের ভেতর আবার সব হারানোর আশঙ্কায় আতঙ্কিত হয়ে পড়লাম আমি।

হঠাৎ একদিন খেয়াল করলাম, কে যেন মুড়িয়ে খেয়ে গেছে কিছু ধান গাছ। পাগল হওয়ার দশা হলো আমার। কি হতে পারে? বেশি ভাবনা-চিন্তা করতে হলো না। সহজেই চিনতে পারলাম শত্রুকে—ছাগল এবং খরগোস জাতীয় বুনো জন্তুর কাজ এটা। আমার খেতের আশপাশ দিয়ে ঘুরে বেড়ায়, এবং ইচ্ছে হলেই ধান এবং যব গাছগুলোর পাতার স্বাদ পরখ করে।

আগের বার বীজ থেকে চারা বের হয়নি—সেটা অন্য কথা। এবার বীজ থেকে চারা বের হওয়ার পরও যদি গাছগুলোকে রক্ষা করতে না পারি তো এর চেয়ে দুর্ভাগ্যজনক আর কিছু হতে পারে না। কিন্তু কি করে বাঁচাবো গাছগুলো?

পুরো খেতটার চারপাশে বেড়া দিয়ে দেয়া ছাড়া আর কোনো উপায় দেখতে পেলাম না। কিন্তু বলা যত সোজা, করা তত সোজা নয়। এবার বেশ অনেকটা জায়গা নিয়ে তৈরি করেছি খেত। একা একা এতবড় একটা জায়গার চারপাশে বেড়া দেয়া সোজা কথা নয়। পুরো তিন সপ্তাহ লাগলো কাজ শেষ করতে। এই তিন সপ্তাহে দিনের বেলায় কাজের সময় বন্দুক তৈরি রেখেছি কাছে। ছাগল বা খরগোস জাতীয় কিছু দেখলেই সঙ্গে সঙ্গে গুলি। রাতে পাহারা দেয়ার জন্যে খেতের কাছে একটা খুঁটিতে বেঁধে রেখেছি কুকুরটাকে। সারা রাত ঘেউ ঘেউ করে চিৎকার করেছে ওটা। এর পরে আর নষ্ট হয়নি গাছ। বেড়া দেয়ার পর দ্রুত বেড়ে উঠলো গাছগুলো। ওদের সবুজ সতেজ চেহারা দেখে চোখ জুড়িয়ে যায় আমার।

ধীরে ধীরে পরিপক্ক হলো গাছগুলো। ফল এলো। প্রায় একই সঙ্গে ধান এবং যবের গাছে শিষ দেখা দিলো। এবার হলো আর এক বিপদ। ছাগল আর খরগোসের আক্রমণে নষ্ট হচ্ছিলো গাছ, এবার পাখির আক্রমণের শিকার হলো ফল। শিষ আসার পর একদিন গিয়ে দেখি, অসংখ্য পাখি ঘিরে রেখেছে ছোট্ট খেতটা। আমাকে দেখেই একটু দূরে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো। ভাবখানা, আমি চলে গেলে আবার তারা কাজে লাগবে। তাড়াতাড়ি বন্দুকের আওয়াজ করে তাড়ালাম ওদের। বন্দুকের আওয়াজ করতেই ছোট্ট একটা পাখির মেঘে ছেয়ে গেল আকাশ। খেতের ভেতর থেকেও উড়াল দিলো অনেক পাখি।

স্পষ্ট আমি দেখতে পেলাম আমার ফসলের ভবিষ্যৎ। প্রত্যেক দিন যদি এভাবে পাখির পাল এসে ফসল নষ্ট করে, তা হলে মাত্র কয়েক দিন পরেই দেখবো একটা গাছেও একদানা শস্য অবশিষ্ট নেই। তার মানে আমার রুটি খাওয়ার আশা শেষ। আমার প্রচণ্ড পরিশ্রম আর আশাকে এভাবে নষ্ট হতে দিতে পারি না। ঠিক করলাম, প্রয়োজন হলে দিনরাত বসে বসে খেত পাহারা দেবো।

এর মধ্যে কতটুকু ক্ষতি হয়েছে দেখার জন্যে খেতের ভেতর গেলাম। দেখলাম, মোটামুটি ভালো পরিমাণ ধান এবং যব নষ্ট করতে পেরেছে ওরা, তবে দানাগুলো এখনো যথেষ্ট কচি থাকায় ক্ষতি খুব বেশি হয়নি। এখনো যা অবশিষ্ট

আছে তা যদি ঘরে তুলতে পারি তো পরিমাণে খুব একটা কম হবে না।

বন্দুকে গুলি বারুদ ভরে বাড়ি ফিরে যাচ্ছি, এমন একটা ভান করে রওনা হলাম। একটু দূরে এসে একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে দেখতে লাগলাম পাখিগুলোর হাবভাব। আমি ওদের দৃষ্টির আড়ালে চলে আসতেই একটা একটা করে উড়ে আসতে লাগলো পাখি। প্রথমে খেতের আশপাশে জটলা করলো কিছুক্ষণ। তারপর উড়ে গিয়ে বসতে লাগলো একেবারে খেতের ওপর। আর দেরি না করে আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেই গুলি করলাম আমি। আবার আকাশ ছেয়ে গেল পাখির মেঘে। খেতের কাছে গিয়ে দেখলাম মারা পড়েছে তিনটে। এটাই চাইছিলাম আমি। মরা পাখি ক'টা তুলে নিয়ে লাঠির মাথায় বেঁধে টানিয়ে দিলাম খেতের পাশে–যেভাবে আমরা ইংল্যাণ্ডে ভয়ঙ্কর চোরদের শেকলে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখি, যাতে অন্য চোররা তা দেখে শিক্ষা পায়, ঠিক সেভাবে। আশাতীত ফল হলো। পাখির দল আমার খেতের চারপাশ থেকে তো পালালোই, দ্বীপের এই এলাকা ছেড়েই পালালো।

ডিসেম্বরের শেষ নাগাদ ফসল কাটার কথা ভাবলাম আমি। যথেষ্ট পেকেছে ধান ও যব। আর পাকাতে গেলে ঝরে পড়ে যাবে মাটিতে। কিন্তু প্রথমেই সমস্যা দেখা দিলো, কি দিয়ে কাটবো। কাস্তে বা ধান কাটার উপযোগী অন্য কোনো অস্ত্র নেই আমার। বানিয়ে নিতে হবে। কিন্তু কিভাবে? কাস্তে বানানোর জন্যে যে রকম দক্ষতা আর সাজ সরঞ্জাম লাগে তার কিছুই নেই আমার। শেষ পর্যন্ত কাস্তে বানানোর বুদ্ধিটা এবারের মতো তুলে রাখলাম। গাছ না কেটে শস্যের ছড়াগুলো শুধু কেটে নিলাম ছুরি দিয়ে। আমার বানানো একটা বড় ঝুড়িতে করে গুহায় নিয়ে এলাম সেগুলো। দু'হাতের তালু দিয়ে ডলে মাড়াই এর কাজ সারলাম। ঝাড়াঝাড়ির পর দেখা গেল, আধ পেক বীজ থেকে কম করে হলেও দুই বুশেল ধান এবং আড়াই বুশেলেরও বেশি যব পাওয়া গেছে।

ভীষণ খুশি হয়ে উঠলাম আমি। বুঝতে পারলাম, যথাসময়েই ঈশ্বর আমাকে আবার রুটির স্বাদ গ্রহণ করতে দেবেন।

কিন্তু আবার সমস্যা: ধান থেকে চাল পাবো কি করে? যব গুঁড়ো করবো কি করে? যদি বা কোনো অলৌকিক উপায়ে চাল এবং যবের গুঁড়ো পেলাম, তা দিয়ে খাবার বানাবো কি করে? রুটি বানাবো কি করে? বানাতে পারলেও সেঁকবো কি করে?

ধান ও যবের বেশ ভালো একটা মওজুদ গড়ে তুলবার ইচ্ছা আমার আগে থাকতেই ছিলো। তার সঙ্গে যোগ হলো এই ব্যাপারগুলো। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিলাম, এবারেও ফসলের একটা দানাও মুখে তুলবো না। পরের বছর বীজ হিসেবে লাগানোর জন্যে রেখে দিলাম সব। এর ভেতর চিন্তা ভাবনা করতে লাগলাম কিভাবে ভাঙানো যায় ধান, গুঁড়ো করা যায় যব, বানানো এবং সেঁকা যায় রুটি। তাছাড়া আরো চিন্তা আছে: এখন যে পরিমাণ বীজ আছে তা কমপক্ষে এক একর জমিতে লাগানো যাবে। এত বড় জমি চাষ করবো কিভাবে? তাছাড়া ছাগল, খরগোসের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে পুরো জমিটা ঘিরতে হবে বেড়া দিয়ে। মোটেই সহজ হবে না কাজটা। আমার হিসেব মতো শুধু বেড়া দিতেই

লেগে যাবে মাসখানেক।

ঘাবড়ালাম না আমি। আবার বীজ বপনের আগে আট-নয় মাস সময় পাবো। ঠিক মতো ব্যবহার করতে হবে সময়টাকে।

কাঠ দিয়ে বেলচা, কোদাল জাতীয় কিছু অস্ত্রপাতি তৈরি করতে হলো প্রথমে তারপর জমি চষতে শুরু করলাম। জমি চাষ করার পর বেড়া দিলাম। এবার এ কাজে এমন সব ডালপালা ব্যবহার করলাম, যেগুলো শুকিয়ে না গিয়ে নতুন গাছে পরিণত হবে। ফলে প্রত্যেক বছর আর বেড়ার জন্যে খাটুনি করতে হবে না। পুরো তিন মাস সময় লাগলো সম্পূর্ণ জমিটা চাষ করে বেড়া দিতে। সবটা সময় যে কোদাল কুপিয়ে আর বেড়া বেঁধে কাটাতে হলো তা অবশ্য নয়। বৃষ্টির কারণে অনেক দিনই বাইরে বেরোতে পারলাম না বলেই এতটা সময় লাগলো।

বৃষ্টির দিনগুলোতে ঘরে বসে নানা ধরনের কাজ করতে লাগলাম। অনেক চিন্তার পর বুঝতে পেরেছি মাটির কিছু পাত্র বানাতে হবে। রান্নার কাজ ছাড়াও আরো অনেক কাজে লাগবে ওগুলো। এখানকার আবহাওয়া এত গরম যে, ঠিক মতো মাটি জোগাড় করতে পারলে হয়তো অসম্ভব হবে না পাত্র বানানো। তারপর রোদে শুকিয়ে নিতে পারবো।

আমার বানানো মাটির পাত্রগুলো কি রকম উদ্ভট আর বিদঘুটে দেখতে হলো তা যদি বলি তো হাসবেন পাঠকরা, নয়তো করুণা বোধ করবেন আমার জন্যে। ছোট বড় নানা আকারের অনেকগুলো পাত্রই বানালাম। কিন্তু রোদে শুকানোর পর বেশিরভাগই বাতিল হয়ে গেল। দুটো মাত্র বড় পাত্র অক্ষত রইলো। এমন কিম্ভূত চেহারা হলো যে আমি নিজেও না হেসে পারলাম না সেগুলো দেখে।

ছোট পাত্রগুলোর চেহারা অবশ্য অনেক ভালো হলো। টিকে গেল বেশির ভাগ। বাটি, থালা, কলসি, হাঁড়ি এসব কেবল রোদে শুকিয়েই এত শক্ত হলো যে অবাক না হয়ে পারলাম না আমি।

এত কিছুর পরেও আমার সমস্যার সমাধান হলো না আসলে। পাত্রগুলো রোদে শুকানো বলে তরল কোনো পদার্থ ওতে নিতে পারি না। কিছুদিন পর ঘটলো ঘটনাটা। মাংস রান্না করার জন্যে বড়সড় একটা আগুনের কুণ্ড তৈরি করেছিলাম। রান্না শেষে আগুন নিভিয়ে দিয়েছি। হঠাৎ খেয়াল করলাম আমার বানানো মাটির পাত্রের একটা ভাঙা টুকরো পড়ে রয়েছে প্রায় নিভে যাওয়া আগুনের ভেতর। কাঁচা মাটি রং বদলে টালির মতো লাল হয়ে গেছে। কৌতূহলী হয়ে আগুনের ভেতর থেকে বের করে আনলাম টুকরোটা। পাথরের মতো শক্ত। এখন পানি লাগলেও আর গলে যাবে না। বুঝতে পারলাম, আগুনে পুড়েই অমন শক্ত হয়েছে মাটি। তার মানে, আমার বানানো পাত্রগুলো যদি এ ভাবে পুড়িয়ে নেয়া যায় তাহলে ওগুলোও এমন শক্ত হবে।

আগুনটা কিভাবে তৈরি করবো তা নিয়ে কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাতে হলো। ঠিক কিভাবে পাত্রগুলো সাজালে, কোথায় কতটা আগুন জ্বালালে সবচেয়ে ভালো ভাবে পুড়বে এসব সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা পাওয়ার পর শুরু করলাম কাজ। তিনটে মাঝারি আকৃতির হাঁড়ি এবং দু' তিনটে অন্য ধরনের পাত্র একটার

ওপর আরেকটা সাজিয়ে স্তূপের মতো চেহারা দিলাম। স্তূপের চারপাশে ঢিবি ক র জ্বলন্ত কাঠ কয়লা দিয়ে তার ওপর সাজিয়ে দিলাম শুকনো কাঠ। জ্বলন্ত কয় র সংস্পর্শে এসে জ্বলে উঠলো কাঠ। পুড়তে লাগলো পাত্রগুলো। কাঠগুলো সব পুড়ে যাওয়ার আগেই নতুন করে সাজিয়ে দিলাম আরো কাঠ। যতক্ষণ না পাত্রগুলোর রং আর আগুনের রং এক হয়ে গেল ততক্ষণ চালিয়ে গেলাম এই প্রক্রিয়া। তারপর আরো পাঁচ ছ'ঘণ্টা এ উত্তাপে রেখে দিলাম পাত্রগুলো। এরপর ধীরে ধীরে কমিয়ে আনতে লাগলাম আগুন। আস্তে আস্তে পাত্রগুলোর লাল রংও কমে আসতে লাগলো। তাপমাত্রা যাতে হঠাৎ করে কমে না যায় সেদিকে বিশেষ ভাবে লক্ষ রাখলাম। পাত্রগুলোর ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে তাতে। সারারাত আগুনের পাশে বসে খেয়াল রাখলাম যেন আগুন ধীরে ধীরে নেভে। সকালে খুব ভালো–খুব সুন্দর বলবো না অবশ্যই–তিনটে হাঁড়ি আর অন্য দুটো পাত্র পেলাম। যতটা চেয়েছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশি মজবুত হয়েছে সবগুলো।

যে কোন ধরনের মাটির জিনিস এখন আমি ইচ্ছে মতো শক্ত করতে পারবো। ওগুলোর ঠিক চেহারা দেয়াই আমার একমাত্র সমস্যা। যা হোক, ভালো চেহারা দেয়ার সাধ্য যখন আমার নেই তখন তা নিয়ে ভেবে মাথা খারাপ করেও লাভ নেই।

এবার একটা পাথরের হামানদিস্তা দরকার। শস্য পেষাই করতে হলে এটা অবশ্যই চাই। ভেতরে গর্তওয়ালা একটা পাথর হলেই সবচেয়ে ভালো হয়। কিন্তু বেশ কয়েক দিন খোঁজাখুঁজি করেও কাজ চলার মতো পাথরের সন্ধান পেলাম না। হতাশ হয়ে শেষমেশ শক্ত কাঠ দিয়েই একটা হামানদিস্তা আর তার ডাঁটি বানিয়ে নিলাম।

আমার এবারের সমস্যা হলো চালুনি। চালুনি ছাড়া তো যবের আটা বা চালের গুঁড়ো ভূষি থেকে আলাদা করা যাবে না। আর ভূষি আলাদা করতে না পারলে ভালো রুটিও তৈরি করা যাবে না। ভাল সূক্ষ্ম বুনুনির কাপড় পেলে তা দিয়ে চালুনি বানিয়ে নিতে পারতাম। কিন্তু অনেক ভাবনা চিন্তা করেও সূক্ষ্ম কাপড় কোথায় পাবো বুঝে পেলাম না। লিনেনের যে কাপড়গুলো ছিলো, ইতিমধ্যে ছেঁড়া ত্যানায় পরিণত হয়েছে সব। প্রচুর ছাগলের লোম আছে আমার কাছে। কিন্তু তা দিয়ে সুতো তৈরি করে কাপড় বুনে নেয়া? অসম্ভব! সুতোকাটা বা কাপড় বানানো সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা নেই আমার। ধারণা থাকলেও পারতাম কিনা সন্দেহ। কাপড় বোনার বা সুতোকাটার যন্ত্রপাতি কিছুই নেই। যন্ত্রপাতি বানিয়ে নেয়াও এক কথায় অসম্ভব আমার পক্ষে।

অনেক দিন পরে হঠাৎ একদিন মনে পড়লো, জাহাজের নাবিকদের কাপড়ের ভেতর কিছু গলাবন্ধ আছে। সূক্ষ্ম মসলিনের তৈরি সেগুলো। এ রকম তিনটে গলাবন্ধ দিয়ে তিনটে চালুনি তৈরি করে ফেললাম।

এবার রুটি তৈরি এবং সেঁকার পর্ব। কিভাবে তৈরি করবো রুটি? কিভাবে সেঁকবো? ইস্ট (পাঁউরুটি তৈরির একটি উপাদান) নেই আমার কাছে। পাওয়ার কোনো সম্ভাবনাও নেই। অতএব ইস্ট ছাড়াই রুটি বানাতে হবে। কিন্তু সেঁকার সমস্যাটার সমাধান করি কি করে?

অনেক ভেবে একটা বুদ্ধি বার করলাম। মাটি দিয়ে বড় সড় কয়েকটা পাত্র তৈরি করে পুড়িয়ে নিলাম। পাত্রগুলো পাশে অনেক বড় তবে গভীরতা কম (অনেকটা তাওয়ার মতো)। এই পাত্র আগুনে চড়িয়ে তার ওপর সেঁকে নেবো রুটি।

এ সব করতে করতে তৃতীয় বছরের প্রায় পুরোটাই চলে গেল। যথাসময়ে চাষ দেয়া জমিতে বীজ বুনলাম আবার। আগেই মাটি কোপানো ছিলো। আরেকবার হালকা একটা কোপানি দিয়ে ঝুরো করে নিলাম মাটি। বৃষ্টি পেয়ে অল্প সময়েই অঙ্কুর বেরোলো। সবুজ চারাগাছগুলো বেড়ে উঠতে লাগলো তর তর করে। যথাসময়ে ফল এলো। পাখি তাড়ানোর জন্যে গতবারের পদ্ধতি অবলম্বন করলাম এবারও। মোটামুটি যখন পেকে উঠলো শস্যগুলো, কেটে বাড়ি নিয়ে এলাম ঝুড়ি ভর্তি করে। যব এবং ধান মিলিয়ে প্রায় চল্লিশ বুশেল ফসল পাওয়া গেল। পরিমাণ মতো বীজ রেখে দিয়ে বাকিটা খরচ করার সিদ্ধান্ত নিলাম।

আমার নিজের ফলানো ফসল থেকে, আমার নিজের হাতে তৈরি প্রথম রুটি যেদিন মুখে দিলাম সে দিনের অনুভূতির কথা প্রকাশ করবো কি করে?

দশ

রুটি তৈরির সাজ সরঞ্জাম বানাতে ব্যস্ত থাকলেও, ঐ সময় বারবারই আমার মনে পড়েছে দ্বীপের অন্য পাশ থেকে যে দেশটা দেখেছিলাম সেটার কথা। দু একবার যুরির কথাও মনে পড়েছে। ও আর সেই বড় নৌকাটা থাকলে অনায়াসে এই দ্বীপ আর এ দেশটার মাঝখানের সমুদ্রটুকু পাড়ি দিতে পারতাম।

হঠাৎ একদিন মনে পড়লো আমাদের জাহাজের সেই নৌকাটার কথা, দ্বীপে ওঠার পরদিন ভোরে যেটাকে সৈকতের ওপর পড়ে থাকতে দেখেছিলাম। তক্ষুণি বেরিয়ে পড়লাম। সাগর পাড়ে গিয়ে দেখলাম, প্রথম বার যেখানে দেখেছিলাম সেখানেই আছে এখনো। তবে ঢেউ এবং বাতাসের ধাক্কায় প্রায় উল্টে গেছে নৌকাটা। বড় একটা বালির ঢিবির সঙ্গে ঠেকে আছে।

ভালো মতো পরীক্ষা করলাম ওটাকে। মোটামুটি অক্ষতই রয়েছে। সোজা করে টুকটাক কিছু মেরামত করে নিলে সহজেই পৌঁছে যেতে পারবো দূরে দেখা সেই দেশটায়। ব্রাজিল না হোক, আমার ধারণা, আমেরিকারই কোনো অংশ ওটা। একবার ওখানে গিয়ে উঠতে পারলে একদিন না একদিন পৌঁছে যাবো ব্রাজিলে। চিন্তাটা মাথায় আসতেই নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার হলো আমার শরীরে-মনে। লেগে গেলাম নৌকাটা সোজা করতে।

যত কায়দা-কৌশল জানা ছিলো, সবই প্রয়োগ করলাম। কিন্তু কপাল খারাপ আমার, লাভ হলো না কোনো। বেশ বড় আর ভারি নৌকাটা। একজন তো দূরের কথা, চারজনে মিলেও ওটা সোজা করা যেতো কিনা সন্দেহ। দূর হয়ে গেল উদ্দীপনা। বাকী জীবন আমাকে এ দ্বীপেই কাটাতে হবে! এটাই আমার নিয়তি!

হতাশ মনে ফিরে এলাম আস্তানায়। তবে ভাবনা চলছে মাথায়: সত্যিই কি

কোনো উপায় নেই নৌকাটাকে সোজা করার?

তিন-চার সপ্তাহ ভাবার পরেও কোনো বুদ্ধি এলো না। মনে হচ্ছে সত্যিই অসম্ভব কাজটা।

শেষ পর্যন্ত নতুন একটা সম্ভাবনার কথা ভাবতে শুরু করলাম। আমি নিজেই যদি একটা ক্যানো বা পেরিয়াগুয়া জাতীয় কিছু তৈরি করে নিই? প্রায় কোনো যন্ত্রপাতি ছাড়াই এ ধরনের নৌকা তৈরি করে স্থানীয়রা। বড় একটা গাছের গুঁড়ি খোদাই করতে হবে শুধু। আবার লাফিয়ে উঠলো আমার মন। কাজটা শুধু সম্ভবই নয়, সোজাও। গাছের গুঁড়িকে নৌকার চেহারা দেয়ার মত যন্ত্রপাতি যথেষ্ট পরিমাণেই আছে আমার কাছে।

কাজে লেগে গেলাম। বড়সড় একটা সিডার গাছ বেছে নিলাম। গোড়ার কাছ থেকে কেটে মাটিতে শোয়ালাম গাছটাকে। মেপে দেখলাম, একেবারে গোড়ায় গাছটার ব্যাস পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি, এবং আগার দিকে বাইশ ফুট পরে চার ফুট এগারো ইঞ্চি। এর পরে আরো কিছুদূর ক্রমশ সরু হওয়ার পর ডালপালা ছড়িয়েছে গাছটা।

ভয়ঙ্কর পরিশ্রম করতে হলো নৌকা বানানোর জন্যে। গাছটাকে শোয়াতেই লাগলো বিশ দিন। আরো চোদ্দ দিন লাগলো আগার দিকের ছড়ানো ডালপালা ছেঁটে ফেলতে। কুড়াল চালাতে চালাতে কড়া পড়ে গেল হাতে। নৌকার মতো চেহারা দিতে লাগলো আরো প্রায় এক মাস। খোলের বাইরেটাই ভোগালো বেশি। যা হোক, শেষ পর্যন্ত, ঠিক ঠিক নৌকার মতোই হলো বাইরে থেকে দেখতে।

এবার ভেতরটা। খোলের ভেতরের অংশ খোদাই করতে লাগল প্রায় তিন মাস। স্রেফ বাটালি আর বড় আকারের একটা হাতুড়ি দিয়ে করতে হলো কাজটা। অবশেষে, চমৎকার একটা পেরিয়াগুয়া তৈরি হলো। আমি নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেলাম আমার বানানো নৌকাটার দিকে তাকিয়ে। বিশ্বাসই হতে চাইছে না যে ওটা আমার নিজের হাতে তৈরি। যথেষ্ট বড়। কমপক্ষে ছাব্বিশজন লোক নিয়ে ভাসতে পারবে। তার মানে, আমার সব মালপত্র সমেত আমাকে নিয়েও ভাসতে পারবে।

এর ভেতর একদিন আরো একটা তিরিশে সেপ্টেম্বর এসে চলে গেল নিঃশব্দে। আগের মতোই ভাবগম্ভীর পরিবেশে উদযাপন করলাম দিনটা। দ্বীপে ওঠার পর চারটে বছর কোনদিক দিয়ে যে চলে গেল টেরই পাইনি।

নৌকা তৈরি করতে করতে আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠছে আমার হৃদয়। একবার ভাসাতে পারলে হয়, তারপর আর কে পায় আমাকে! সন্দেহ নেই এই নৌকায় করে সাগর পাড়ি দিতে একটু বেশিই ঝুঁকি নিতে হবে। কিন্তু এ ছাড়া আর কিইবা করার আছে আমার?

নৌকা তৈরির কাজ শেষ। এবার ঠেলে নিয়ে গিয়ে পানিতে ভাসাতে হবে। প্রথম দিনই বুঝতে পারলাম, কি রকম অসম্ভব একটা কাজ আমার সামনে উপস্থিত হয়েছে। যতরকম বুদ্ধি মাথায় এলো সবই প্রয়োগ করলাম। কিন্তু একবিন্দু নড়লো না আমার সাধের নৌকা। পানি থেকে মাত্র একশো গজ দূরে রয়েছে, এক ইঞ্চিও বেশি না। এই একশো গজ এখন একশো মাইলের চেয়েও

বেশি আমার কাছে। সামনে ছোট্ট একটা খাড়াই। সেটাই হয়েছে সমস্যা। বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারছি জায়গাটা ঢালু হলেও হয়তো নৌকাটাকে টেনে নিতে পারতাম না। কিন্তু ডুবন্ত মানুষ যেমন খড়কুটো আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চেষ্টা করে, আমার মনের অবস্থা এখন সেরকম। লেগে গেলাম খাড়াইটাকে ঢালে পরিণত করার কাজে। কয়েক সপ্তাহ একটানা মাটি কেটে শেষ করলাম কাজটা। কিন্তু পরিস্থিতির উন্নতি হলো না একটুও। একবিন্দু নড়লো না নৌকা।

শেষে খাল কেটে নৌকা পর্যন্ত পানি নেয়ার কথা ভাবলাম। নৌকাটাকে যখন পানির কাছে আনতে পারছি না, দেখি চেষ্টা করে পানিকেই নৌকার কাছে টেনে আনা যায় কিনা।

শুরু করে দিলাম কাজ। কয়েকদিনেই বুঝতে পারলাম, কতটা চওড়া আর গভীর করে খুঁড়তে হবে মাটি! এ পর্যন্ত যেটুকু মাটি কেটেছি তা দেখে মনে মনে একটা হিসেব করলাম। কমপক্ষে দশ থেকে বারো বছর লাগবে। এক কথায় অসম্ভব কাজটা। অনেক কষ্টে আত্মসংবরণ করলাম। ছেড়ে দিলাম খাল কাটার কাজ। পড়ে রইলো আমার সাধের নৌকা।

এগারো

দ্বীপে ওঠার পর চার বছরেরও বেশি পেরিয়ে গেছে। জাহাজ থেকে যে সব জিনিস এনেছিলাম, তার বেশির ভাগই শেষ দশায় পৌঁছেছে। বিস্কুট শেষ হয়ে গেছে দু'বছর আগে। লেখার কালিও শেষ। কাপড়-চোপড়ের অবস্থা বলার মতো নয়। বেশিরভাগই স্রেফ ন্যাকড়ায় পরিণত হয়েছে। কয়েকটা রঙচঙে ছাপা শার্ট ছাড়া বাইরে পরার মতো আর কিছু অবশিষ্ট নেই। সেগুলোরও অবস্থা একেবারে জীর্ণ। প্রচণ্ড গরম আবহাওয়ার কারণে বেশির ভাগ সময় কিছু পরতে হয় না আমাকে। বোধহয় সে কারণেই এখনো কোনো মতে টিকে আছে শার্টগুলো। কয়েকটা মোটা জাহাজী ওয়াচ-কোট আছে অবশ্য, কিন্তু সব সময় পরার পক্ষে একটু বেশি গরম সেগুলো।

সত্যি বটে দ্বীপের আবহাওয়া যে রকম গরম তাতে কাপড়ের কোনো দরকার প্রায় নেই। তবু একেবারে উলঙ্গ তো থাকতে পারি না। তাছাড়া প্রচণ্ড গরমের কারণেও কিছু একটা পরা দরকার আমার–অন্তত বাইরে বেরোনোর সময়। খালি গায়ে রোদে বেরুলে ফোস্কা পড়ে যেতে চায় শরীরে। তাই গায়ে তো কাপড় রাখতেই হয়, মাথায়ও কিছু না দিয়ে পারি না। সূর্যের উত্তাপ এত বেশি যে কিছুক্ষণ টুপি ছাড়া থাকলে মাথা ধরে যায়।

কাপড় নামক যে সামান্য কয়েক টুকরো ন্যাকড়া এখনো অবশিষ্ট আছে, গোছগাছ করে রাখলাম সেগুলো। ওয়েস্টকোটগুলো পরতে পরতে ছিঁড়ে গেছে। নাবিকদের বড় বড় ওয়াচ-কোটগুলো কাটছাঁট করে কয়েকটা জ্যাকেট বানানোর চেষ্টা করলাম। কয়েকদিন দর্জিগিরির পর দু'তিনটে নতুন ওয়েস্টকোটও তৈরি করে ফেলতে পারলাম। আপাতত কিছুদিনের জন্যে নিশ্চিন্ত।

এ পর্যন্ত অনেক ছাগল মেরেছি। চামড়াগুলো নষ্ট না করে রেখে দিয়েছিলাম শুকিয়ে। সেগুলো দিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে একটা বড় টুপি বানালাম প্রথমে। চামড়ার লোমশ অংশটা রইলো বাইরের দিকে। ফলে বৃষ্টির পানি ধরবে না চামড়ায়।

চমৎকার হলো টুপিটা। আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেল আমার। এর পর পুরো একপ্রস্থ পোশাক–মানে একটা ওয়েস্টকোট আর হাঁটু পর্যন্ত একটা পাৎলুন তৈরি করলাম চামড়া দিয়ে। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, টুপিটার চেয়ে অনেক অনেক গুণ খারাপ হলো এগুলো। ছুতোর মিস্ত্রী হিসেবে যেমন খুব একটা দক্ষতা দেখাতে পারিনি, দর্জি হিসেবেও পারলাম না।

জিনিসগুলো দেখতে তত ভালো না হলেও কাজের হলো ভালোই। বৃষ্টির ভেতর বাইরে বেরোতে হলে এগুলো পরে বেরোই। জলের দাপটটা টুপি আর ওয়েস্টকোটের লোমশ অংশের ওপর দিয়ে যায়। প্রায় শুকনো থাকে আমার শরীর।

এরপর দীর্ঘ সময় ব্যয় করে অনেক কষ্টে একটা ছাতা তৈরি করলাম। ব্রাজিলে দেখেছিলাম, প্রচণ্ড রোদে চমৎকার কাজে লাগে ছাতা। এখানে আমাকে প্রায়ই রোদ বৃষ্টিতে বাইরে বেরোতে হয়। আমারও যথেষ্ট কাজে লাগবে জিনিসটা। মন মত একটা ছাতা বানাতে পারার আগে নষ্ট করতে হলো দু'তিনটে। সবচেয়ে অসুবিধার মখোমুখি হলাম ছাতাটা ভাঁজ করতে গিয়ে। সহজেই মেলতে পারি, কিন্তু ভাঁজ করতে গেলেই বিপত্তি। এমনভাবে জড়িয়ে-ঘড়িয়ে যায় যে দ্বিতীয়বার আর খোলা সম্ভব হয় না। আর ভাঁজ করা না গেলে সহজে বহন করাও সম্ভব নয়। শেষ পর্যন্ত অনেক মাথা খাটিয়ে, পরিশ্রম করে মন মত একটা ছাতা তৈরি করতে পারলাম। প্রবল বৃষ্টি আর রোদেও অনায়াসে হেঁটে বেড়াতে পারি ওটা মাথায় দিয়ে। যখন দরকার থাকে না তখন ভাঁজ করে বগল দাবা করে ঘুরতে পারি।

এভাবে অনেক সহজ আর আরামদায়ক হয়ে উঠলো আমার জীবন-যাত্রা। মনটাকে পুরোপুরি ঈশ্বরের হাতে সঁপে দিয়েছি। ফলে আরো সহজ হয়ে উঠেছে নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণা সহ্য করা।

আরো পাঁচটা বছর কেটে গেছে। আগের মতোই নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করে চলেছি আমি। একই নিয়মে কেটে যাচ্ছে দিনগুলো–যব এবং ধান ফলানো, ফসল তোলা, ময়দা বানানো; আঙুর শুকিয়ে কিশমিশ বানানো, মাঝে মাঝে শিকার করা; সব একই নিয়মে চলছে। তবে এ সময়ে বিশেষ কোনো কিছু যে ঘটেনি তা নয়। খাবার সংগ্রহের দৈনন্দিন কাজগুলো ছাড়া সবচেয়ে বড় যে কাজটা করেছি তা হলো, আর একটা ক্যানো তৈরি করেছি। আগেরটার চেয়ে অনেক ছোট আর হাল্কা। অনেকদিন আগেই শেষ হয়েছে ওটা তৈরির কাজ। ছ'ফুট চওড়া আর চার ফুট গভীর একটা খাল খুঁড়ে পানি নিয়ে গেছি নৌকা পর্যন্ত। তারপর এ খাল বেয়ে সেই ছোট্ট নদীতে নিয়ে এসেছি ক্যানোটা। এবার আর তত সময় লাগেনি

নৌকা বানাতে। এমনিতেই এ নৌকাটা ছোট, তাছাড়া আগের বারের অভিজ্ঞতাও বেশ সহায়ক হয়েছিল। তবে খালটা খুঁড়তে প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হয়েছে। দু'বছর একটানা পরিশ্রমের পর কাজ চালানোর মতো পানি আনতে পেরেছিলাম ওতে।

কিন্তু যে উদ্দেশ্যে প্রথম নৌকাটা তৈরি করেছিলাম তা কাজে পরিণত করা সম্ভব নয় ছোটটা দিয়ে। দ্বীপের ওপাশ থেকে যে দেশটা দেখেছিলাম (সম্ভবত মূল ভূখণ্ড) সেখানে পৌঁছুতে হলে কমপক্ষে চল্লিশ মাইল সাগর পাড়ি দিতে হবে। এত ছোট নৌকা নিয়ে এক কথায় অসম্ভব সেটা।

কিন্তু নৌকা যখন আছে তখন, দ্বীপের চারপাশে চক্কর মারতে দোষ কি? দ্বীপের ওপাশে একবার গিয়েছি বটে, তবে এখনো তার বেশির ভাগই দেখা হয়নি। এবার দেখবো। তাই ছোট একটা মাস্তুল লাগালাম নৌকায়। জাহাজের পালের কাপড় দিয়ে মাপ মতো একটা পালও তৈরি করলাম। মাস্তুলের সঙ্গে পাল খাটিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে একদিন চালিয়ে দেখলাম। চমৎকার চললো নৌকা।

পরের কাজগুলোয় হাত দিলাম এবার। নৌকার দুই প্রান্তের গলুই-এর কাছে দুটো বাক্স লাগালাম। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, খাবার-দাবার, গোলাবারুদ ইত্যাদি রাখতে পারবো এগুলোয়; রোদ বৃষ্টিতে ক্ষতি হবে না। খোলের কাছে বন্দুক রাখার জন্যে একটা তাক মতো তৈরি করলাম। বৃষ্টির সময় বন্দুকটাকে শুকনো রাখার জন্যে তাকটার ওপরে একটা ঢাকনাও লাগালাম।

মাথায় যাতে রোদ না লাগে সেজন্যে ছাতাটাকে মাস্তুলের মতো করে লাগিয়ে নিলাম নৌকার পেছন দিকে। ব্যস, নিশ্চিন্ত। এখন ইচ্ছে হলেই ছোট্ট নৌকাটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ি সমুদ্রে। নদীর মোহনা থেকে খুব একটা দূরে অবশ্য যাই না। এভাবে কেটে গেল কয়েকটা দিন। নৌকাটাকে ঠিক মতো চালানোর কায়দাকানুনগুলো রপ্ত হয়ে যাওয়ার পর নামলাম আসল কাজে।

দ্বীপের চারপাশে চক্কর দিতে বেরোনোর প্রস্তুতি নিতে শুরু করলাম। খাবার হিসেবে নিলাম দু'ডজন যবের রুটি, মাটির এক পাত্র ভর্তি চাল ভাজা (এ জিনিসটা খেতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি আজকাল), ছোট্ট এক বোতল রাম এবং প্রায় আধখানা ঝলসানো ছাগল। এছাড়া গুলি-বারুদ তো আছেই। রাতে শোয়া এবং গায়ে দেয়ার জন্যে দুটো বড় ওয়াচ-কোট নিলাম।

দ্বীপে ওঠার ষষ্ঠ বছর, নভেম্বরের ছয় তারিখে রওনা হলাম। যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে দীর্ঘ হলো ভ্রমণ। এমনিতে খুব বড় নয় দ্বীপটা। কিন্তু পুব পাশে পৌঁছে দেখতে পেলাম, সমুদ্রে প্রায় দুই লিগ জুড়ে ছোট বড় নানা আকারের ডুবো-আধাডুবো পাহাড় ছড়িয়ে আছে। তার ওপাশে প্রায় আধ লিগ চওড়া একটা বালির চরা। ফলে প্রায় দ্বিগুণ ঘুরতে হলো আমাকে।

ডুবো পাহাড়গুলো প্রথম দেখে একবার মনে হলো ফিরে যাই। কে জানে কত বড় এলাকা নিয়ে ছড়িয়ে আছে ওগুলো? না জানি কতটা পথ ঘুরতে হবে? পরে যদি ফিরতে না পারি? এই সব সাত পাঁচ ভেবে নৌকাটাকে তীরের কাছে নিয়ে নোঙ্গর ফেললাম। ছোট্ট এই নোঙ্গরটা জাহাজ থেকে এনেছিলাম।

নৌকাটাকে নিরাপদে রেখে বন্দুক নিয়ে তীরে উঠে এলাম। তীরের খুব

কাছেই একটা পাহাড়। উঠতে শুরু করলাম সেটায়।

পাহাড়ের ওপর উঠে তাকালাম ডুবো-আধাডুবো পাহাড়ে ছাওয়া জায়গাটার দিকে। খালি চোখে দেখেই বুঝতে পারলাম খুব শক্তিশালী একটা স্রোত বয়ে চলেছে পুব দিকে। ডুবো পাহাড়গুলোর কাছে এসে কেন্দ্রীভূত হয়েছে স্রোতটা, ফলে ওখানে কয়েকগুণ বেড়ে গেছে স্রোতের বেগ। আরো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে, সময় নিয়ে, ভালো করে দেখলাম। বুঝে নিতে চাইলাম, কতটা বিপদের মুখোমুখি হতে হবে ওখান দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে। কিছুক্ষণের ভেতর নিঃসন্দেহ হলাম, সম্ভব নয় ওখান দিয়ে যাওয়া। স্রোতের ধাক্কায় বাইরের সমুদ্রে গিয়ে পড়ার সম্ভাবনা। দ্বীপের অন্য পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে আরেকটা স্রোত। একই রকম শক্তিশালী। আগের স্রোতটার সঙ্গে এটার পার্থক্য এই যে, অনেকটা দূর দিয়ে যাচ্ছে এটা। উপকূলের খুব কাছেই একটা প্রবল ঘূর্ণি দেখতে পেলাম। এ ঘূর্ণির ভেতর পড়লে সোজা তলিয়ে যেতে হবে নৌকাসহ। অর্থাৎ ফিরে যাওয়া ছাড়া এ-মুহূর্তে আর কিছু করার নেই আমার।

কিন্তু ফিরে যেতে ইচ্ছে হলো না। পুরো দু'দিন চুপচাপ বসে রইলাম। স্রোতের উল্টো দিক থেকে জোর বাতাস বইছে। ফলে আরো তরঙ্গবিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে জায়গাটা।

তৃতীয় দিন সকালে বাতাস পড়ে যাওয়ায় শান্ত হয়ে গেল সমুদ্র। আবার রওনা হলাম আমি। সামান্য একটু যেতে না যেতেই বুঝতে পারলাম, উপকূলের একেবারে কাছে হলেও পানি এখানে অনেক গভীর। স্রোতও প্রবল। স্রোতের তোড়ে ভেসে যেতে লাগলো নৌকা। কিছুই করতে পারলাম না আমি। ঘূর্ণিটা রয়েছে বাম পাশে। ভাগ্য ভালো সেদিকে যাচ্ছে না স্রোত। স্রোতের তোড়ে ঘূর্ণিটাকে পাশ কাটিয়ে দ্রুতগতিতে এগিয়ে যেতে লাগলো নৌকা। পাল খাটানো আছে বটে, কিন্তু, তা থেকে কোনো সাহায্য পাচ্ছি না। কারণ বাতাস নেই। বৈঠা চালিয়ে চেষ্টা করছি স্রোতের পাল্লা থেকে বেরিয়ে যেতে, কিন্তু লাভ হচ্ছে না। মুখ ঘুরিয়ে তাকালাম পেছনে। দূরে সরে যাচ্ছে দ্বীপটা।

ধ্বক করে উঠল বুকের ভেতর। আজ আর রক্ষা নেই! দ্বিতীয় স্রোতটা যেখানে এই স্রোতের সঙ্গে মিশেছে সেখানে পৌঁছে অবস্থা কি দাঁড়াবে কল্পনা করে দমে গেলাম একেবারে। এই স্রোত থেকেই বেরোতে পারছি না, দুটো স্রোতের শক্তি যখন এক জায়গায় হবে তখন অবস্থাটা কি দাঁড়াবে? মৃত্যু ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না সামনে। গভীর সমুদ্রে কতদূর পর্যন্ত গেছে স্রোতটা কে জানে? কতদিন পর্যন্ত একটানা এই স্রোতের টানে ভেসে যেতে হবে তাই-বা কে বলবে? সমুদ্র শান্ত থাকলে, ডুবে মরবো না হয়তো। কিন্তু অনাহারে মৃত্যু ঠেকাবে কে? বড় একটা পাত্র ভর্তি পানি আছে বটে। গতকাল ধরা বিরাট একটা কচ্ছপও আছে নৌকায়। কিন্তু এই বিশাল সমুদ্রে ক'দিন চলবে এটুকু খাবার দিয়ে?

পেছন ফিরে দ্বীপটার দিকে তাকালাম আবার। পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর জায়গা বলে মনে হলো ওটাকে। হৃদয়ের সবটুকু ইচ্ছা দিয়ে ফিরে যেতে চাইলাম ওখানে। ব্যাকুলভাবে দু'হাত ছড়িয়ে দিয়ে কাতর কণ্ঠে বলে উঠলাম, 'হায়রে

আমার সুখের মরুভূমি! আর কখনো দেখবো না তোমাকে!' নিজের আচরণে নিজেরই মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে হচ্ছে। দ্বীপে আমার নিঃসঙ্গতা নিয়ে অকৃতজ্ঞের মতো কতই না বিলাপ করেছি। এখন কোন্ মুখে আবার ওখানে ফিরে যেতে চাইছি।

শরীরে শেষ বিন্দু শক্তি থাকা পর্যন্ত লড়বো, ভাবলাম আমি। শক্ত হাতে বৈঠা ধরলাম। প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলাম, যাতে স্রোতের এক কিনারে রাখা যায় নৌকাটাকে।

দুপুরের দিকে হাল্কা বাতাস মৃদু একটা পরশ বুলিয়ে দিলো আমার মুখে। দক্ষিণ-দক্ষিণ-পুব থেকে বয়ে আসছে। খুশি হয়ে উঠলাম। আধ ঘণ্টার ভেতর বেশ খানিকটা বাড়লো বাতাসের বেগ। কিন্তু ইতিমধ্যে আশঙ্কাজনক একটা দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে নৌকা এবং উপকূলের মাঝে। ঘাবড়ালাম না আমি। মাস্তুলটা সোজা করে পাল তুলে দিলাম।

পালটা ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে, টান উপেক্ষা করে স্রোতধারার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে লাগলো নৌকা। আমি নিজেও বৈঠার সাহায্যে স্রোতের ভেতর থেকে বের করে নেয়ার চেষ্টা করতে লাগলাম নৌকাটাকে। কিছুক্ষণের মধ্যে দেখলাম, একটু যেন বদলে গেছে পানির রং। অর্থাৎ স্রোতের বেগ এখানে অন্য রকম। পর মুহূর্তে অনুভব করলাম নৌকার ওপর আর স্রোতের টান নেই। পুবদিকে প্রায় আধ মাইল মতো দূরে এক জায়গায় একটা ডুবো পাহাড়ে বাধা পেয়ে দুভাগ হয়ে যাচ্ছে স্রোত। একটা ভাগ যাচ্ছে উত্তর-পুব দিকে, অন্য ভাগটা তীক্ষ্ণ এক বাঁক নিয়ে ফিরে আসছে উপকূলের দিকে।

নিশ্চিত মৃত্যুর কোল থেকে ফিরে এলে যেমন অনুভূতি হয় সে রকম আনন্দের অনুভূতিতে ছেয়ে গেল আমার মন। তীরমুখি স্রোতটার মাঝখানে নিয়ে গেলাম নৌকা। পাল, বৈঠা এবং স্রোত—এই তিনের মিলিত টানে দ্রুত উপকূলের দিকে ফিরে আসতে লাগলাম।

তীরের দিকে প্রায় এক লিগ এসে গেছি। দ্বীপের দিকে এগোচ্ছি, কিন্তু স্রোতের টানে প্রতি মুহূর্তে একটু একটু করে উত্তর দিকেও সরে যাচ্ছে নৌকা। ফলে তীরের কাছাকাছি যখন পৌছুলাম তখন দেখি দ্বীপের উত্তর মাথায় এসে গেছি। যেখান থেকে রওনা হয়েছিলাম তার ঠিক উল্টো দিকে জায়গাটা।

পাহাড়ের ওপর থেকে দেখা প্রবল স্রোত দুটোর মাঝখানে এখন আমার নৌকা। দক্ষিণ দিকে একটা—এটার টানেই বাইরের সমুদ্রের দিকে ভেসে যাচ্ছিলাম। অন্যটা উত্তর দিকে—এখনো প্রায় এক লিগ মতো দূরে রয়েছে ওটা। দুই স্রোতের মাঝখানে চমৎকার শান্ত পানি। মৃদুমন্দ বাতাস লাগছে পালে। ধীর গতিতে এগিয়ে চলেছে নৌকা। সোজা তীর বরাবর হাল ধরলাম আমি।

নৌকা তীরে ভেড়ামাত্র হাঁটু গেড়ে বসে। কৃতজ্ঞতা জানালাম ঈশ্বরকে। একমাত্র ঈশ্বরের করুণায়ই এবারও বেঁচে গেছি আমি।

তীরে পৌছার সঙ্গে সঙ্গে এতক্ষণের জমে ওঠা সব ক্লান্তি যেন একসাথে ঝাঁপিয়ে পড়লো আমার ওপর। সামান্য কিছু খেয়ে নিয়ে তিন দিক ডাঙা দিয়ে ঘেরা ছোট্ট এক উপসাগর মতো জায়গায় নিয়ে গেলাম নৌকাটাকে। ঘুমিয়ে

পড়লাম তারপর।

ঘুম ভাঙলো পরদিন ভোরে। প্রথমেই মনে হলো বাড়ি ফিরবো কি করে? যে পথে এসেছি সে পথে ফেরার কথা ভুলেও ভাবলাম না। দ্বীপের যে পাশটা এখনো দেখা হয়নি–অর্থাৎ পশ্চিম পাশ–সেদিকে যাওয়ারও কোনো ইচ্ছা হলো না। এরমধ্যেই যথেষ্ট দুঃসাহসের পরিচয় দেয়া হয়ে গেছে; আর দরকার নেই। তীরের একদম কাছাকাছি থেকে পশ্চিম দিকে নৌকা চালাতে লাগলাম। প্রায় মাইল তিনেক আসার পর চমৎকার একটা খাঁড়ির খোঁজ পেলাম। ছোট্ট নদীর মতো। ডাঙার দিকে প্রায় মাইলখানেক ভেতরে ঢুকে গেছে খাঁড়িটা। ক্রমশ সরু হতে হতে একসময় ক্ষীণ এক ঝরণাধারায় পরিণত হয়েছে। নৌকা রাখার পক্ষে খুব ভালো মনে হলো জায়গাটাকে।

ছোট্ট নদীটার ভেতর ঢুকে কিছুদূর যাওয়ার পর নিরাপদ একটা জায়গা বেছে নিয়ে বাঁধলাম নৌকাটাকে। তারপর ডাঙায় নেমে এলাম।

কোথায় আছি জানার জন্যে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ালাম কিছুক্ষণ। একটু পরেই বুঝতে পারলাম, আগে এসেছি এ জায়গায়। পায়ে হেঁটে যখন দ্বীপ দেখতে বেরিয়েছিলাম তখন এসেছিলাম এখানে। আর দেরি করলাম না, ছাতা এবং বন্দুক নিয়ে রওনা হলাম পাহাড়ি বুনো-পথ ধরে। বিকেল নাগাদ পৌঁছে গেলাম আমার গ্রামের বাড়িতে। যেখানে যা কিছু যেমন রেখে গিয়েছিলাম সবকিছু তেমন রয়েছে।

ভয়ানক ক্লান্ত লাগছে বেড়া টপকে ভেতরে ঢুকে। তাঁবুর ছায়ায় গিয়ে বসলাম। কখন যে ঘুমিয়ে গেলাম টেরও পেলাম না।

কতক্ষণ পরে জানি না, হঠাৎ ঘুমের ঘোরে শুনতে পেলাম, কে যেন আমার নাম ধরে ডাকছে–'রবিন! রবিন ক্রুসো! কোথায় তুমি, রবিন ক্রুসো? কোথায় তুমি?'

ঘুম ভেঙে গেল। কে ডাকে আমার নাম ধরে?

অনেকক্ষণ আর কোনো শব্দ নেই। চারদিক নিশ্চুপ। স্বপ্ন দেখছিলাম নাকি? কান খাড়া করে রইলাম।

একটু পরে আবার শুনতে পেলাম ডাকটা। 'রবিন ক্রুসো, রবিন ক্রুসো।'

উঠে বসলাম ধড়মড় করে। দেখতে পেলাম না কাউকে। ভালো করে খুঁজলাম চারপাশে। কোনো মানুষ চোখে পড়লো না। হঠাৎ চোখ গেল বেড়ার ওপর। আমার পোষা তোতা পাখি পল বাবাজী বসে আছে সেখানে। উনিই তাহলে ডাকাডাকি করছিলেন এতক্ষণ! আমার শেখানো কথা বলেই ভড়কে দিয়েছে আমাকে।

আচমকা ঘুম ভেঙে যাওয়ায় ধড়াস ধড়াস করছে বুকের ভেতর। চুপচাপ বসে রইলাম কিছুক্ষণ। একটু আত্মস্থ হওয়ার পর বেশ মজা পেলাম মনে মনে। রীতিমতো চমকে দিয়েছিলো পাখিটা। কিন্তু একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না, এখানে এলো কি করে? রওনা হওয়ার আগে তো গুহায় রেখে এসেছিলাম ওকে!

উঠে দাঁড়িয়ে হাত এগিয়ে দিলাম। ডাকলাম নাম ধরে। উড়ে এসে আমার আঙুলের ওপর বসলো পল। আবার ডাকতে শুরু করলো, 'রবিন ক্রুসো, কোথায় ছিলে তুমি?' ভাবখানা যেন, আমাকে আবার দেখতে পেয়ে আহ্লাদে আটখানা হয়ে

গেছে। কাঁধের ওপর বসিয়ে বাড়ি নিয়ে এলাম ওকে।

গত কয়েক দিনে যথেষ্ট সমুদ্রে ঘোরা হয়েছে। বলা যায়, নৌকা ভ্রমণের শখ ভালো মতোই মিটেছে। আপাতত কিছুদিন চুপচাপ বসে থাকলে বা ডাঙায় ঘোরাঘুরি করলে ক্ষতি নেই। নৌকাটাকে দ্বীপের এপাশে এনে রাখতে পারলে খুব খুশি হতাম, কিন্তু কি করবো, অনেক ভেবেও কোনো উপায় বের করতে পারলাম না। স্রোত দুটো এড়িয়ে কোনো মতেই ওটা আনা সম্ভব নয়। সুতরাং, 'আমার কোনো নৌকা নেই,' এরকম ভেবেই আপাতত খুশি থাকতে হলো।

বারো

চমৎকার নিরিবিলি, প্রশান্ত দিন কাটছে আমার। ছুটি কাটাচ্ছি যেন। একমাত্র মানুষ ছাড়া আর কিছুর অভাব বোধ করছি না। এই নিঃসঙ্গতার বেদনাটুকু বাদ দিলে বলতে হবে ভালই কাটছে সময়।

ঠেকায় পড়ে যে সব কাজ শিখতে হয়েছে, সেগুলোর দক্ষতা বাড়ানোর চেষ্টা করছি। বারবার অনুশীলনের মধ্য দিয়ে ভালমত ব্যবহার করতে শিখেছি ছুতোর মিস্ত্রীর যন্ত্রপাতিগুলো। গত এক বছরে টুকটাক যে কয়েকটা আসবাবপত্র বানিয়েছি সেগুলোর চেহারা আর আগেরগুলোর মতো অত জঘন্য হয়নি।

মাটির পাত্র তৈরিতেও বেশ পটু হয়ে উঠেছি। এমন নিখুঁত চেহারার থালা, বাটি বানিয়েছি যে নিজেই আশ্চর্য হয়ে যাই সেগুলো দেখে। একটা চাকা তৈরি করে নিয়েছি। হুবহু কুমোরদের চাকার মতো হয়নি যদিও, তবে কাজ চলে যাচ্ছে আমার। এই চাকার সাহায্যে পাত্রগুলো সুন্দরভাবে গোল করতে পারছি। আগের উদ্ভট চেহারার পাত্রগুলো বাতিল করে দিয়েছি। তামাক খাবার জন্যে একটা পাইপও বানিয়েছি মাটি দিয়ে। খুব সুন্দর হয়নি অবশ্য দেখতে। তবে আমার প্রয়োজন মিটছে। আগে খুব ধূমপান করতাম। দ্বীপে ওঠার পর আর সুযোগ পাইনি। জাহাজে পাইপ ছিলো। কিন্তু কোথায় তামাক পাবো ভেবে আনিনি। পরে যখন দ্বীপে তামাকের খোঁজ পেলাম তখন খুব আফসোস হয়েছিল। এখন তামাক খেতে কোনো অসুবিধা নেই।

ঝুড়ি বানানোর কাজেও দারুণ উন্নতি করেছি। বিভিন্ন কাজের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের প্রচুর ঝুড়ি তৈরি করেছি। দেখতে খুব সুন্দর না হলেও কাজ চালানোর উপযোগী হয়েছে সেগুলো। জিনিসপত্র রাখা, বা বয়ে আনা অনেক সহজ হয়ে গেছে। খেত থেকে ফসল ঘরে আনা কিংবা, গ্রামের বাড়ি থেকে আঙুর বয়ে আনার জন্যে বলতে গেলে কোনো ঝামেলাই পোহাতে হয় না এখন।

দশ বছর পার হয়ে গেছে দ্বীপে ওঠার পর। সব কিছুই আগের মতো চলছে। নির্ঝঞ্ঝাট নিরিবিলি নিজের মতো আছি। শুধু একটা ব্যাপার নিয়ে মাঝে মধ্যে চিন্তিত হয়ে পড়ি–দ্রুত শেষ হয়ে আসছে বারুদ। যখন সবটুকু শেষ হয়ে যাবে তখন কি করবো ভেবে পাই না। ছাগল মারবো কি করে?

আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, এখানে আসার বছর তিনেক পরে একটা ছাগলের বাচ্চা পুষতে শুরু করেছিলাম? তখনও এই চিন্তা হয়েছিল, বারুদ শেষ হয়ে গেলে শিকার করবো কি করে? ছাগলছানাটাকে বেশ যত্ন করে বড় করে তুলেছিলাম। আশা ছিলো, সময় মতো একটা মর্দা ছাগল ধরতে পারবো এবং এই দুটো ছাগল থেকে এক সময় আমার নিজের একটা ছাগলের পাল গড়ে উঠবে। বাচ্চা ছাগলটা বড় হলো, বুড়ো হলো, তারপর মরে গেল, কিন্তু মর্দা ছাগল আর ধরতে পারিনি। আসলে ধরার তেমন চেষ্টাও করিনি।

দ্বীপে ওঠার একাদশ বছরে আজ আবার সেই পুরনো ইচ্ছেটা জেগে উঠলো মনে–নিজের একটা ছাগলের পাল গড়ে তুলতে হবে। না হলে এক সময় যেমন খালি মাংস খেয়ে থাকতে হয়েছে, কিছুদিন পরে তেমন খালি রুটি আর চাল ভাজা খেয়ে থাকতে হবে। কিন্তু ছাগলের পাল তৈরি করতে হলে কমপক্ষে একটা মর্দা ছাগল আর একটা মাদী ছাগল দরকার। কি করে ধরবো? অনেক ভেবেচিন্তে ঠিক করলাম ফাঁদ পাততে হবে।

প্রথমে রশির ফাঁদ দিয়ে চেষ্টা করলাম। কিন্তু লাভ হলো না। দু'একটা ছাগল ফাঁদে আটকালো বটে কিন্তু, কিছুক্ষণের ভেতর রশি কেটে পালালোও। তারের ফাঁদ পাততে পারলে হতো। কিন্তু কোথায় পাবো তার?

শেষে ভাবলাম, চোরা গর্ত করে দেখা যাক কি হয়। কয়েক দিনের ভেতর, যে এলাকায় ছাগলের পাল চরে বেড়ায় সেখানে বেশ গভীর করে বড় বড় কয়েকটা গর্ত খুঁড়ে ফেললাম। ডালপালা দিয়ে ঢেকে দিলাম গর্তগুলোর মুখ। এবার অপেক্ষার পালা।

একদিন যায়, দু'দিন যায়। একটা ছাগলও গর্তে পড়ছে না। গর্তগুলোর আশপাশে পাকা যব এবং ধানের শিষ দিয়ে রাখলাম। এবারও কোনো ফল নেই। শিষগুলো খেয়ে সুন্দর কেটে পড়ে ছাগলের দল, গর্তের ধার দিয়েও যায় না। মনে মনে হতাশ হলেও চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলাম।

প্রায় মাসখানেক পর একদিন ভোরে গিয়ে দেখি, একটা গর্তে একটা বড় মর্দা ছাগল আর অন্য একটা গর্তে তিনটে ছোট ছোট বাচ্চা আটকা পড়েছে। বাচ্চা তিনটের একটা মর্দা আর দুটো মাদী।

বুড়োটাকে নিয়ে কি করবো ভেবে পেলাম না। এমন বদমেজাজী যে প্রথম প্রথম গর্তের কাছেই যেতে সাহস হলো না। মেরে ফেলতে পারি ওটাকে, কিন্তু তাতে আমার সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। গর্তটার কাছে গিয়ে উপরের ডালপালা সরিয়ে দিতেই লাফিয়ে উঠে পালালো ওটা। পরে বুঝেছিলাম, এ রকম না করলেও চলতো–ক্ষুধায় সিংহও বশ মানে তো ছাগল। যদি খাবার না দিয়ে তিন চারদিন আটকে রাখতাম, তারপরে একটু একটু করে খাবার এবং পানি দিতাম তাহলে এক সময় বাচ্চাগুলোর মতোই পোষ মেনে যেতো ওটা। কয়েকদিন সময় লাগতো এই যা।

যাহোক, বড়টা পালানোর পর বাচ্চাগুলোর কাছে গেলাম। একটা একটা করে গর্ত থেকে তুলে রশি দিয়ে একসঙ্গে বেঁধে কোনো রকমে টেনে হিঁচড়ে বাড়ি নিয়ে এলাম।

প্রথম কয়েকদিন কিছু খেলো না ওরা। সামনে কচি কচি ঘাস-পাতা রাখলাম। মুখেও তুললো না। শেষ পর্যন্ত যখন পাকা যব আর ধানের শিষ রেখে লোভ লাগালাম তখন আস্তে আস্তে পোষ মানতে শুরু করলো। এখন পোষাগুলো যেন কোনো মতে বুনোগুলোর সংস্পর্শে আসতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। তা না হলে বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার বুনো হয়ে যাবে ওগুলো।

ঠিক করলাম, কিছুটা জায়গা ঘিরে নিয়ে সেখানে রাখবো বাচ্চাগুলোকে। কয়েকদিন লাগলো ভালো একটা জায়গা বেছে বের করতে। চমৎকার ঘাসে ছাওয়া জায়গাটা আমার গ্রামের বাড়ির কাছেই। এক ধারে ছোট্ট একটু বন। রোদের সময় ছাগলগুলো ছায়া পাবে এখানে। ছোট ছোট কয়েকটা ঝরণাও আছে জায়গাটায়। খাবার বা পানির কোনো অভাব হবে না। আপাতত দেড়শো গজ লম্বা আর একশো গজ চওড়া একটা অংশ ঘিরবো। পরে কখনো যদি ছাগলের পাল অনেক বড় হয়ে যায় তখন আরো জমি ঘিরে নেয়া যাবে।

কাজ শুরু করে দিলাম। লাফিয়ে যাতে টপকাতে না পারে সেজন্যে বেশ উঁচু করতে হলো বেড়া। ফলে সময়ও লাগলো বেশি। বেড়া বাঁধার সময় রোজ বাচ্চাগুলোকে নিয়ে গিয়ে বেঁধে দিই জায়গাটায়। সহজে যেন চিনে ফেলে আমাকে সেজন্যে কাছাকাছিই রাখি। মাঝে মাঝে নিজের হাতে ধান বা যব খাওয়াই। কচি কচি পাতা ছিঁড়ে এনে দেই গাছ থেকে। বেড়ার কাজ শেষ হতে হতে পুরো পোষ মেনে গেল ছাগল কটা। ইতিমধ্যে বেশ বড় হয়ে উঠেছে সেগুলো। বেড়ার ভেতর নিয়ে গিয়ে বাঁধন খুলে দিলাম।

তেরো

দেড় বছরের ভেতর বারোটা ছাগলের একটা পাল হয়ে গেল আমার। বেশ কয়েকটাকে মেরে খাওয়া সত্ত্বেও আরো দু'বছর পর ছাগলের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো তেতাল্লিশ-এ। ওদের খাঁওয়ার ব্যবস্থা করার জন্যে আরো পাঁচটা নতুন জায়গা বেড়া দিয়ে ঘিরতে হলো।

ইচ্ছে মতো এখন মাংস খেতে পারছি। শুধু তা-ই নয়, প্রচুর দুধও পাচ্ছি। ছাগল পোষার কথা প্রথম যখন ভাবি তখন কিন্তু দুধের কথা একবারও মনে হয়নি। পরে যখন ব্যাপারটা মাথায় আসে তখন লাফিয়ে উঠেছিলাম খুশিতে।

রীতিমতো একটা খামার গড়ে তুলেছি আমি। কোনো কোনো দিন দু'গ্যালন পর্যন্ত দুধ পাই। যে আমি ছাগল তো দূরের কথা জীবনে কখনো একটা গরু দোয়াইনি, মাখন বা পনির বানাতে দেখিনি, সেই আমি এখন অনায়াসে মাখন, পনির এসব তৈরি করি। দুধ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে যেন এগুলোও বানাতে শিখে গেছি।

মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভাবি, প্রথম যখন দ্বীপে উঠি তখন কি ছিলো আমার? না খেয়ে মরা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিলো না সামনে। আর এখন শুধু

একজন সঙ্গী ছাড়া আর সব কিছুই পেয়েছি। সঙ্গীর অভাবটাও আজকাল আর তেমন অনুভব করি না। পল আছে–মাঝে মাঝে কথা বলে আমার সাথে। বুঝে বলুক আর না বুঝে বলুক, বলে তো। সেটাই বা কম কিসের। রাজকীয় ভঙ্গিতে যখন খেতে বসি তখন আমার ডান পাশে থাকে কুকুরটা। আর বিড়াল দুটো–টেবিলের একপাশে একটা অন্যপাশে আরেকটা, আশায় আশায় বসে থাকে, কখন আমি খাতির করে কিছু খেতে দেবো তাদের।

খুনখুনে বুড়ো হয়ে গেছে কুকুরটা। আর বেশিদিন বাঁচবে না হয়তো। কিন্তু এখনো আগের মতোই বিশ্বস্তভাবে সেবা করে যাচ্ছে আমার। এখন যে বিড়াল দুটো আছে এদুটো জাহাজ থেকে আনা দুটো নয়, তাদের বাচ্চা। সে দুটো অনেক আগেই মারা গেছে। অনেকগুলো বাচ্চা দিয়েছিলো মাদী বিড়ালটা। দুটো রেখে বাকিগুলো ছেড়ে দিয়েছিলাম। ফলে বুনো হয়ে গিয়েছিলো ওগুলো।

বড় হওয়ার পর কিছুদিন ভয়ানক জ্বালিয়েছিলো আমাকে এই বুনো বিড়ালগুলো। যখন তখন এসে লণ্ডভণ্ড করে রেখে যেতো জিনিসপত্র। শেষ পর্যন্ত এমন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম যে গুলি করে মারতে হয়েছিল কটাকে। গতিক সুবিধার নয় দেখে বনে পালিয়ে গিয়েছিল বাকিগুলো।

আজকাল আবার মাঝে মধ্যেই নৌকাটা ব্যবহার করার জন্যে অস্থির হয়ে উঠি। কিন্তু এ ভয়ঙ্কর স্রোত ঠেলে ওটা নিয়ে আসার সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারিনি এখনো। প্রায়ই যাই নৌকাটার কাছে। দেখেশুনে, ওটার সব জিনিসপত্র গোছগাছ করে রেখে আসি। মাঝে মাঝে সময় কাটানোর জন্যেও যাই ওখানে। ছোট্ট খাঁড়িটার ভেতর খানিকক্ষণ বৈঠা বেয়ে সাধ মেটাই। কিন্তু ভুলেও কখনো খোলা সাগরের দিকে যাই না।

নৌকাটাকে কোনোমতে আবার দ্বীপের এপাশে নিয়ে আসা যায় কিনা দেখার জন্যে পর পর কয়েকদিন উপকূলীয় এলাকাগুলো পর্যবেক্ষণ করলাম। কিন্তু সেই প্রবল স্রোত দুটো এড়ানোর কোনো উপায় দেখলাম না। নৌকাটাকে এপাশে আনার আশা একেবারে ছেড়ে দিলাম। তারপর ভাবলাম, আরেকটা নৌকা বানালে কেমন হয়? দ্বীপের ওপাশে একটা আছে, এপাশেও একটা থাকবে। অনেক পরিশ্রম করতে হবে যদিও, কিন্তু হলোই বা; পরিশ্রম করতে আপত্তি নেই আমার।

এই সময় একদিন দুপুরে ঘটলো ঘটনাটা। নৌকার দিকে যাচ্ছি। হঠাৎ সৈকতের ওপর একটা জিনিস দেখে বজ্রাহতের মতো দাঁড়িয়ে পড়লাম আমি। জিনিসটা আর কিছু নয়, মানুষের পায়ের ছাপ। জীবনে কখনো এত অবাক হইনি। পায়ের ছাপ এলো কোত্থেকে? মানুষ আছে এখানে? গত দশ-বারো বছরে কোন্ জায়গায় না গেছি? কিন্তু একটা মানুষও তো চোখে পড়েনি–মানুষ কেন, মানুষের উপস্থিতির কোনো চিহ্নও চোখে পড়েনি! আজ মানুষের পায়ের ছাপ এলো কোত্থেকে?

ধীরে ধীরে সংবিৎ ফিরলো আমার। কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। আশপাশে তাকিয়ে দেখলাম ভালো করে। কোনো শব্দ কানে এলো না, দেখতে পেলাম না কিছুই। আর কোনো পায়ের ছাপ আছে কিনা দেখার জন্যে চারপাশের অনেকটা এলাকার মাটি তন্নতন্ন করে খুঁজলাম। সৈকতের ঢাল বেয়ে

পানি পর্যন্ত নেমে গেলাম। ডাঙার দিকে বনভূমি পর্যন্ত উঠে গেলাম। কিন্তু এ একটাই–আর একটা ছাপও চোখে পড়লো না। আবার ফিরে এলাম ছাপটার কাছে। ভালো করে দেখলাম। না, ভুল দেখিনি। মানুষের পায়ের ছাপই। পাতা, গোড়ালি, পায়ের প্রতিটা অংশ। কেমন করে ছাপটা এলো এখানে ধারণাও করতে পারলাম না।

যেরকম স্বচ্ছ, নিশ্চিন্ত মন নিয়ে রওনা হয়েছিলাম বাড়িতে ফিরে এলাম ঠিক তার উল্টো অনুভূতি নিয়ে। ভীষণ ভয় করছে আমার। পথে আসতে আসতে প্রতিটা গাছের গুঁড়িকে মনে হয়েছে মানুষ; প্রতিটা ঝোপের সামনে এসে মনে হয়েছে, ওপাশে ওঁৎ পেতে বসে আছে কেউ, আর এক পা এগোলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে ঘাড়ের ওপর।

তাড়া খাওয়া জন্তুর মতো ছুটতে ছুটতে এসে দ্রুত ঢুকে পড়লাম বাড়ির ভেতর।

সারা রাত ঘুমাতে পারলাম না। অসম্ভব একটা ভয় ভারি পাথরের মতো চেপে রইলো বুকের ওপর। দু'একবার এমনও মনে হলো, নির্ঘাত শয়তানের কারসাজি ওটা; খামোকা আমাকে ভয় পাইয়ে দিতে চায়। তা না হলে ওরকম জায়গায় মানুষের পায়ের ছাপ আসবে কোত্থেকে? তাও মাত্র একটা? সত্যিই যদি কেউ এসে থাকে, নিশ্চয়ই জাহাজে করে এসেছে? জাহাজটা তাহলে গেল কোথায়? আমি ওখানে পৌঁছার আগেই যদি চলে গিয়ে থাকে তাহলেও সেই প্রশ্নটা আসছে, মাত্র একটা কেন পায়ের ছাপ? শয়তানের কারসাজি না হয়েই যায় না।

ধীরে ধীরে উত্তপ্ত মস্তিষ্কটা একটু ঠাণ্ডা হয়ে আসার পর ভালো করে ভেবে দেখলাম। আমাকে ভয় পাওয়ানোই যদি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তো একটা মাত্র পায়ের ছাপ আঁকার চেয়ে আরো উন্নত কোনো কৌশল বেছে নিতে পারতো শয়তান। দ্বীপের এপাশে থাকি আমি, ঠিক এ সময় ওপাশে গিয়ে পায়ের ছাপটা দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা ছিলো হাজার ভাগের এক ভাগ। নিছক ভাগ্যক্রমেই এ সময় ওখানে উপস্থিত হয়েছিলাম আমি। নইলে ওটা চোখে পড়তো না।

তাহলে কার পায়ের ছাপ ওটা? আপাতত যা বুঝতে পারছি, শয়তানের চেয়ে ভয়ঙ্কর কারো কীর্তি ওটা? মূল ভূ-খণ্ডের জংলীদের কোনো ক্যানো হয়তো স্রোত বা বাতাসের ধাক্কায় এসে পড়েছিলো এ পর্যন্ত। সম্ভবত ভাটার সময় তীরে ভিড়েছিলো নৌকাটা। তীরে নেমেছিলো জংলীরা। অনেকগুলো পায়ের ছাপ হয়তো পড়েছিলো ভেজা বালিতে। পরে জোয়ারের সময় পানি যখন সৈকতের অনেকখানি ডুবিয়ে দিয়েছিলো তখন এ একটা ছাড়া আর সব ছাপ ধুয়ে গেছে। হ্যাঁ, এটাই সম্ভব।

তারপরেই ভয়ঙ্কর চিন্তাটা এলো মাথায়–ওরা আমার নৌকা দেখেছে নিশ্চয়ই! তার মানে জংলীরা জেনে গেছে, এ দ্বীপে লোক আছে। তাই যদি হয়, আবার আসবে ওরা। দল বেঁধে আসবে। শেষ করে ফেলবে আমাকে। আগে থেকে টের পেয়ে যদি কোথাও লুকিয়ে পড়তে পারি, তবু ওরা আমার আস্তানাটা খুঁজে পাবে। লণ্ডভণ্ড করে ফেলবে সব। খাবার-দাবার নষ্ট করবে, ছাগলগুলো নিয়ে যাবে। তাৎক্ষণিকভাবে বেঁচে গেলেও, শেষ পর্যন্ত মরতে হবে আমাকে। না খেয়েই মরতে

হবে!

কি বিচিত্র মানুষের মন! যে আমার একমাত্র দুঃখ ছিলো নিঃসঙ্গতা সেই আমিই এখন মানুষের পায়ের ছাপ দেখে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে মাটির তলে সেঁধিয়ে যেতে চাইছি।

ভয়ানক অস্থিরতার ভেতর দিয়ে কেটে গেল কয়েকটা দিন। আমার স্বাভাবিক কাজকর্ম সব শিকেয় উঠেছে। সারাদিন এ এক চিন্তা, পায়ের ছাপটা কার? নানা রকম যুক্তি দিয়ে মনকে বোঝাতে চাইছি, ছাপটা কোনো বন্ধুর না হলেও শত্রুর নয় হয়তো। কিন্তু শান্ত হচ্ছে না মন। বরং আরো অস্থির হয়ে উঠছে। শয়নে-জাগরণে শুধু মৃত্যু দেখতে পাচ্ছি।

একদিন মনে হলো, পায়ের ছাপটা তো আমারও হতে পারে? নৌকা থেকে নেমে যখন তীরে উঠছিলাম তখন পড়েছিলো ছাপটা? কথাটা ভাবতে পেরে, মনে মনে একটু উৎফুল্লও হয়ে উঠলাম। হাজার বার করে প্রায় সশব্দেই আওড়ালাম, 'হ্যাঁ, ওটা আমারই পায়ের ছাপ! ওটা আমারই পায়ের ছাপ!!'

সাহস ফিরে আসতে লাগলো আমার। গুহা ছেড়ে আবার বাইরে বেরোতে শুরু করলাম। গত তিন-চার দিনে একবারও আস্তানা ছেড়ে বের হইনি। ইতিমধ্যে পুরো এক দিন কেটে গেছে না খেয়ে। সামান্য যবের পিঠা ও পানি ছাড়া আর কিছু ছিলো না ঘরে। মনে পড়লো, ছাগলগুলো দোয়ানো দরকার। রোজ বিকেলে এই কাজটা করি আমি। পরপর তিনদিন দোয়ানো হয়নি, না জানি কত কষ্ট হয়েছে বেচারাদের।

আরো দু-তিন দিন কেটে গেল। অনেকখানি স্বস্তি ফিরে এসেছে মনে। কিন্তু পুরোপুরি না। মোটামুটি বিশ্বাস করতে শুরু করেছি, জংলীদের ব্যাপারটা আমার উত্তপ্ত মস্তিষ্কের কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়, আসলে ওটা আমারই পায়ের ছাপ। তবু খুঁতখুঁতানি ভাবটা যাচ্ছে না মন থেকে। যতবারই ভাবছি ওটা আমার পায়ের ছাপ ততবারই পাল্টা একটা প্রশ্নও জাগছে, সত্যিই ওটা আমার পায়ের ছাপ তো?

ঠিক করলাম সন্দেহের দোলায় আর দুলবো না। আবার যাবো চিহ্নটার কাছে।

পরদিনই রওনা হলাম। এখনো একই রকম রয়েছে ছাপটা। পা থেকে জুতো খুলে খালি পা বসালাম ওটার ওপর। ধ্বক করে উঠলো কলজেটা। আমার পা থেকে বেশ ছোট ছাপটা। কখনোই ওটা আমার পায়ের ছাপ হতে পারে না।

ফিরে এলো সেই অস্থিরতা। দুশ্চিন্তা গিজগিজ করতে লাগলো মাথার ভেতর। শরীরটা কাঁপতে লাগলো একটু একটু—জ্বর এসে গেছে যেন। নিঃসন্দেহে কেউ এসেছিলো দ্বীপে। একজনের বেশিও হতে পারে। এবং সে বা তারা যে জংলী তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সভ্য মানুষ হলে আমার নৌকাটা দেখার পরও কোনো খোঁজ খবর না করে ফিরে যেতো না।

এই সব চিন্তায় রাতে ঘুম হলো না আমার। প্রচণ্ড ক্লান্তিতে ভেঙে আসতে চাইছে শরীর, কিন্তু ঘুম আসছে না। একেকবার তন্দ্রা মতো আসছে, কিন্তু একটু পরেই চমকে জেগে উঠছি। অবশেষে ভোরের দিকে একটু ঘুম এলো।

অনেক বেলায় ভাঙলো ঘুম। বেশ ভালো বোধ করছি এখন। দিনের আলোয়

ভয় কমে গেছে অনেক। ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে বসলাম আবার। শেষে সিদ্ধান্ত টানলাম, একেবারে পরিত্যক্ত নয় দ্বীপটা। মূল ভূ-খণ্ড থেকে বেশি দূরে নয় বলে, স্থায়ী ভাবে কেউ না থাকলেও প্রতি বছর না হোক, অন্তত চার পাঁচ বছর পর পর হলেও নৌকায় করে মূল ভূ-খণ্ড থেকে লোকজন আসে এখানে। এবং পরে চলে যায় আবার। পনেরো বছর ধরে আছি এ দ্বীপে, লোকজন যদি থাকতো, একবার না একবার কারো না কারো সঙ্গে দেখা হতোই। খুব বেশি লোকের খাবারের চাহিদা মেটানোর ক্ষমতা নেই দ্বীপটার। হয়তো সে কারণেই এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করার কথা কেউ ভাবেনি। এই পরিস্থিতিতে নিজের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা ছাড়া আর কি-ই বা আমি করতে পারি?

চোদ্দ

আমার দুর্গের মতো আস্তানাটাকে আরো নিরাপদ, আরো মজবুত করে তুলতে হবে। ঠিক করলাম, এখন যে দেয়ালটা আছে তার বাইরে আরো একটা দেয়াল তুলবো। একই রকম অর্ধবৃত্তাকার, তবে আরো বড় ঘের নিয়ে করবো দেয়ালটা। বারো বছর আগে যেখানে দুই সারি গাছ লাগিয়েছিলাম সেখানেই ভাল হবে। পরিশ্রম অনেক কম হবে তাহলে।

দুমাসের ভেতর শেষ করে ফেললাম কাজ। গাছগুলোর ফাঁকে ফাঁকে খুঁটি পুঁতে তৈরি করেছি বাইরের দেয়ালটা। জাহাজ থেকে আনা পুরোনো দড়ি-কাছি এবং আর যা যা পেয়েছি সব দিয়ে যথাসম্ভব মজবুত করে তুলতে চেষ্টা করেছি। কিছুদূর পরপর একটা করে গর্ত করেছি দেয়ালের গায়ে। মোট সাতটা। দেখতে অনেকটা দুর্গদেয়ালের বুরুজের মতো। ভেতর দিকে মাটি ফেলে ফেলে প্রায় দশ ফুট পুরু করেছি দেয়ালটা। প্রতিটা বুরুজের সামান্য নিচে মাটির উপরিভাগ সমান করে একটা মাচা মতো তৈরি করেছি। জাহাজ থেকে আনা বড় বন্দুকগুলো একটা একটা করে কাঠের ফ্রেমে আটকে বসিয়ে দিয়েছি প্রতিটি মাচায়। নলগুলো বেরিয়ে আছে গর্ত দিয়ে। কামান যেন। এর ফলে এখন আমি মাত্র দুমিনিটের ভেতর এক এক করে সাতটা বন্দুক থেকেই গুলি ছুঁড়তে পারি। দেয়াল তৈরি করতে মাত্র দুমাস লাগলেও, সব কাজ শেষ করতে অনেক মাস লেগে গেল।

এরপর দেয়ালের বাইরের ফাঁকা জমির পুরোটায় বেত জাতীয় গাছের চারা লাগিয়ে দিলাম। অত্যন্ত দ্রুত বাড়ে এসব গাছ। প্রায় বিশ হাজার চারা লাগানোর পর একটু নিশ্চিন্ত হলাম। দু'বছরের ভেতর চারাগুলো বড় হয়ে ঘন ঝোপে পরিণত হলো। এবং পাঁচ-ছ'বছরের ভেতর দেয়ালের বাইরে গভীর এক অরণ্য সৃষ্টি হলো। কারো পক্ষেই ওর ভেতর দিয়ে হেঁটে আসা সম্ভব নয়। জঙ্গলের ওপাশ থেকে দেখে এখন আর বোঝার উপায় নেই যে এখানে মানুষের বাসযোগ্য কিছু আছে।

আমার নিজের ঢোকা বা বেরোনোর জন্যে দুটো মইয়ের ব্যবস্থা করলাম। দেয়ালের গায়ে কোনো দরজা রাখিনি, জঙ্গলের ভেতর দিয়েও চলাচলের কোনো

উপায় নেই। দেয়ালটা যেখানে পাহাড়ের সঙ্গে মিশেছে সেখানে বড় একটা পাথরের সঙ্গে লাগালাম মই দুটো। একটা মই দিয়ে পাথরটার ওপর উঠতে হবে, তারপর পাথরটার ওপর থেকে দ্বিতীয় মই বেয়ে দেয়ালের ওপর উঠতে হবে। মই দুটো নামিয়ে নিলে আর কারো সাধ্য নেই আমার দুর্গের ভেতর ঢোকে। প্রথমত, বুঝতেই পারবে না, এখানে কিছু আছে। পারলেও জঙ্গল ঠেলে এগুতে পারবে না। ধরে নিলাম জঙ্গলের বাধা পেরিয়েও দেয়ালের কাছে পৌঁছুলো কেউ। কিন্তু তারপর? দেয়াল টপকাবে কি করে? অর্থাৎ সব কিছু মিলিয়ে মোটামুটি নিশ্চিন্ত এখন আমি।

এত পরিশ্রমের সবটাই কিন্তু একটা—মাত্র একটা মানুষের পায়ের ছাপের কারণে। যদিও এ পর্যন্ত আর কোনো মানুষের চিহ্ন আমার চোখে পড়েনি।

দু'বছর পর একদিন, বিশেষ কোনো কাজ নেই হাতে। সাগর পাড়ে হেঁটে বেড়াচ্ছি। মাঝে মাঝে তাকাচ্ছি খোলা সাগরের দিকে। হঠাৎ মনে হলো, অনেক দূরে একটা নৌকা যেন। এতদূরে যে, খালি চোখে একটা বিন্দুর মতো লাগলো। জাহাজীদের সিন্দুকগুলোর ভেতর একটা দূরবীন পেয়েছিলাম, কিন্তু এখন সঙ্গে নেই জিনিসটা। ফলে আর কিছু দেখতে পেলাম না। আসলেই ওটা নৌকা কিনা তাও জানা হলো না। ঠিক করলাম দূরবীন ছাড়া আর কখনো সাগর পাড়ে আসবো না।

হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে উঠলাম দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের একটা পাহাড়ে। এ পাহাড়টায় আগে কখনো উঠিনি আমি। পাহাড়ের ওপর থেকে আবার তাকালাম সমুদ্রের দিকে। এবারও কিছু চোখে পড়লো না।

পাহাড় থেকে নেমে পৌঁছুলাম দ্বীপের শেষ প্রান্তে। এবং যা দেখলাম তাতে এক কথায় হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। দু'বছর আগে একটা পায়ের ছাপ দেখে ভয়ে পাগল হওয়ার দশা হয়েছিলো। এখন যা দেখলাম তা যদি সে-সময় দেখতাম, আতঙ্কে মারাই যেতাম হয়তো। ছোট্ট সৈকতটায় ছড়িয়ে আছে মাথার খুলি, হাত, পা এবং মানব দেহের অন্যান্য অংশের হাড়। এক জায়গায় লক্ষ করলাম—মাটিতে গর্ত করে আগুন জ্বালানো হয়েছিলো। স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, জংলীরা মানুষ পুড়িয়ে খেয়েছে এখানে। যাদের পুড়িয়ে খাওয়া হয়েছে তারাও কি জংলী না সভ্য? সামনে যে আলামত রয়েছে তা দেখে যদিও কিছু বোঝার উপায় নেই তবু কেন যেন মনে হলো, জংলীদেরকেই খাওয়া হয়েছে।

দৃশ্যটা দেখে এমন স্তম্ভিত হয়ে গেলাম যে, অনেকক্ষণ পর্যন্ত বিপদের কথাও মনে রইলো না। বিরস মুখে চোখ ঘুরিয়ে নিলাম ছড়িয়ে থাকা হাড়গুলোর ওপর থেকে। পেটের ভেতর কেমন যেন পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে। বমি করে ফেললাম। তারপর একটু স্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে থাকার কথা আর ভাবতে পারছি না। ছুটতে শুরু করলাম। পাহাড় টপকে উল্টো দিকে নেমে এসে আরেকটু ধাতস্থ হলাম। এখন আর চোখে পড়ছে না দৃশ্যটা। চলতে লাগলাম বাড়ির দিকে।

বেশ কিছুদূর আসার পর বিশ্রাম নেয়ার জন্যে একটু দাঁড়ালাম। ধুকধুক করছে বুকের ভেতর। হতবুদ্ধি ভাবটা এখনো কাটিয়ে উঠতে পারিনি। একটাই

চিন্তা কুরে কুরে খেয়ে ফেলতে চাইছে মগজটাকে–কি করবো? কোনো মতে যদি জংলীরা আমার খোঁজ পায় তো কি হবে? নিজের চোখে যা দেখে এলাম তারপর তো ভরসা পাওয়ার আর কিছু নেই!

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভাবতে লাগলাম বিষয়টা নিয়ে। একটা ব্যাপার ঠিক, নিজের নিরাপত্তার জন্যে যা করেছি এর চেয়ে বেশি আর কিছু করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। আরো কিছুক্ষণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করার পর বুঝতে পারলাম, বোধহয় কোনো কিছু আশা করে এখানে আসে না ওরা। হয়তো এখানে যে সব জিনিস পাওয়া যায় তার কিছুই ওদের কাছে প্রয়োজনীয় বলে মনে হয় না। যদি হতো তাহলে দ্বীপের অন্যান্য অংশেও আসতো জংলীরা। সেক্ষেত্রে গত আঠারো বছরে একবারের জন্যে হলেও ওদের সামনে পড়ে যেতাম। কিন্তু তা হয়নি। অর্থাৎ ওরা দ্বীপের এ একটা জায়গায়ই আসে। এবং কিছুক্ষণ আমোদ-ফুর্তি করে, দু'একটা মানুষ পুড়িয়ে খেয়ে চলে যায়। জায়গাটা নিরিবিলি অথবা ওখানে সহজে তীরে নামা যায়–যে কারণেই হোক এ জায়গা ছাড়া আর কোথাও নৌকা ভেড়ায় না ওরা। পায়ের ছাপটা যেখানে দেখেছিলাম, সেখানে হয়তো ঘটনাক্রমেই উপস্থিত হয়েছিলো ওদের কেউ। সুতরাং অত ভয় না পেলেও চলবে। এ হাড় ছড়ানো জায়গা ছাড়া গত আঠারো বছরে মাত্র একবার এক জায়গায়–পায়ের ছাপটার ওখানে ওদের চিহ্ন নজরে পড়েছে আমার। হয়তো আরো আঠারো বছরে আর একবারও দেখবো না এমন কোনো চিহ্ন। মোট কথা যদি আমি ইচ্ছে করে ওদের দেখা না দিই, ওরা দেখা পাবে না আমার।

সময় বয়ে যেতে লাগলো। জংলীদের উপস্থিতিতে দ্বীপের এ বিশেষ অংশে গিয়ে যদি হাজির না হই, আর যদি একটু সাবধানে থাকি, তাহলে ওরা খুঁজে পাবে না আমাকে, এটা বুঝতে পারার পর অনেক কমে গেছে অস্বস্তি। তবে এখন অনেক সতর্ক আমি। সমুদ্রতীরে গেলে চোখ কান খোলা রাখি। ছোট ক্যানোটা নোঙর করা আছে যেখানে–অর্থাৎ পায়ের ছাপটা দেখেছিলাম যেখানে, নেহায়েৎ ঠেকায় না পড়লে সে দিকে যাই না। গেলেও খুব সাবধানে থাকি। জংলীদের ভোজের জায়গাটায়ও যাই না। গুলি ছোঁড়ার সময়ও সাবধানে থাকি। পাছে জংলীরা শুনে ফেলে এই ভয়ে দ্বীপের ওপাশে গিয়ে কখনো গুলি ছুঁড়ি না। মনে আছে পরবর্তী দু'বছরে বন্দুক ছাড়া একবারও বাইরে বেরোইনি কিন্তু গুলি ছুঁড়েছিলাম মাত্র একবার।

আমার কুকুরটা মরে গেছে বেশ ক'বছর আগে। বাইরে বেরোলে আমার পেছন পেছন আর কেউ চলে না এখন। আমার সঙ্গে প্রায় ষোল বছর ছিলো বেচারা। যথাসাধ্য সেবা করে গেছে আমার। মাঝে মধ্যে দুঃখ হয় ওর জন্যে। কিন্তু একদিন তো আমাকেও মরতে হবে। ওর মৃত্যুতে আমি দুঃখ পেয়েছি। আমার মৃত্যুতে দুঃখ পাবে কে?

পলও নেই। একদিন সকালে উঠে দেখি কোথায় যেন চলে গেছে। এত চমৎকার পোষ মেনে গিয়েছিলো, তারপরও কেন যে চলে গেল জানি না। শেষদিকে আর খাঁচায় আটকাতাম না ওকে। মরে গেছে তা বিশ্বাস হয় না। যতদূর শুনেছি প্রায় একশো বছর বাঁচে তোতা পাখি।

আমার বিড়াল দুটো আছে এখনো। দু'তিনটে ছাগলের বাচ্চা এনে রেখেছি বাড়ির উঠানে। নিজের হাতে খাবার দেই ওদের। পলের শূন্যস্থান পূরণ করার জন্যে আরো দুটো তোতা পাখি ধরে এনেছি। ওরাও কথা বলতে শিখে গেছে। মাঝে মাঝেই 'রবিন ক্রুসো, রবিন ক্রুসো', করে চিৎকার জুড়ে দেয়।

এভাবে চলে যাচ্ছে দিন। আবার সেই শান্তিপূর্ণ নির্বিঘ্ন জীবনে ফিরে এসেছি। একই গৎ বাঁধা জীবন। তবে মন্দ লাগে না। আর কিছু থাক না থাক অপূর্ব একটা মানসিক প্রশান্তি আছে এ জীবনে।

দ্বীপে ওঠার পর বাইশ বছর চলে গেছে। তেইশতম বছর চলছে এখন। ফসল তোলার মৌসুম। এই সময়টায় ভয়ানক খাটতে হয় আমাকে। খুব ভোরে, কোনো কোনো দিন রাত থাকতে চলে যাই মাঠে। সকাল সকাল, সূর্যের তেজ বেড়ে ওঠার আগেই যতটুকু সম্ভব ধান বা যব কেটে নিয়ে আসি। বেলা হলে গরমে কাজ করা অসম্ভব হয়ে ওঠে।

এরকম একদিন রাত থাকতে উঠে ফসল কাটার যন্ত্রপাতি নিয়ে বেরিয়েছি। হঠাৎ দূরে আলোর আভা দেখে চমকে উঠলাম। মাইল দুয়েক দূরে। যেখানে জংলীদের মানুষ-ভোজের আলামত দেখতে পেয়েছিলাম সেদিকে নয়। দ্বীপের যেপাশে আছি আমি, সেপাশেই আগুন জ্বেলেছে কেউ।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম সেই আগুনের আভার দিকে। হঠাৎই সংবিৎ ফিরলো আমার। জংলীরা দ্বীপের এ বিশেষ একটা জায়গায় আসে ভেবে যে স্বস্তি পেয়েছিলাম মুহূর্তেই উবে গেছে তা। শুধু এ একটা জায়গায় নয়, অন্যান্য জায়গায়ও আসে ওরা এতে আর সন্দেহ নেই। কোন্ দিন্ আমার আস্তানার কাছে এসে হাজির হবে কে জানে? যদি আজই আসে?

দৌড়াতে দৌড়াতে ফিরে এলাম আস্তানায়। ঝটপট দেয়ালের গায়ে লাগিয়ে রাখা বন্দুকগুলো গুলি-বারুদ ভরে তৈরি করে ফেললাম। ছোট বন্দুক এবং পিস্তলগুলোতেও গুলি-বারুদ ভরলাম। তারপর অপেক্ষা করতে লাগলাম।

কায়মনে ঈশ্বরকে ডাকছি, যেন এদিকে না আসে জংলীরা। একবার যদি আমার আস্তানার খোঁজ পায় তাহলে কি ঘটবে ভাবতেই সর-সর করে দাঁড়িয়ে গেল গায়ের লোমগুলো।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেছে। এখনো দেখতে পাচ্ছি আগুনের আভা। কি করবো কিছু বুঝতে পারছি না। আর এক সেকেণ্ডও হাত পা গুটিয়ে বসে থাকতে ইচ্ছে করছে না। টানা হেঁচড়া করে একটা মই এনে লাগালাম পাহাড়ের গায়ে। মই বেয়ে উঠে গেলাম একটা সমতল জায়গায়। মইটাকে তুলে সমান জায়গাটার ওপর রেখে আবার উঠতে লাগলাম। ছোট্ট পাহাড়টা। চূড়ায় পৌঁছুতে সময় লাগলো না বেশি।

পেটের ওপর ভর দিয়ে শুয়ে পড়লাম চূড়ার ওপর। দূরবীনটা পকেটেই ছিলো। বের করে চোখে লাগালাম। স্পষ্ট দেখতে পেলাম বড়সড় একটা অগ্নিকুণ্ডের চারপাশে গোল হয়ে বসে আছে কয়েকজন জংলী। গুণে দেখলাম, নয়জন। আগুন পোহানোর জন্যে যে ওরা ওভাবে বসে নেই তা বুঝতে বিন্দুমাত্র

কষ্ট হলো না। যে রকম উষ্ণ এখানকার আবহাওয়া তাতে আগুন পোহানোর প্রশ্নই আসে না।

তাহলে কেন আগুনের চারপাশে ওরকম বসে আছে ওরা? একটু পরেই বুঝতে পারলাম, মানুষের মাংস পোড়ানোর জন্যে তৈরি করা হয়েছে আগুনটা। এক জংলী একটা লাঠি দিয়ে আগুনের ভেতর কিছু একটা নেড়েচেড়ে দিচ্ছে একটু পরপরই।

দুটো ক্যানো রয়েছে ওদের সাথে। জোয়ারের সময় যেন ভেসে না যায় সেজন্যে টেনে পাড়ের ওপর উঠিয়ে এনেছে সেগুলো।

আগুনের ভেতর থেকে কিছু একটা বের করে খাওয়া শুরু করলো লোকগুলো। অসম্ভব দ্রুত খাওয়া শেষ করলো ওরা। তারপর শুরু করলো নাচ। এবার আরো ভালো করে দেখতে পেলাম ওদের। এক চিলতে কাপড়ও নেই কারো গায়ে।

যথার্থ জংলী নাচ নাচলো ওরা। সভ্য সমাজের কোনো নাচের সঙ্গে এর তুলনা চলে না। ইতিমধ্যে ভাটা লাগতে শুরু করেছে। বেশ কিছুক্ষণ নর্তন কুর্দনের পর ক্ষান্ত দিলো ওরা। ঠেলাঠেলি করে ক্যানো দুটো সাগরে ভাসিয়ে এক এক করে চড়ে বসলো সবাই। পোড়া মাংসের অবশিষ্টটুকু তুলে নিলো নৌকায়। তারপর বৈঠা বাইতে শুরু করলো ওরা। এর ভেতর কখন যে আলো হয়ে গেছে চারদিক খেয়ালই করিনি।

জংলীরা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমিও নেমে এলাম পাহাড় থেকে। দুই কাঁধে দুটো বন্দুক ঝুলিয়ে আর কোমরে দুটো পিস্তল গুঁজে রওনা হলাম জংলীদের পরিত্যক্ত জায়গাটার দিকে।

যা দেখলাম ওখানে তাতে রীতিমতো অসুস্থ হয়ে পড়ার দশা হলো আমার। রক্ত, হাড় ; মানুষের কাঁচা মাংস, পোড়া মাংস ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে চারদিকে। গা গুলিয়ে উঠলো আমার। তাড়াতাড়ি চলে এলাম সেখান থেকে। এমন একটা ঘৃণা মেশানো ক্রোধ পেয়ে বসলো আমাকে যে, ঠিক করলাম পরের বার যে-ই হোক আর যত জন-ই হোক, জংলী দেখলেই আক্রমণ করবো। নিজে বাঁচি বা মরি, পরোয়া নেই, এই মানুষ খেকোদের যে ক'জনকে পারা যায় বিদায় করতে হবে দুনিয়া থেকে।

পনেরো

মনের শান্তি পুরোপুরি দূর হয়ে গেছে আমার। কখন আবার জংলীরা এসে হাজির হবে এই ভয়ে অস্থির হয়ে আছি। রাতের ঘুম হারাম হয়ে গেছে। প্রায়ই ভয়ঙ্কর সব স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে যায় মাঝরাতে। তারপর আর ঘুম আসে না। জংলীরা আবার এলে উচিত শিক্ষা দিতে হবে–ভেবে রেখেছি বটে, কিন্তু ভাবনাটা যে কি করে কাজে পরিণত করবো তা বুঝে উঠতে পারছি না।

দ্বীপে ওঠার পর চব্বিশতম বছর চলছে এখন। মে মাস। এই সময় একদিন,

সম্ভবত ষোল তারিখে প্রচণ্ড ঝড় উঠলো। সারাদিন চললো ঝড়। বজ্র আর বিদ্যুতের কামাই নেই। রাতে আরো প্রবল হয়ে উঠলো বাতাসের বেগ। গুহার ভেতর বসে বাইবেল পড়ছি। হঠাৎ মনে হলো, গুলির শব্দ শুনতে পেলাম যেন! সমুদ্রের দিক থেকে এসেছে শব্দটা।

চমকে বাইরে বেরিয়ে এলাম। জংলীদের চিৎকার শুনলেও বোধহয় এতটা আশ্চর্য হতাম না। মই বেয়ে উঠলাম পাহাড়ের ওপর। সমুদ্রের দিকে চোখ। হঠাৎ একটা আলোর ঝলকানি দেখতে পেলাম। কয়েক সেকেণ্ড পরেই ভেসে এলো গুলির শব্দ। দ্বীপের যে পাশে স্রোতের তোড়ে নৌকাসহ ভেসে যাচ্ছিলাম আমি, সেদিক থেকে এসেছে শব্দটা।

নিশ্চয়ই কোনো জাহাজ বিপদে পড়েছে, ভাবলাম আমি। সাহায্যের আশায় গুলি ছুঁড়ে বিপদ সংকেত জানাচ্ছে। কিন্তু আমার সাধ্য নেই ওদের সাহায্য করি। বরং ওরাই হয়তো সাহায্য করতে পারে আমাকে।

তাড়াতাড়ি নেমে এলাম পাহাড় থেকে। শুকনো কিছু কাঠ সংগ্রহ করে নিয়ে উঠলাম আবার। কয়েক দফায় শুকনো কাঠের বড়ো একটা স্তূপ করে ফেললাম পাহাড়ের মাথায়। আগুন জ্বেলে দিলাম। দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগলো আগুন। আগুন ভালো ভাবে জ্বলে ওঠার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আরেকবার গুলির শব্দ হলো। তারপর আরো কয়েকবার। সারা রাত ধরে কাঠ এনে এনে জ্বালিয়ে রাখলাম আগুন। ভোর হওয়ার পর যখন পরিষ্কার হয়ে গেল চার দিক, দ্বীপের ঠিক পুব দিকে, অনেক দূরে কিছু একটা চোখে পড়লো আমার। পাহাড় থেকে নেমে ছুটলাম দক্ষিণ দিকে। দ্বীপের পুব পাশটা একটু দুর্গম, সেজন্যে ও দিকে না গিয়ে দক্ষিণ দিকে গেলাম। আরেকটা পাহাড়ের ওপর চড়তে খালি চোখেই দেখতে পেলাম একটা জাহাজের ধ্বংসাবশেষ। দূরবীন চোখে লাগাতে আরো স্পষ্ট হলো জাহাজের অবয়বটা। নৌকায় করে দ্বীপ চক্কর দিতে বেরিয়ে যে ডুবো পাহাড়গুলো দেখেছিলাম সেগুলোর সাথে ধাক্কা খেয়ে বিধ্বস্ত হয়েছে জাহাজটা। একটা লোকও নেই তাতে।

আমার আগুন দেখার আগে বিধ্বস্ত হয়েছিলো ওটা, না পরে? বোধহয় ডুবো পাহাড়ের সঙ্গে ধাক্কা খাওয়ার পর ওরা গুলি ছুঁড়ে সংকেত দিয়েছিলো। পরে আমার আগুন দেখতে পেয়ে নৌকায় করে দ্বীপে ওঠার চেষ্টা করে। সে সময় হয়তো ডুবো পাহাড়ের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে উল্টে যায় নৌকা। একবার মনে হলো, জাহাজটা নিয়েই ওরা দ্বীপের কাছে এগিয়ে আসার চেষ্টা করেছিলো। ডুবো পাহাড়ের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে যখন বিধ্বস্ত হলো ওটা তখন নৌকা নামিয়ে তীরে আসার চেষ্টা করে। প্রবল স্রোতের কারণে হয়তো পারেনি, ভেসে গেছে গভীর সমুদ্রে।

যাহোক আমার আগুন দেখার পরে বা আগে যখনই হোক না কেন বিধ্বস্ত হয়েছে জাহাজটা। এবং সম্ভবত এখন আর কোনো লোক নেই ওতে। জাহাজটা দেখে মনে মনে এমন একটা আকুলতা বোধ করতে লাগলাম যে কি বলবো। একবার তো চিৎকারই করে উঠলাম, 'ওহ, একটা লোক যদি কোনো মতে বেঁচে চলে আসতে পারতো আমার কাছে! মাত্র একটা লোক! একটা সঙ্গী পেতাম

তাহলে। অন্তত কথা বলার মতো একটা লোক পেতাম।' আমার এই নিঃসঙ্গ জীবনে আর কখনো এত প্রবল হয়ে ওঠেনি আকাঙ্ক্ষাটা।

'ওহ্, মাত্র একজন!' হাজার বার, বারবার আওড়ালাম কথাটা। কিন্তু অত ভাগ্যবান তো নই আমি। কয়েকদিন পর একটা ছেলের মৃতদেহ শুধু ভেসে এলো কূলে। হাঁটু পর্যন্ত একটা প্যান্ট, নাবিকদের ওয়েস্টকোট আর একটা নীল শার্ট ছাড়া আর কিছু নেই তার পরনে। পরিচয় জানার মতো কিছুই পাওয়া গেল না ওর কাছে।

ধীরে ধীরে থিতিয়ে এলো আমার আকুলতা। তবে জাহাজটার কাছে যাওয়ার একটা তীব্র ইচ্ছা পেয়ে বসলো। জানি অসম্ভব, তবু মনে হলো হয়তো কেউ একজন আহত অবস্থায় এখনো বেঁচে আছে জাহাজে। ঠিক করলাম, একটু ঝুঁকি নিয়ে হলেও নৌকা নিয়ে যাবো ওখানে।

বাড়ি ফিরে দ্রুত হাতে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সব সংগ্রহ করে গিয়ে উঠলাম নৌকায়। খোলে পানি জমেছিলো। সেঁচে ফেলে জিনিসপত্রগুলো তুললাম। জায়গামতো সব সাজিয়ে রেখে আবার ফিরে এলাম বাড়িতে। অনেকটা পথ যেতে হবে, কিছু খাবার এবং যন্ত্রপাতি রাখা দরকার সঙ্গে।

অনেকটা খাটুনির পর যাত্রার জন্যে তৈরি করে ফেললাম নৌকাটাকে। তারপর ভেসে পড়লাম ঈশ্বরের নাম নিয়ে।

তীরের কাছে কাছে থেকে দাঁড় টানতে লাগলাম। অবশেষে পৌঁছুলাম দ্বীপের শেষ প্রান্তে। এবার সাগরের দিকে যেতে হবে সেই প্রবল স্রোত এড়িয়ে। স্রোত দুটোর দিকে তাকালাম। তীব্র বেগে বয়ে চলেছে। দুরু দুরু করতে লাগলো বুক। একবার যদি এ স্রোতগুলোর কোনো একটার ভেতর গিয়ে পড়ি তো গভীর সাগরে টেনে নিয়ে যাবে। তারপর একটু জোর বাতাস উঠলেই আমি শেষ।

দমে গেল মনটা। জাহাজে যাওয়ার পরিকল্পনা বাতিল করবো কিনা বুঝতে পারছি না। ছোট্ট একটা খাঁড়িতে নৌকা ঢুকিয়ে তীরে নেমে ভাবতে বসলাম।

ইতিমধ্যে জোয়ার লাগতে শুরু করেছে। তার মানে, যদি যাইও অন্তত এখন না। আবার ভাটা না লাগা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। ততক্ষণ চুপচাপ বসে না থেকে কিছু একটা উপায় বের করা যায় কিনা দেখি। পাশের একটা ছোট পাহাড়ে গিয়ে উঠলাম। দ্বীপের দুপাশের সমুদ্রই পরিষ্কার দেখা যায় এখান থেকে। স্রোত দুটোও দেখতে পাচ্ছি ভালো মতো। তীক্ষ্ণ চোখে কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে বুঝতে পারলাম, ভাটার সময় দ্বীপের দক্ষিণ প্রান্ত দিয়ে গভীর সমুদ্রের দিকে বয়ে যায় স্রোত, আর জোয়ারের সময় যখন পানি বাড়তে থাকে তখন স্রোত সরে যায় উত্তর দিকে। তখন দ্বীপমুখী থাকে স্রোতের গতি। তার মানে, ফিরে আসার সময় উত্তর দিকে চেপে থাকা ছাড়া আর কিছু করতে হবে না।

খুশি হয়ে উঠলাম মনে মনে। যাওয়া যাবে এবং ফিরেও আসা যাবে। আসলে যাওয়াটা কোনো সমস্যা নয়, ফিরে আসাটাই সমস্যা মনে হচ্ছিলো। এখন বুঝতে পেরেছি, জোয়ারের সময় উত্তর দিক চেপে আসলেই হলো। নিরাপদে চলে আসতে পারবো কূলে।

বড় একটা ওয়াচকোট মুড়ি দিয়ে রাতটা কাটিয়ে দিলাম ক্যানোর ওপর।

পরদিন ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রওনা হলাম। স্রোতের টানে দ্রুত বহিঃসমুদ্রের দিকে এগিয়ে চললো নৌকা। হাল ধরে থাকা ছাড়া কিছু করতে হচ্ছে না আমাকে। দু'ঘণ্টারও কম সময়ে পৌঁছে গেলাম বিধ্বস্ত জাহাজটার কাছে।

সামান্য মাথা জাগানো দুটো ডুবো পাহাড়ের মাঝখানে আটকে আছে স্প্যানিশ জাহাজটা। পাথরের সঙ্গে ঘা খেয়ে বিধ্বস্ত হয়েছে সামনের অংশ। পেছনটা ঝড় আর ঢেউয়ের আঘাতে প্রায় ছিন্নভিন্ন। মাস্তুলগুলো ভেঙে গেছে। কিন্তু আশ্চর্য, জাহাজের মাঝের অংশ একেবারে অক্ষত রয়েছে। জাহাজের খুব কাছে পৌঁছে গেছে আমার নৌকা। এমন সময় একটা কুকুর দেখা গেল ডেকের ওপর। আমাকে দেখেই চিৎকার জুড়ে দিলো ওটা। ভয় বা রাগ নয় স্পষ্ট নির্ভরতা শুনতে পেলাম ওর চিৎকারে। চুক চুক করে ডাকতেই সমুদ্রে লাফিয়ে পড়ে সাঁতরে এগিয়ে আসতে লাগলো আমার দিকে। নৌকায় তুলে নিলাম ওকে। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় মরতে বসেছে। সাঁতার কেটে এ পর্যন্ত এলো কি করে, ভেবে অবাক না হয়ে পারলাম না। এক টুকরো রুটি খেতে দিলাম। ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে খেতে শুরু করলো ও। একটু পানি দিলাম। চেটে পুটে নিঃশেষ করলো সবটুকু পানি।

জাহাজে উঠে সপ্রাণ কোনো কিছুর সন্ধান পেলাম না। একমাত্র জীবিত প্রাণী ছিলো কুকুরটা। জিনিসপত্রের ভেতরেও এমন কিছু নেই যা পানিতে নষ্ট হয়নি। বেশ কয়েকটা জাহাজী সিন্দুক দেখলাম। ভেতরে কি আছে না দেখেই দুটো নিয়ে তুললাম নৌকায়।

এ ছাড়াও পেলাম এক পিঁপে ভর্তি পানীয়, কমপক্ষে বিশ গ্যালন হবে; অত্যন্ত দরকারী দুটো জিনিস শাবল আর চিমটা, দুটো পেতলের কেতলি, চকলেট বানানোর একটা তামার পাত্র, আর একটা মাংস পোড়ানোর ঝাঁজরি। বিশ গ্যালনের ভারি পিঁপেটা নৌকায় নামাতে বেশ কষ্ট হলো। একটা কেবিনে পেলাম বড়সড় এক চোঙা ভর্তি বারুদ এবং কিছু গুলি। এই সব জিনিস আর কুকুরটাকে নিয়ে রওনা হলাম উপকূলের দিকে। জোয়ার আসতে শুরু করেছে।

সন্ধ্যা নাগাদ পৌঁছে গেলাম দ্বীপের কাছে। ভীষণ পরিশ্রান্ত লাগছে। কোনো রকমে নোঙরটা ফেলে, সামান্য কিছু মুখে দিয়ে শুয়ে পড়লাম নৌকার ওপরেই।

ভোর হলো। তীরের যতটা সম্ভব কাছে নিয়ে গেলাম নৌকা। তারপর এক এক করে তীরে নিয়ে তুললাম জিনিসগুলো। একটু সাফ সুতরো হয়ে নাস্তা সেরে নিলাম। এবার ভালো করে দেখতে হবে, জাহাজ থেকে আনা জিনিসগুলো। প্রথমে পরীক্ষা করলাম পিঁপেটা। রাম ভর্তি ওটায়। একটু মুখে দিতেই বুঝতে পারলাম, তৃতীয় শ্রেণীর জিনিস। কতটুকু কাজে লাগবে বুঝতে পারছি না। নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো মনে করে রেখে দিলাম।

এবার সিন্দুকগুলো। দরকারী অনেক কিছু রয়েছে প্রথমটায়। চমৎকার এক বাক্স বোতল দেখলাম। কর্ডিয়াল ওয়াটারে ভর্তি বোতলগুলো। বোতলের মতোই চমৎকার ভেতরের জিনিস। প্রতিটা বোতলে তিন পাইন্ট করে আছে।

দুই কৌটো মিষ্টি পেলাম। কৌটোগুলোরও মুখ ভালো করে আটকানো। নোনা পানি ঢুকে ভেতরের জিনিস নষ্ট করতে পারেনি। কর্ডিয়াল ওয়াটারের মতো

মিষ্টিটাও চমৎকার। আরো পেলাম প্রায় আনকোরা কয়েকটা শার্ট। খুব খুশি হলাম ওগুলো পেয়ে–প্রথমবার জাহাজ থেকে আনা শার্টগুলোর একটাও আর অবশিষ্ট নেই। আঠারোটা রেশমি রুমাল এবং গলাবন্ধও পাওয়া গেল।

দ্বিতীয় সিন্দুকটায় পেলাম তুচ্ছ কিছু কাপড়-চোপড়। খুব একটা কাজে লাগবে না ওগুলো। কাপড়গুলোর নিচে পাওয়া গেল বড় বড় তিন থলে ডুকাট। গুণে দেখলাম এগারশো। একটা থলেতে পেলাম ছয়টা সোনার ডাবলুন[১] আর কয়েক টুকরো সোনা। সবগুলোর ওজন হবে প্রায় এক পাউণ্ড।

এসব জিনিসের বেশির ভাগই কোনো কাজে লাগবে না আমার। টাকা এবং সোনাগুলোর কথাই ধরা যাক–নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় জিনিস। তিন-চার জোড়া জুতো এবং মোজার বিনিময়ে সবগুলো দিয়ে দিতে পারি। জুতো জিনিসটার সত্যিই খুব দরকার আমার। ছাগলের চামড়া দিয়ে আমি যে জুতো বানিয়েছি তা পরে আরাম নেই। ওগুলো পায়ে দিয়ে পাহাড়ী পথে চলতে রীতিমতো কষ্ট হয়।

জিনিসপত্র সব নিরাপদে কূলে রেখে আবার চড়লাম নৌকায়। জাহাজে যাওয়ার জন্যে নয়, নৌকাটাকে আগের সেই নিরাপদ খাঁড়ির ভেতর রেখে আসার জন্যে। কেন জানি মনে হচ্ছে দরকারী আর কিছু পাবো না জাহাজটায়। আবার যদি যাই, হয়তো তুচ্ছ টাকা পয়সা নিয়েই ফিরে আসতে হবে। প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে ওসব তুচ্ছ জিনিস আনতে যেতে ইচ্ছে করলো না।

দু'তিনদিন লাগালো জাহাজ থেকে আনা জিনিসগুলো গুহায় নিয়ে আসতে। তারপর আবার শুরু হলো আগের সেই সচকিত জীবন–কখন এসে হানা দেয় জংলীরা!

ষোলো

আবার নতুন করে ডালপালা মেলতে শুরু করেছে চিন্তাটা–কি করে পালানো যায় এই দ্বীপ ছেড়ে। নানা রকম বুদ্ধি এলো মাথায়, কিন্তু নিখুঁত মনে হলো না একটাও। এদিকে আমার মনের অবস্থা এত খারাপ যে একমাত্র মৃত্যুকেই বোধহয় এর চেয়ে খারাপ বলা যেতে পারে। বিধ্বস্ত স্প্যানিশ জাহাজটা কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়ে গেছে আমার অশান্তি। বারবার মনে হয়, 'কুকুরটার মতো একটা মানুষ তো অন্তত বেঁচে যেতে পারতো!'

মার্চের এক রাতে শুয়ে আছি বিছানায়। অঝোর ধারায় বৃষ্টি পড়ছে বাইরে। অন্যান্য দিন ঘুমিয়ে পড়ি এ সময় নাগাদ। আজ বৃষ্টির প্রভাবেই কিনা কে জানে, ঘুম আসছে না। পুরনো চিন্তাগুলোই ঘুরে বেড়াচ্ছে মাথার ভেতর। দ্বীপে ওঠার পর থেকে গত চব্বিশ বছরে যা যা ঘটেছে সব যেন দেখতে পাচ্ছি চোখের সামনে। এই তো সেদিনকার কথা, ঢেউয়ের মাথায় ভাসতে ভাসতে এসে উঠলাম এখানে। তারপর চব্বিশ বছর কেটে গেছে, ভাবতেই অবাক লাগে। বাড়ি থেকে

---

১ ডাবলুন=৬৫ শিলিং বা তিন গিনি

পালিয়ে প্রথম যেদিন জাহাজে চাপি, টগবগে তরুণ আমি তখন। আর আজ প্রৌঢ়, বার্ধক্যের দোরগোড়ায় এসে পৌঁছেছি।

জংলীদের কথা মনে পড়লো। কতগুলো বছর নিশ্চিন্তে নিরাপদে দ্বীপের যেখানে খুশি ঘুরে বেড়িয়েছি। কোনো রকম দুশ্চিন্তা ছিলো না মনে। একাকীত্বের যন্ত্রণাও ভুলে গিয়েছিলাম প্রায়। হঠাৎ কোত্থেকে যে কি হয়ে গেল। জংলীদের ভয় এখন তাড়িয়ে নিয়ে ফিরছে আমাকে।

একবার ওদের হাতে পড়লে কি অবস্থা হবে আমার? ওরা যদি খুন করতে চায় আমাকে তাহলেই বা বাঁচবো কি করে? আজকাল খুব বেশি করে ভাবি কথাগুলো। আমার অজান্তেই কখন জানি আমার ছোট্ট নৌকাটা নিয়ে মূল ভূখণ্ডে যাওয়ার জন্যে তৈরি হয়ে গেছে মনটা। একবার যদি মূল ভূ-খণ্ডের কাছাকাছি যেতে পারি, উপকূল ধরে চলতে থাকবো সোজা। একদিন না একদিন কোনো জনবসতিপূর্ণ এলাকায় পৌঁছে যাবোই। নিদেনপক্ষে কোনো ইউরোপীয় জাহাজের দেখা পাবো। যদি এ ছোট্ট নৌকা সাগরে টিকে থাকতে না পারে তো মরবো। যে মানসিক অশান্তি ভোগ করছি, তার চেয়ে মৃত্যু অনেক ভালো। জীবনের বাকি দিনগুলো আনন্দের সাথেই কাটিয়ে দিতে পারতাম দ্বীপে। কিন্তু জংলীদের চিন্তা এমনভাবে পেয়ে বসেছে যে আর একটা দিনও এখানে থাকতে মন চাইছে না।

এই সব ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম এক সময়। ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখলাম: একদিন ভোরবেলা দুর্গ থেকে বেরিয়েছি আমি। উপকূলের কাছে পৌঁছে দেখি, দুটো ক্যানোয় করে এগারোজন জংলী আসছে তীরের দিকে। বুনো লোকগুলোর সঙ্গে রয়েছে আরো একজন জংলী। এই লোকটাকে মেরে খাবে ওরা। হঠাৎ বন্দী জংলীটা লাফিয়ে উঠে দৌড় লাগালো। স্বপ্নের ভেতর স্পষ্ট দেখতে পেলাম, আমার দেয়ালের বাইরের ঘন জঙ্গলটার দিকে ছুটছে সে। এমনিতে ভয়ে মরছে লোকটা, তার ওপর একা। হাসিমুখে আমি এগিয়ে গেলাম তার দিকে। ভয় পেতে নিষেধ করলাম। আমার পায়ের ওপর পড়ে সাহায্য ভিক্ষা করলো সে। হাত ধরে তুললাম তাকে। মইটা দেখালাম। তারপরই মই বেয়ে পাঁচিল টপকে নিয়ে এলাম ভেতরে। আমার বিশ্বস্ত ভৃত্যে পরিণত হলো কৃতজ্ঞ লোকটা। স্বপ্নের ভেতরই আমার মনে হলো, সঙ্গী পেয়েছি, এবার অবশ্যই মূল ভূ-খণ্ডের দিকে রওনা হবো। দাঁড় টানা, হাল ধরা ছাড়াও অনেক কাজে সাহায্য করতে পারবে লোকটা।

ঘুম ভেঙে গেল। কোথায় কি? অন্ধকার গুহায় শুয়ে আছি একা। এক কোণে চর্বির প্রদীপটা জ্বলছে মিট মিট করে। হতাশ হওয়ার কথা, কিন্তু আশ্চর্য, একটুও হতাশ লাগলো না আমার। স্বপ্নে দেখা ঘটনাটা ঘুরে বেড়াচ্ছে মাথার ভেতর। সত্যি তাই, এখান থেকে পালাতে হলে একজন জংলীকে ধরে বশ মানাতে হবে। যাদের খাওয়ার জন্যে ধরে আনবে ওরা তাদের একজন হলেই ভালো। কৃতজ্ঞতায় সহজে বশ মানবে তাহলে। তারপর রওনা দিতে হবে মূল ভূ-খণ্ডের দিকে।

আজকাল আবার বাইরে বেরোতে শুরু করেছি। বাইরে কোনো কাজ না থাকলেও

বেরোই। ঘুরে বেড়াই উপকূলের কাছ দিয়ে। অবশ্যই খুব সাবধানে থাকি। কাঁধে থাকে দুটো গুলি ভরা বন্দুক, কোমরে দুটো পিস্তল। একবার সামনাসামনি পেলে হয়–যদি মরিও অন্তত চারটেকে নিয়ে মরবো। রোজ ভাবি, আজ হয়তো দেখা হয়ে যাবে জংলীদের সাথে। কিন্তু বেশ কয়েক মাস কেটে গেল, কিন্তু জংলীদের ছায়াটাও দেখতে পেলাম না।

স্বপ্ন দেখার প্রায় দেড় বছর পর একদিন সকালে বেরিয়েছি। সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। এবার দ্বীপের এপাশে অর্থাৎ, যে পাশে আমার আস্তানা সে-পাশে আবির্ভাব হয়েছে জংলীদের। ছোট্ট নদীটার ওপাশের সৈকতে পাঁচটা ক্যানো। সবগুলো টেনে তোলা হয়েছে ডাঙায়। একটা নৌকায়ও মানুষ নেই। আশপাশেও দেখতে পেলাম না কাউকে। তার মানে, আপাতত চোখের আড়ালে থাকলেও দ্বীপে নেমেছে জংলীরা, এবং আমার আস্তানার খুব কাছেই।

ক্যানোর সংখ্যা দেখে বুঝতে পারছি, অনেক ওরা। একেকটা নৌকায় পাঁচজন করে হলেও পঁচিশজন। এতগুলো লোকের সাথে একা লড়াই করা মুশকিল। যদিও বন্দুক রয়েছে আমার, কিন্তু একবার গুলি ছোঁড়ার পর আবার গুলি বারুদ ভরতে যে সময় লাগবে ততক্ষণে লাশ বানিয়ে ছাড়বে আমাকে। সামনাসামনি হওয়া চলবে না কিছুতেই। আপাতত দুর্গে থাকবো, ঠিক করলাম। দুর্গ আক্রান্ত হলেই কেবল গুলি চালাবো আমি।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল। কিছু দেখতে পাচ্ছি না, শুনতে পাচ্ছি না–অস্থির লাগছে। কি করা যায়? এ রকম চুপচাপ বসে থাকলে আমার সেই জংলী ধরার পরিকল্পনা মাঠে মারা যাবে। জংলীরা হয়তো নরভোজ সেরে চলে যাবে নিরাপদে।

শেষে আর থাকতে না পেরে পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে উঠলাম। ওরা যেন দেখতে না পায় সেজন্যে সাবধানে মাথা নিচু করে বসলাম। দূরবীন চোখে লাগাতেই এক লাফে সামনে চলে এলো দৃশ্যটা: কমপক্ষে ত্রিশজন জংলী, বড়সড় একটা অগ্নিকুণ্ড ঘিরে বসে আছে । রান্নার জন্যে মাংস কুটছে কয়েকজন। কয়েকজন নাচছে ধেই ধেই করে।

দূরবীনটা একটু ঘুরিয়ে তাকালাম নৌকাগুলোর দিকে। এখন আর নির্জন নয় জায়গাটা। কয়েকজন জংলী টেনে হিঁচড়ে নিয়ে আসছে আরো দুটো জংলীকে। কয়েক মিনিট লাগলো বন্দী দুটোকে আগুনের কাছে টেনে আনতে। যারা মাংস কুটছিলো তাদের একজন উঠে মোটা একটা কাঠ দিয়ে বাড়ি মারলো একজনের মাথায়। সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গেল লোকটা। আরো দু'তিনজন এসে কাজে লেগে গেল। টুকরো টুকরো করতে লাগলো অচেতন লোকটাকে। অন্য বন্দীটা দাঁড়িয়ে আছে একপাশে। তার কাছাকাছি কেউ নেই। সবাই ব্যস্ত মাংস কাটার কাজে। নাচছে যারা তারাও তাকাচ্ছে না ওর দিকে। হঠাৎ করেই যেন পরিস্থিতিটা বুঝতে পারলো হতভাগ্য লোকটা। একটু একটু করে সরতে শুরু করলো অন্য জংলীগুলোর কাছ থেকে। কিছুটা সরে এসেই লাগালো ছুট। অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে দৌড়ে আসতে লাগলো আমার দিকে।

স্বীকার করছি, লোকটাকে ছুটে এদিকে আসতে দেখে আমি আতঙ্কিত না হয়ে পারলাম না। কারণ ততক্ষণে অন্য জংলীগুলোও ছুটতে শুরু করেছে তার

পেছন পেছন। আমার স্বপ্নের সেই অংশটা এবার সত্যি হতে চলেছে। লোকটা দৌড়ে এসে নির্ঘাত আমার জঙ্গলটাতেই আশ্রয় নেবে!

নিজের জায়গা ছেড়ে একচুল নড়লাম না আমি। দূরবীন চোখে লাগিয়ে লক্ষ করে চলেছি ঘটনাটা। একটু পরে দেখলাম একজন একজন করে কমছে তেড়ে আসা লোকের সংখ্যা। আশার কথা। আরো কিছুটা সময় পার হলো। শেষ পর্যন্ত মাত্র তিনজন তাড়া করে আসতে লাগলো লোকটাকে। কিন্তু কিছুতেই ওর নাগাল পাচ্ছে না ওরা। যদি আর কিছুক্ষণ এভাবে ছুটতে পারে বেচারা তা হলে হয়তো পালাতে পারবে ওদের হাত থেকে।

আমার দুর্গ আর ওদের মাঝখানে রয়েছে ছোট্ট নদীটা। প্রথমবার জাহাজ থেকে মালপত্র নিয়ে এই নদীর মুখেই নেমেছিলাম আমি। হতভাগাটা যদি সাঁতরে এপারে চলে আসতে না পারে তো আবার মানুষ খেকোগুলোর হাতে ধরা পড়তে হবে ওকে।

রুদ্ধশ্বাসে তাকিয়ে আছি, নদীর পাড়ে এসে কি করে লোকটা দেখার জন্যে। একই গতিতে ছুটে আসছে সে। ক্রমশ দূরত্ব বাড়ছে ওর আর পেছনের লোকগুলোর মাঝে। লোকটা এসে পড়েছে নদীর পাড়ে। হঠাৎ মনে হলো আমার, সাঁতার জানে তো? উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম মনে মনে। না জানলে নির্ঘাত মারা পড়বে।

নদীর তীরে এসে এক মুহূর্তও দাঁড়ালো না লোকটা। যে গতিতে ছুটছিলো সেই গতিতেই ঝাঁপিয়ে পড়লো পানিতে। ভালোই সাঁতার জানে সে। তার ওপর এখন আবার জান বাঁচানোর দায়। ভরা জোয়ার নদীতে, তবু মাত্র পঁচিশ ত্রিশবার হাত পা ছুঁড়ে এপাশে এসে পৌঁছুলো। পাড়ে উঠে আবার ছুটতে শুরু করলো।

তাড়া করে আসা লোক তিনটে এসে পৌঁছুলো নদীর পাড়ে। দু'জন ঝাঁপিয়ে পড়লো পানিতে। যথাসম্ভব দ্রুত সাঁতরাতে চেষ্টা করলো ওরাও। তবু অনেকক্ষণ লাগলো ওদের এপারে এসে উঠতে। তৃতীয় লোকটা বোধহয় সাঁতার জানে না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ দেখলো সঙ্গী দু'জনের সাঁতরানো। ফিরে গেল তারপর।

এবার মঞ্চে অবতীর্ণ হতে হবে আমাকে। একজন কাজের লোক পাওয়ার এটাই যথার্থ সময়। কাজের লোক বা সঙ্গী বা সহকারী যা-ই বলি না কেন, হতভাগ্য লোকটাকে বাঁচাতে হবে। আমার নিজের স্বার্থেই করতে হবে কাজটা।

দ্রুত নেমে এলাম মই বেয়ে। গুহায় ঢুকে দুটো বন্দুক তুলে নিয়ে আবার উঠলাম পাহাড় চূড়ায়। পাহাড়টার যে পাশে আমার গুহা তার উল্টো দিকটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে সমুদ্রের দিকে। জংলীগুলোর কাছে তাড়াতাড়ি পৌঁছুনোর জন্যে কোনাকুনি নামতে শুরু করলাম ঢাল বেয়ে। কিছুক্ষণের ভেতর পৌঁছে গেলাম তাড়া খাওয়া আর তাড়া করে আসা লোকগুলোর মাঝখানে। মানুষখেকোগুলো এখনো অনেকটা পেছনে। চিৎকার করে ডাকলাম প্রাণভয়ে ছুটন্ত জংলীটাকে। দৌড়াতে দৌড়াতেই ঝট করে পেছন ফিরলো সে। আশ্চর্য হয়ে তাকালো আমার দিকে। প্রথমবার জংলীদের দেখে আমি যতটা আশ্চর্য হয়েছিলাম তার চেয়ে কম নয় মোটেই। নিজের অজান্তেই গতি কমিয়ে দিলো লোকটা। ইশারায় ভয় পেতে নিষেধ করলাম। ডাকলাম আমার দিকে।

তাড়া করে আসা লোক দুটোও অবাক হয়ে গেছে। গতি একটু কমেছে

ওদেরও। তবে দৌড় থামায়নি। ধীরে ধীরে এগোলাম অনুসরণকারীদের দিকে। বেশ কাছে এসে পড়েছে লোক দু'জন। হঠাৎ ছুটতে শুরু করলাম আমি। পৌঁছে গেছি মানুষখেকো দুটোর কাছে। গুলি করার জন্যে বন্দুক তুলেও নামিয়ে নিলাম। গুলির শব্দ শুনে যদি এদিকে এসে পড়ে অন্য জংলীরা বিপদ হবে তাহলে। বাঁট দিয়ে আঘাত করে শুইয়ে ফেললাম সামনের লোকটাকে।

সঙ্গীকে ওভাবে পড়ে যেতে দেখে দাঁড়িয়ে পড়লো অন্য লোকটা। ভয় পেয়েছে। এগিয়ে গেল সঙ্গীর দিকে। তাড়া খাওয়া লোকটার দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকালাম আমি। আগের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে এখনো। হাঁ করে দেখছে আমার কাজ কারবার। আবার ফিরলাম মানুষখোকো দুটোর দিকে। ভীষণ চালাক তো! ভয় পাওয়ার ভান করছিলো, আসলে একটুও ভয় পায়নি অক্ষত লোকটা। সঙ্গীর অজ্ঞান দেহটার কাছে গিয়ে ধনুকে তীর পরাচ্ছে। আর দেরি করা যায় না। লোকটাকে তীর ছোঁড়ার সুযোগ দিলে আমি শেষ। আর আমি গুলি না ছুঁড়ে আঘাত করার জন্যে এগিয়ে গেলে ও তীর ছোঁড়ার সুযোগ পাবে। ইচ্ছে না থাকলেও গুলি করতে হলো। হাত পা ছড়িয়ে পড়ে গেল লোকটা।

এতক্ষণে তাড়া খাওয়া লোকটার দিকে মনোযোগ দেয়ার অবসর পেলাম আমি। আগের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে এখনো। যমদূতের মতো তেড়ে আসা লোক দুটোকে পড়ে যেতে দেখে আর গুলির শব্দ শুনে পাথর হয়ে গেছে যেন। আবার চিৎকার করলাম ওর দিকে তাকিয়ে। ইশারা করলাম এগিয়ে আসার জন্যে। চিৎকারটা বুঝতে না পারলেও ইশারাটা বুঝতে পারলো। ভয়ে ভয়ে এগিয়ে এলো কয়েক পা। তারপর দাঁড়িয়ে পড়লো। একটু ইতস্তত করে আরো কয়েক পা এগোলো। তারপর আবার দাঁড়িয়ে পড়লো।

আবার আমি কাছে আসার ইশারা করলাম। ইঙ্গিতে যথাসম্ভব সাহস দেয়ার চেষ্টা করলাম ওকে। এখনো দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছে জংলীটা। ঠিক করে উঠতে পারছে না, আসবে কি আসবে না। কয়েক পা এসেই হাঁটু গেড়ে বসছে। কিছুক্ষণ ওভাবে বসে থেকে আবার এগিয়ে আসছে।

একটু একটু করে আমার একেবারে সামনে এসে দাঁড়ালো লোকটা। আবার হাঁটু গেড়ে বসলো। অভয় দেয়ার জন্যে একটু হাসলাম আমি। সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে আমার একটা পা তুলে নিলো তার মাথার ওপর। বোধহয় বোঝাতে চাইছে, সারা জীবন আমার দাস হয়ে থাকবে।

ওর মাথা থেকে পা সরিয়ে নিলাম। একটু ঝুঁকে দু'হাত দিয়ে তুলে দাঁড় করালাম লোকটাকে। তারপর আবার কিছুক্ষণ ইশারা-ইঙ্গিত আর অঙ্গভঙ্গির সাহায্যে সাহস দেয়ার চেষ্টা করলাম। একটু পরে মনে হলো, কিছুটা যেন আশ্বস্ত হয়েছে সে।

আমার কাজ এখনো শেষ হয়নি। যে জংলীটাকে আঘাত করে ফেলে দিয়েছিলাম, সে মারা যায়নি। অজ্ঞান হয়ে গেছিলো কেবল। ইতিমধ্যে তার জ্ঞান ফিরে আসতে শুরু করেছে। হাত-পাগুলো নড়ছে একটু একটু। ইশারা করলাম লোকটার দিকে। দেখে তড়বড়িয়ে কি যেন বলে উঠলো আমার জংলী। এক বর্ণও বুঝলাম না তার কথা। তবু মনে হলো, কি মধুর শুনতে কথাগুলো। পঁচিশ বছর

পর এই প্রথম একজন মানুষের কথা শুনলাম। বুঝতে পারছি না কিছু, তবু মানুষের কথা তো!

কিন্তু এসব নিয়ে গদগদ হওয়ার মতো সময় নেই হাতে। অজ্ঞান মানুষখেকোটা জ্ঞান ফিরে পেয়েছে। নড়েচড়ে উঠে বসছে। লোকটাকে উঠে বসতে দেখে ভয়ের ছাপ পড়লো আমার জংলীর মুখে। তাড়াতাড়ি আমার অন্য বন্দুকটা তুলে তাক করলাম মানুষখেকোটার দিকে। দেখে অদ্ভুত একটা ভঙ্গি করলো আমার জংলী। বোঝাতে চাইলো, আমার তলোয়ারটা চায় সে। কোমর থেকে তলোয়ারটা দিলাম ওকে। সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে এগিয়ে গেল সে শত্রুর দিকে। এক কোপে ধড় থেকে নামিয়ে দিলো তার মাথা।

কাজ শেষ করে হাসতে হাসতে এগিয়ে এলো আমার জংলী। ফিরিয়ে দিলো তলোয়ারটা। তারপর মানুষখেকোটার কাটা মুণ্ডু এনে রাখলো আমার পায়ের কাছে।

ওর হাবভাব দেখে বুঝলাম, অন্য লোকটা কিভাবে মরা গেল তা বুঝতে না পেরে ও বেশ বিভ্রান্ত। লোকটার দিকে ইশারা করে অঙ্গভঙ্গি দিয়ে বোঝাতে চাইলো, সে যেতে চায় ওর কাছে। হাত নেড়ে অনুমতি দিলাম আমি। লোকটার কাছে গিয়ে কিছুক্ষণ অবাক চোখে তাকিয়ে রইলো ও। হাঁটু গেড়ে বসে একবার এপাশে একবার ওপাশে উল্টে দেখলো। গুলির ক্ষতটা দেখলো। তারপর লোকটার ধনুক এবং তীরগুলো নিয়ে ফিরে এলো আমার কাছে।

এবার ফিরতে হয়। ইশারায় পেছন পেছন আসতে বলে ঘুরে দাঁড়াতে গেলাম আমি। কিন্তু বাধা দিলো আমার জংলী। হাত পা নেড়ে বোঝালো, মৃতদেহ দুটো কবর দিয়ে যেতে চায়। তাহলে অন্য জংলীগুলো এসে পড়লে দেখতে পাবে না কিছু। প্রস্তাবটা মনঃপুত হলো আমার। ইশারায় অনুমতি দিলাম।

কাজে লেগে গেল আমার জংলী। খালি হাতে এত দ্রুত বালিতে গর্ত করে ফেললো যে অবাক না হয়ে পারলাম না। টানা হ্যাঁচড়া করে নিয়ে এলো একটা মৃতদেহ। গর্তে ফেলে মাটি চাপা দিলো। তারপর আরেকটা গর্ত। দ্বিতীয় মৃতদেহটাও টেনে এনে বালি চাপা দিলো। দুটো দেহ কবর দিতে খুব বেশি হলে পনের মিনিট লাগলো ওর।

আস্তানায় ফিরে রুটি আর অনেকখানি কিশমিশ খেতে দিলাম ওকে। তারপর পানি। এমন গোগ্রাসে খাবার এবং পানিটুকু খেলো যে বুঝতে অসুবিধা হলো না দীর্ঘ সময় ওকে না খাইয়ে রাখা হয়েছে। তা ছাড়া ভীষণ জোরে অনেকটা পথ দৌড়াতে হয়েছে বেচারাকে। তার ওপর দুটো মৃতদেহ কবর দিয়েছে। খাওয়া দাওয়ার পর একটু তাজা মনে হলো ওকে। গুহার এক কোনায় এক বোঝা খড়ের ওপর কম্বল পেতে একটা বিছানা করা আছে। মাঝে মাঝে ওখানে শুই আমি। বিছানাটা দেখিয়ে শুয়ে পড়তে বললাম লোকটাকে। শুয়ে পড়লো ও। ঘুমিয়ে গেল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই।

লম্বা, সুগঠিত দেহ লোকটার। পঁচিশ-ছাব্বিশ হবে বয়েস। চমৎকার চেহারা। হিংস্রতা নেই, কিন্তু যা আছে তাতে একটা জিনিসই প্রকাশ পায়, পৌরুষ। যখন হাসে তখন অপূর্ব একটা কোমলতা ফুটে ওঠে মুখে। চুলগুলো কালো; লম্বা।

কোঁকড়া নয় মোটেই। কপালটা উঁচু আর চওড়া। অসম্ভব প্রাণবন্ত, চঞ্চল এক জোড়া চোখ। গায়ের রং কালো নয়, পিঙ্গল। তবে স্থানীয় আমেরিকান অর্থাৎ ব্রাজিলিয়ান বা ভার্জিনিয়ানদের মতো উৎকট হলুদ ঘেঁষা পিঙ্গল নয়। মুখটা গোল, একটু মাংসল। নাকটা ছোট, নিগ্রোদের মতো থ্যাবড়া নয়। মুখটাও সুন্দর; সরু ঠোঁট, ছোট ছোট ঝকঝকে দাঁত। এক কথায় বলতে গেলে, চমৎকার সুপুরুষ একটা লোক।

আধ ঘণ্টা মতো ঘুমালো ও। তারপর বেরিয়ে এলো গুহা থেকে। আমি তখন ছাগলের দুধ দোয়াচ্ছি। আমাকে দেখতে পেয়ে কাছে এসে দাঁড়ালো। মাটিতে শুয়ে পড়ে আকার ইঙ্গিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করলো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে। শেষে আবার আমার পায়ের কাছে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে একটা পা তুলে নিলো ওর মাথায়। তারপর ইশারায় জানতে চাইলো, কিভাবে আমাকে সাহায্য করবে।

আমিও আকার ইঙ্গিতে ওকে বোঝালাম, কোনো ভয় নেই, ওর ওপর আমি খুশি। হাতের কাজটা শেষ করে ওকে নিয়ে লাগলাম। প্রথম কাজ, ওকে কথা শেখানো। মনে মনে ওর একটা নাম ঠিক করে ফেলেছি। ভাবলাম, প্রথমে সেটাই শেখাবো। আজ হলো শুক্রবার। এই দিনে ওর প্রাণ বাঁচিয়েছি আমি। তাই ঠিক করেছি ওর নাম দেবো 'ফ্রাইডে'। বার বার শব্দটা উচ্চারণ করে এবং তর্জনী দিয়ে ইশারা করে শেষ পর্যন্ত ওকে শেখাতে পারলাম নামটা। একইভাবে ওকে শেখালাম 'মাস্টার' কথাটা। এবং বোঝালাম এটা আমার নাম। এইভাবে ওকে হাঁ এবং না বলতেও শেখালাম। বেশ খানিকটা কসরৎ করার পর কথাগুলোর অর্থও বোঝাতে পারলাম।

এরপর একটা মাটির পাত্রে দুধ নিয়ে চুমুক দিয়ে খেলাম কিছুটা। রূকিটার ভেতরে রুটি ভেজালাম খাওয়ার জন্যে। তারপর ওকেও একপাত্র দুধ আর একটা রুটি দিয়ে আমার মতো করে খেতে ইশারা করলাম। তাড়াতাড়িই ব্যাপারটা ধরে ফেললো ও। ইঙ্গিতে জানালো খুব পছন্দ হয়েছে খাবারটা।

ভোরে ফ্রাইডেকে নিয়ে বেরোলাম। হাঁটতে হাঁটতে বোঝালাম, কাপড় পরা শিখতে হবে ওকে। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে ও বেশ খুশি হলো বলে মনে হলো।

কাল যেখানে ফ্রাইডে মানুষখেকো দুটোকে কবর দিয়েছিলো সেখানে পৌঁছেই কবর দুটোর কাছে ছুটে গেল ও। ইশারায় জানালো, মৃতদেহগুলো কবর থেকে তুলে খেতে চায়। ব্যাপারটা ভাবতেই আমার বমি এসে যাচ্ছে এমন একটা ভঙ্গি করলাম। চোখে ফুটিয়ে তুললাম ক্রুদ্ধ দৃষ্টি। হাত নেড়ে সেখান থেকে চলে আসতে বললাম ওকে। বাধ্য ছেলের মতো সঙ্গে সঙ্গে চলে এলো ও। তবে মুখে ফুটে রইলো হতাশ একটা ভঙ্গি।

ফ্রাইডেকে নিয়ে এবার পাহাড়টায় গিয়ে চড়লাম। অন্য মানুষখেকোগুলো এখনো আছে না চলে গেছে দেখা দরকার। চোখে দূরবীন লাগিয়ে দেখলাম, একদম ফাঁকা জায়গাটা। কাল ওদের যেখানে দেখেছিলাম কিছু নেই সেখানে। তার মানে দু'জন সঙ্গীকে পেছনে ফেলে চলে গেছে ওরা। হতভাগা দুটোর কি হলো না হলো জানারও প্রয়োজন বোধ করেনি।

কিন্তু এটুকু দেখেই সন্তুষ্ট হতে পারলাম না আমি। পাহাড় থেকে নেমে রওনা

হলাম জায়গাটার দিকে। সঙ্গে ফ্রাইডে থাকাতে সাহস অনেক বেড়ে গেছে আমার। তলোয়ারটা দিলাম ওকে। ধনুক আর তীরগুলোও রয়েছে ওর পিঠে। আমার ঘাড় থেকে ওজন কমানোর জন্যে একটা বন্দুক বইতে দিলাম ওকে।

মানুষখেকোদের সেই ভোজের জায়গায় পৌছে আতঙ্কে হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে যাওয়ার দশা হলো আমার। মানুষের হাড় আর পোড়া মাংস ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে জায়গাটায়। মাটি লাল হয়ে আছে রক্তে। এক জায়গায় পৌছে বড় একটুকরো মাংস আধখাওয়া অবস্থায় পড়ে রয়েছে। তিনটে খুলি দেখতে পেলাম। পাঁচটা প্রায় অক্ষত হাত, আর তিন চারটে পায়ের হাড় পড়ে আছে অন্য এক জায়গায়। ফ্রাইডে নির্বিকার। ইশারায় জানালো, মানুষখেকোগুলো চারজনকে এনেছিলো খাওয়ার জন্যে। তিনজনকে খেয়েছে আর চতুর্থ-জন হচ্ছে ও নিজে।

ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা হাড়, মাংস, খুলি–সব এক জায়গায় জড়ো করতে বললাম ফ্রাইডেকে। আশপাশ থেকে শুকনো ডাল-পালা, কাঠ এনে স্তূপ করতে বললাম তার ওপর। দেখলাম ও এখনও মাংস খাওয়ার কথা ভুলতে পারেনি। একটুকরো মাংস খাওয়ার অনুমতির আশায় কাতর চোখে তাকালো আমার দিকে। কিন্তু, ব্যাপারটা ভাবতেই কেমন আতঙ্কিত বোধ করছি আমি তা যখন বুঝিয়ে দিলাম তখন ক্ষান্ত হলো। একটা টুকরোও মুখে তুললে ওকে খুন করবো আমি, তা-ও বোঝাতে কসুর করলাম না।

দুর্গে ফিরে আবার ফ্রাইডেকে নিয়ে লাগলাম। চোখের সামনে সম্পূর্ণ উলঙ্গ একটা লোক–দেখতে কেমন অস্বস্তি লাগছে। প্রথমেই লিনেনের একটা অন্তর্বাস পরালাম ওকে। গত বছর বিধ্বস্ত স্প্যানিশ জাহাজ থেকে আনা একটা সিন্দুকে পেয়েছিলাম ওটা। ছাগলের চামড়া দিয়ে একটা ফতুয়া বানিয়ে দিলাম, খরগোশের চামড়া দিয়ে একটা টুপিও। পোশাকগুলো পরে বেশ খুশি মনে হলো ফ্রাইডেকে। প্রায় মাস্টারের মতো লাগছে দেখতে, এটা বুঝতে পেরে আরো মজা পেলো যেন। সন্দেহ নেই পোশাকগুলো পরে প্রথম প্রথম বেশ অস্বস্তিতে ভুগলো ফ্রাইডে। তবে অভ্যস্ত হয়ে গেল কয়েকদিনের মধ্যেই।

আমার দুর্গের দুই দেয়ালের মাঝখানের ফাঁকা জায়গায় ওর জন্যে একটা তাঁবু তৈরি করলাম এবার। এক গুহায় ওর সাথে রাত কাটানোর সাহস হচ্ছে না আর। এক রাত কাটিয়েছি, তা-ই যথেষ্ট। এখনো মানুষের মাংস খাওয়ার যে রকম ইচ্ছে দেখছি, তাতে ঠিক নিশ্চিত হতে পারছি না। যে কোনো সময় সেই মানুষখেকো চেহারাটা বেরিয়ে আসতে পারে ওর ভেতর থেকে।

ভেতরের দেয়ালটাতে অনেক আগেই একটা দরজা করে নিয়েছিলাম। কোনো কপাট ছিলো না দরজাটায়। ফ্রাইডের জন্যে তাঁবু খাটানো শেষ করে কপাট বানাতে বসলাম। তক্তা তৈরিই ছিলো। মোটামুটি একটা কপাট বানিয়ে ঝুলিয়ে দিলাম পেরেক মেরে। শুধু ভেতর দিকে খোলে পাল্লাটা। একটা খিল লাগিয়ে নিলাম ওতে। বাইরের দেয়ালের কাছ থেকে মইটাও নিয়ে এলাম ভেতরে। এখন মোটামুটি নিশ্চিন্ত। পাঁচিল না টপকে কোনো ভাবেই আর ভেতরে ঢুকতে পারবে না ও। যদিও পাঁচিল টপকানোটা খুব কষ্টকর তবু ফ্রাইডে যদি সে চেষ্টা করে তবে যে শব্দ হবে তাতে জেগে উঠবো আমি।

এ ধরনের সাবধানতা অবলম্বনের কোনো দরকার ছিলো না অবশ্য। কারণ, সত্যি কথা বলতে কি, যে রকম বিশ্বস্ততা, আর কর্তব্যনিষ্ঠা ফ্রাইডে দেখিয়েছে, তা কোনো সভ্য মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় বলেই আমার বিশ্বাস। নিজেকে সম্পূর্ণ বিকিয়ে দিয়েছিলো যেন আমার কাছে। প্রাণটা পর্যন্ত আমার হাতে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ছিলো। এবং নিঃসন্দেহে বলতে পারি, সে রকম কোনো সুযোগ এলে, নিজের প্রাণ দিয়ে হলেও আমার জীবন বাঁচাতে পিছ পা হতো না ও।

সতেরো

ফ্রাইডেকে পেয়ে ভীষণ খুশি আমি। শুধু যে একজন সঙ্গী পেয়েছি তা নয়, এতদিনে একটা মনের মতো কাজও পাওয়া গেছে। সভ্য করে তুলতে হবে ওকে। আমি যা যা জানি এবং গত পঁচিশ বছরে যা যা শিখেছি সবই শেখাবো ওকে। তা না হলে ওকে দিয়ে খুব একটা সাহায্য হবে না আমার। জীবন ধারা, জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি এ সব ব্যাপারে ওর আর আমার মধ্যে যে পার্থক্য তা যদি কমিয়ে না আনা যায় তাহলে পরে মুশকিলে পড়তে হবে আমাকে।

প্রথমেই যে ব্যাপারটার দিকে বিশেষ মনোযোগ দিলাম, তা হচ্ছে, ওকে কথা বলতে শেখানো। আমি বা ও যদি পরস্পরের মনের ভাব বুঝতে না পারি তাহলে কিভাবে কমবে ওর আর আমার মাঝের দূরত্ব? আকারে ইঙ্গিতে কিছু ভাব বিনিময় হয় বটে, কিন্তু তা এমন অস্পষ্ট আর অসম্পূর্ণ যে তাতে মোটেই সন্তুষ্ট নই আমি। সম্ভবত ও-ও নয়। খেয়াল করে দেখেছি, আমার কোনো কথা বা অনুভূতি পুরোপুরি বুঝতে পারলে বা ওর অনুভূতি আমাকে বোঝাতে পারলে দারুণ খুশি হয় ফ্রাইডে। আর না বুঝতে পারলে কেমন যেন বোকা বোকা ভাব করে দাঁড়িয়ে থাকে।

কয়েকদিনের মধ্যে টের পেলাম যথেষ্ট বুদ্ধিমান ও। কি করলে আমি খুশি হবো তা বুঝে নিয়েছে ইতিমধ্যে। সব সময় চেষ্টা করে আমাকে খুশি করতে। আমার মুখে হাসি দেখলে বর্তে যায় যেন। এমন হাসি-খুশি, প্রাণবন্ত মানুষ আমি খুব কমই দেখেছি।

ফ্রাইডেকে পাওয়ার পর আমার মনের সেই পুরনো প্রশান্তি ফিরে এলো আবার। আবার মনে হতে লাগলো, জীবনের বাকি দিনগুলো যদি কাটাতে হয় এখানে, আপত্তি নেই কোনো।

দু'তিন দিন পর নতুন একটা বুদ্ধি এলো মাথায়। ফ্রাইডেকে সভ্য করে তুলতে হলে ওর অভ্যাস পাল্টাতে হবে। নরমাংসের প্রতি ওর আকর্ষণটা যদি দূর করতে না পারি তাহলে কোনো দিনই সভ্য হবে না ও। অন্য মাংসের স্বাদ পাওয়াতে হবে।

পরদিন সকালেই বেরোলাম ওকে নিয়ে। ইচ্ছা, আমার নিজস্ব পাল থেকে মেরে আনবো একটা ছাগল। কিন্তু সে পর্যন্ত যেতে হলো না। কিছুদূর গিয়েই দেখতে পেলাম, একটা গাছের ছায়ায় বড় একটা মাদী ছাগল শুয়ে আছে। বেশ

দূরে। দুটো বাচ্চা বসে আছে পাশে। এখনো টের পায়নি আমাদের উপস্থিতি। দাঁড়িয়ে পড়লাম আমি। ফ্রাইডেকেও থামালাম। ফিসফিস করে বললাম, 'চুপ করে দাঁড়াও,' ইশারায়ও বারণ করলাম নড়াচড়া করতে। তারপর বন্দুক ঠিক মতো নিশানা করে ঘোড়া টেনে দিলাম। মারা গেল একটা বাচ্চা।

সেদিন একটা মানুষখেকো মরেছিলো আমার বন্দুকের গুলিতে। ব্যাপারটা দেখেছিলো ফ্রাইডে, কিন্তু বুঝতে পারেনি, দূরে দাঁড়িয়ে থেকেও কি করে করলাম কাজটা। এখন দেখলো। বন্দুকের নলে আগুন আর গুলির শব্দ শুনে এমন ভড়কে গেল বেচারা– কাঁপতে লাগলো থর থর করে। ওর কাঁপুনি দেখে ভয় পেয়ে গেলাম আমিও। কাঁপতে কাঁপতে পড়ে যাবে না তো? কিন্তু না, পড়ে গেল না ও। চামড়ার ফতুয়াটা একটু উঁচু করে নিশ্চিন্ত হলো, সত্যিই ও আহত হয়নি। তার পর এগিয়ে এলো আমার কাছে। হাঁটু গেড়ে জড়িয়ে ধরলো আমার দুই পা। সেই সাথে অবিশ্রাম কথা বলে যেতে লাগলো কাঁদ কাঁদ স্বরে। একটা বর্ণও বুঝলাম না আমি কিন্তু স্পষ্ট ধরতে পারলাম অর্থটা। ওকে যেন না মারি এই প্রার্থনা ছাড়া আর কি হতে পারে?

হাত ধরে তুললাম বেচারাকে। কোনো ভয় নেই, এটা বোঝানোর জন্যে একটু হাসলাম ওর দিকে চেয়ে। তারপর ইশারা করলাম মৃত ছাগল ছানাটার দিকে। দৌড়ে গিয়ে ওটা নিয়ে আসতে বললাম। সঙ্গে সঙ্গে ছুটলো ফ্রাইডে। ও ছাগলের বাচ্চাটা নিয়ে আসার পর বাড়ির পথ ধরলাম।

কিছুদূর আসতে একটা গাছে বড়সড় একটা তোতাপাখি দেখতে পেলাম। বন্দুকের পাল্লার ভেতরেই আছে পাখিটা। দাঁড়াতে বললাম ফ্রাইডেকে। একবার পাখিটার দিকে, একবার গাছের নিচে, একবার আমার বন্দুকের দিকে ইশারা করে বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে ওটা গাছ থেকে মাটিতে ফেলবো আমি। চেহারা দেখে মনে হলো বুঝতে পেরেছে ও আমার উদ্দেশ্য। বন্দুক তুলে গুলি করলাম। পাখিটাকে ঝুপ করে মাটিতে পড়তে দেখলো ফ্রাইডে। কিন্তু ততক্ষণে গুলির শব্দ শুনে আবার কাঁপতে শুরু করেছে ও। বোধহয় ভেবেছে, আমার বন্দুকটা কোনো অলৌকিক মারণাস্ত্র। মানুষ, পশু বা পাখি সবই মারতে সক্ষম ওটা।

আমার মনে হলো ওর এই ভুল ধারণাটা যদি ভেঙে না দেই তাহলে সারা জীবন আমাকে এবং বন্দুকটাকে পূজা করবে ও। বেশ কয়েকদিন আমি আড়াল থেকে খেয়াল করে দেখেছি, একা একা থাকলে বন্দুকটার কাছে গিয়ে দাঁড়ায় ও। ছোঁয় না, কিন্তু কথা বলে ওটার সাথে। পরে একদিন এর কারণ জিজ্ঞেস করে জানতে পেরেছি, ওকে যেন না মারে এই প্রার্থনা জানায়।

বাড়ি ফিরে ফ্রাইডেকে সঙ্গে নিয়ে ছুলে-কুটে রান্নার জন্যে তৈরি করে ফেললাম ছাগলের বাচ্চাটা। চুলোয় চাপালাম খানিকটা মাংস। চমৎকার ঝোল তরকারি হলো। এই খাবারটাও খুব পছন্দ করলো ফ্রাইডে।

রয়ে যাওয়া মাংসের খানিকটা আগুনে ঝলসালাম পরদিন। এটাও খুব পছন্দ হলো ওর। হাত পা নেড়ে বোঝাতে চেষ্টা করলো, খুবই ভালো লেগেছে খেতে। পরপর বেশ কয়েকদিন চললো ছাগলের মাংস খাওয়ার অনুশীলন। তারপর নিজেই একদিন জানালো ফ্রাইডে, আর কখনো ও মানুষের মাংস খেতে চাইবে না।

এরপর শস্য পেষাই এবং চালার কাজ শেখালাম ফ্রাইডেকে। কাঠের হামানদিস্তা এবং লিনেনের চালুনি দিয়ে কয়েকবার করে দেখাতেই ধরে ফেললো কাজটা। কিছুদিনের মধ্যে একাজে আমার সমানই দক্ষ হয়ে উঠলো ও।

এবার রুটি বানানো। আটা মাখানো থেকে শুরু করে রুটি তৈরি, স্যাঁকা–সব করে দেখালাম। এ কাজগুলোও খুব তাড়াতাড়ি শিখে নিতে পারলো ফ্রাইডে।

আগে খাওয়ার লোক ছিলাম আমি একা। এখন দু'জন। দু'জনে খাওয়ার মতো ফসল ফলাতে হলে আগের জমিটুকুতে আর চলবে না। অতএব চাষের জন্যে আগেরটার চেয়ে বড় একখণ্ড জমি পছন্দ করলাম। এবার ঘিরে নিতে হবে জায়গাটা। ফ্রাইডে থাকায় আগের মতো হাড়ভাঙা খাটুনি আর করতে হলো না। দু'জনে মিলে কয়েকদিনের মধ্যেই বেড়া দিয়ে ফেললাম জায়গাটার চারপাশে। দারুণ পরিশ্রম করলো ফ্রাইডে। এ ধরনের কাজ আগে কখনো করেনি ও। তবু টগবগে উৎসাহ নিয়ে করে গেল। কাজটা কেন করছি বললাম ওকে। ও আছে বলে খাওয়ার জন্যে বেশি রুটি লাগবে, এবং সে কারণে বেশি ফসল ফলাতে হবে; তা না হলে বছরের শেষে টান পড়বে খাবারে। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে একটু অপ্রস্তুত হলো ফ্রাইডে। ও এসে পড়ায় আমাকে বেশি পরিশ্রম করতে হচ্ছে ভেবে একটু লজ্জিত যেন। ইশারায় বুঝিয়ে দিলো, কি করতে হবে বলে দিলে জান-প্রাণ দিয়ে খাটবে ও।

কিছুদিনের মধ্যে কাজ চালানোর মত ইংরেজি শিখে গেল ফ্রাইডে। যে সব জিনিসের নাম একবার উচ্চারণ করেছি ওর সামনে সেগুলো শিখে নিয়েছে অবলীলায়। সেই সাথে আমিও আবার জিভটাকে খাওয়া ছাড়া অন্য কাজে ব্যবহার করতে শুরু করেছি। ফ্রাইডের সঙ্গে কথা বলে সত্যিই খুব আনন্দ পাই। তাছাড়া, ওকে বেশ পছন্দ করে ফেলেছি আমি। ওর সরল সততা প্রতিদিনই যেন আরো বেশি করে অনুভব করছি। ক্রমশ যেন ভালোবেসে ফেলছি ছেলেটাকে। আর ওর দিক থেকে–আমার মনে হয়, সবচেয়ে ভালোবাসার জিনিসের চেয়েও বেশি ভালোবেসেছে আমাকে।

একদিন ভাবলাম, নিজের দেশ এবং মানুষের জন্যে এখনো টান আছে কিনা ফ্রাইডের বাজিয়ে দেখা যাক। ওদের জাতি কখনো যুদ্ধে হেরেছে কিনা জিজ্ঞেস করলাম।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমরা সব সময় যুদ্ধে ভালো করি,' জবাব দিলো ফ্রাইডে।

'আচ্ছা, তোমরা সব সময় যুদ্ধে ভালো করো,' বললাম আমি, 'তাহলে, ফ্রাইডে, তুমি ধরা পড়লে কিভাবে?'

'আমরা অন্যদের অনেক মারি, তাই।'

'অনেক মারো? তাহলে ধরলো কি করে?'

'আমাদের চেয়ে অনেক বেশি ওরা। এক, দুই, তিনজন আর আমাকে ধরলো। অন্য জায়গায় আমাদের লোকরা ওদের অনেক বেশি ধরলো।' ওরা অনেক বেশি লোককে ধরেছিলো, বোঝাতে চাইলো।

'তাহলে, তোমাদের অন্য লোকরা তোমাদের চারজনকে বাঁচাতে পারলো না কেন?'

'ওরা এক, দুই, তিনজন আর আমাকে নিয়ে দৌড়ে নৌকায় উঠে পড়লো। আমাদের লোকদের নৌকা ছিলো না।'

'আচ্ছা, ফ্রাইডে, তোমাদের লোকরা যাদের ধরেছিলো তাদের কি করা হয়েছিলো? এদের মতো খেয়ে ফেলেছিল?'

'হ্যাঁ, আমরাও মানুষ খায়, সব খায়।'

'কোথায় নিয়ে গিয়ে খায়?'

'অন্য জায়গায় চলে যায়। যেখানে ইচ্ছে।'

'এখানেও আসে নাকি ওরা?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখানে আসে, অন্য দিকে।'

'ওদের সঙ্গে তুমি কখনো এসেছ এখানে?'

'হ্যাঁ।' হাত উঁচু করে দ্বীপের উত্তর-পশ্চিম দিকে দেখালো ফ্রাইডে।

বুঝলাম আগে অনেকবারই মানুষ খাওয়ার উৎসবে যোগ দিতে এ দ্বীপে এসেছে আমার ফ্রাইডে। একবার নাকি বিশজন পুরুষ, দু'জন মেয়ে এবং একটা বাচ্চাকে খেয়েছিলো ওরা। বিশ সংখ্যাটা অবশ্য উচ্চারণ করতে পারলো না ও। সমান সংখ্যক পাথর মাটিতে রেখে ব্যাপারটা বোঝালো।

এই সব আলাপের পর আমি জিজ্ঞেস করলাম, এখান থেকে কতদূরে ওদের দেশ, এখানে আসার সময় মাঝে মধ্যে দু'একটা ক্যানো ডুবে যায় কিনা। জবাবে যা বললো তার মর্মার্থ হলো, কোনো ক্যানো ডুবেছে বলে ওর জানা নেই। কোনো বিপদ নেই, শুধু, সাগরে কিছুদূর আসার পর খুব স্রোত আর বাতাস থাকে। স্রোতটা সব সময় সকালে যে দিকে যায় বিকেলে তার উল্টো দিকে যায়।

বুঝলাম জোয়ার ভাটার কথা বোঝাতে চাইছে ও। দেশটা কতদূরে সে-সম্পর্কে সঠিক কিছু বলতে পারলো না। আরো হাজারটা প্রশ্ন করলাম ওকে—ওদের দেশ সম্পর্কে, সেখানকার লোক সম্পর্কে; সমুদ্র, উপকূল, কোন্ কোন্ জাতি উপকূলের কাছে বাস করে কিছুই বাদ দিলাম না। দু'একটা জাতির নামও জানতে চাইলাম। কিন্তু 'ক্যারিব' ছাড়া অন্য কোনো নাম ও বলতে পারলো না। বুঝলাম 'ক্যারিবি'দের কথা বলছে। ফ্রাইডে আরো জানালো, চাঁদ যেখানে ডুবে যায় তারচেয়েও অনেক দূরে—জায়গাটা নিশ্চয়ই ওদের দেশের পশ্চিম দিকে—দাড়িওয়ালা সাদা মানুষদের সঙ্গে লড়াই করেছে ওরা। আমার মতো নাকি লোকগুলো। ওদের অনেক লোককে নাকি হত্যা করেছে এ সাদা মানুষরা।

বুঝলাম স্প্যানিয়ার্ডদের কথা বলছে। এরপর জিজ্ঞেস করলাম, এই দ্বীপ থেকে এ সাদা মানুষদের কাছে যাওয়ার কোনো উপায় আছে কিনা।

'হ্যাঁ, দুটো ক্যানো হলে যেতে পারিবেন,' বললো ও।

দুটো ক্যানো বলতে কি বোঝাচ্ছে ভেবে পেলাম না প্রথমে। আরো কিছু প্রশ্ন করার পর বোঝা গেল, দুটো ক্যানো বলতে দুটো ক্যানোর সমান বড় নৌকা বোঝাচ্ছে ও।

বেশ কিছুদিন পর। এখন ফ্রাইডে আমার প্রায় সব কথাই বোঝে। জবাবও দিতে

পারে সব প্রশ্নের। এ সময় একদিন কিছু আধ্যাত্মিক বিষয় নিয়ে আলাপ হলো ওর সাথে।

'তোমাকে কে সৃষ্টি করেছে জানো?' প্রশ্ন করলাম আমি।

হঠাৎ প্রশ্নটা শুনে কেমন যেন হকচকিয়ে গেল ফ্রাইডে। কিছুই বুঝতে পারলো না প্রথমে। ভাবলো, আমি ওব বাবার কথা জিজ্ঞেস করছি।

বুঝলাম এভাবে চলবে না। অন্যদিক থেকে চেষ্টা করলাম এবার। 'আচ্ছা বলো দেখি, সমুদ্র, মাটি, আকাশ, পাহাড়, জঙ্গল এগুলো তৈরি করেছে কে?'

'কেন, বেনামুকি,' বললো ফ্রাইডে। 'সবার ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকে, অনেক বয়েস। সবকিছুর চেয়ে বেশি বয়েস—সাগর, মাটি, চাঁদ, তারা সবকিছুর চেয়ে।' এ ছাড়া আর কিছু বলতে পারলো না ফ্রাইডে।

'আচ্ছা, এই বুড়ো লোকটা যখন সবকিছু তৈরি করেছেন, তখন সবাই কেন তাঁর উপাসনা করে না?'

গম্ভীর মুখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো ও। তারপর আশ্চর্য সরলতার সঙ্গে বললো, 'সবাই তো তাঁকে ও বলে।'

'আচ্ছা,' বললাম আমি, 'তোমাদের দেশের লোকরা মারা যাওয়ার পর কোথাও যায় নাকি?'

'হ্যাঁ, বেনামুকির কাছে।'

'তোমরা যাদের খেয়ে ফেল তারা?'

'তারাও।'

ঈশ্বর সম্পর্কে ওদের ধারণা কি তা জানা হয়ে গেল আমার। এবার এক ও অদ্বিতীয়, সত্য ঈশ্বর সম্পর্কে ধারণা দিতে শুরু করলাম ওকে। আকাশের দিকে ইশারা করে বললাম, 'মহান সৃষ্টিকর্তা ওখানে থাকেন। শুধু পৃথিবী নয়, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সবকিছু সৃষ্টি করেছেন তিনি। তিনি সর্বশক্তিমান, সবকিছু করতে পারেন। যা খুশি দিতে পারেন আমাদের, ইচ্ছে হলে নিয়েও নিতে পারেন। তিনি সবকিছু দেখতে পান, শুনতে পান! কেউ যদি মনে মনে কিছু বলে, তাও শুনতে পান। কে কি ভাবছে তাও তাঁর অজানা নয়।'

হাঁ করে কথাগুলো গিলতে লাগলো ফ্রাইডে। মহান যীশুর কথা বললাম। ঈশ্বরের ইচ্ছায় বিপথগামী মানুষকে ত্রাণ করতে এসেছিলেন তিনি। কিভাবে আমাদের ঈশ্বরকে ডাকা উচিত তা শিখিয়ে গেছেন। গম্ভীর মুখে শুনলো ও। কোনো মন্তব্য করলো না।

কয়েকদিন পর হঠাৎ ফ্রাইডে বললো, 'আমার মনে হয় আপনাদের ঈশ্বর আমাদের বেনামুকির চেয়ে অনেক ক্ষমতাবান। সামান্য একটু দূরে থাকে বেনামুকি, কিন্তু একটা কথাও শুনতে পায় না। তাঁর সঙ্গে কথা বলার জন্যে পাহাড়ে চড়তে হয় আমাদের।'

'তুমি কখনো গেছো নাকি কথা বলতে?' জিজ্ঞেস করলাম।

'না। কম বয়সীরা যায় না। বুড়োরাই কেবল যায়। যারা যায় তাদের আমরা ওউকাকি বলি। তারা ও বলতে ওখানে যায়। ফিরে এসে বেনামুকি কি বলেছে

জানায়।'

দু'একটা প্রশ্ন করে বুঝতে পারলাম, ও বলা মানে প্রার্থনা করা আর ওউকাকি সম্ভবত পুরোহিত জাতীয় কিছু।

ফ্রাইডেদের ধর্মের কাঠামো সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা পাওয়ার পর ওদের বেনামুকি সম্পর্কিত ধারণার অন্তঃসারশূন্যতা নিয়ে বললাম ওকে। শয়তানের কথা বললাম। কি করে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হয়েছিলো শয়তান তা বললাম। তারপর থেকে মানুষকে বিপথে চালানোর ব্রত নিয়েছে সে। শয়তানের ইচ্ছে মতো চললে কি শাস্তি হবে মানুষের তা-ও বললাম।

মন দিয়ে আমার কথা শুনলো ফ্রাইডে। তারপর আচমকা এমন একটা প্রশ্ন করে বসলো যে হকচকিয়ে গেলাম আমি।

'আপনি বললেন, ঈশ্বর শয়তানের চেয়ে অনেক মহান, শক্তিশালী, আর ক্ষমতাবান–।'

'হ্যাঁ, ফ্রাইডে,ঈশ্বর শয়তানের চেয়ে অনেক শক্তিশালী, ক্ষমতাবান। এবং সে কারণেই আমরা শয়তানের উপাসনা না করে এশ্বরের উপাসনা করি।'

'কিন্তু,' একটু দ্বিধার সঙ্গে বললো ফ্রাইডে, 'ঈশ্বর যখন শয়তানের চেয়ে বেশি শক্তিশালী, তখন কেন শয়তানকে মেরে ফেললো না ঈশ্বর? তা হলে তো সে মানুষকে আর বিপথে নিতে পারতো না।'

প্রশ্নটা শুনে অনেকক্ষণ কোনো কথা সরলো না আমার মুখ দিয়ে। শুনতে পাইনি এমন একটা ভাব করলাম। কিন্তু ছাড়লো না ফ্রাইডে। আবার জিজ্ঞেস করলো।

ইতিমধ্যে কিছুটা সামলে নিতে পেরেছি আমি। বললাম, 'শেষ পর্যন্ত ঈশ্বর ওকে ভয়ানক শাস্তি দেবেন। ওর শাস্তি তুলে রাখা হয়েছে। অনন্তকাল নরকের আগুনে জ্বলবে শয়তান।'

এই জবাবে সন্তুষ্ট হতে পারলো না ফ্রাইডে। আমার কথাগুলোই আবার উচ্চারণ করলো, 'তুলে রাখা হয়েছে···; কেন? অনেক আগেই কেন মেরে ফেলা হয়নি শয়তানকে? অনেক আগে মারা হয়নি, ঠিক আছে, এখন কেন মারা হচ্ছে না?'

'আচ্ছা, তার আগে আমার একটা কথার উত্তর দাও,' বললাম আমি। 'তুমি বা আমি যখন খারাপ কাজ করি, সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বর মেরে ফেলেন না কেন আমাদের? ভুল স্বীকার করে ভালো হয়ে যাওয়ার সুযোগ দিচ্ছেন আমাদের।'

'তার মানে আপনি, আমি, শয়তান সবাই যদি ভুল বুঝতে পেরে ভালো হয়ে যাই তাহলে মাফ করে দেবে ঈশ্বর?'

আবার দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেল আমার। কি বলবো? মানুষ যদি অনুতপ্ত হয় তাহলে হয়তো মাফ করে দেবেন ঈশ্বর–জানি না ঠিক। কিন্তু শয়তানকে?

প্রসঙ্গটার ইতি টানার জন্যে তাড়াতাড়ি একটা কাজের ছুতো করে উঠে পড়লাম। ফ্রাইডেকেও পাঠিয়ে দিলাম একটা কাজ দিয়ে। তারপর প্রার্থনায় বসলাম। কায়মনে ডাকলাম ঈশ্বরকে। 'হতভাগা জংলীটার মনে বিশ্বাস জন্মানোর

ক্ষমতা দাও আমাকে।'

এক দিন আমার জীবনের সব কথা শোনালাম ফ্রাইডেকে। বাড়ি ছেড়ে পালানো থেকে শুরু করে এখানে আসা পর্যন্ত; তারপর এখানকার নিঃসঙ্গতার কথা, এই নির্জন দেশে কি করে প্রাণ ধারণ করেছি সে-কথা, সেই ভূমিকম্পের কথা, প্রথমবার জংলীদের পায়ের ছাপ দেখে কেমন ভয় পেয়েছিলাম কোনো কিছুই বাদ দিলাম না।

ঝড়ে সৈকতে উঠে পড়া সেই বড় নৌকাটা দেখালাম একদিন। রোদ, বৃষ্টি, ঝড়ে একেবারে জীর্ণদশা এখন ওটার। জায়গায় জায়গায় খুলে এসেছে তক্তা। নৌকাটা দেখে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো ফ্রাইডে। গভীরভাবে চিন্তা করছে কিছু। তারপর বললো, 'আমাদের দেশে এ রকম নৌকা আসতে দেখেছি।'

বেশ কিছুক্ষণ ওর কথার তাৎপর্য বুঝতে পারলাম না আমি। দু'একটা প্রশ্ন করে শেষ পর্যন্ত যা বুঝলাম তা হলো, কোনো এক সময় এ রকম একটা নৌকা ওদের দেশের উপকূলে এসে ভিড়েছিলো।

'সাদা লোকগুলোকে বাঁচিয়েছিলাম আমরা,' বললো ও। 'সাদা মানুষে ভর্তি ছিলো সে নৌকা।'

'কত জন?'

আঙুল গুণে গুণে যা দেখালো তাতে বুঝলাম, জনা সতেরো হবে।

'কি হয়েছে ওদের?' আবার প্রশ্ন করলাম।

'বেঁচে আছে। আমাদের সাথে আছে এখনো।'

কথাটা শুনে মনে হলো লোকগুলো সেই ঝড়ের রাতে বিধ্বস্ত স্প্যানিশ জাহাজটার নাবিক হতে পারে! জাহাজটা ডুবো পাহাড়ের ফাঁকে আটকে যাওয়ার পর লোকগুলো হয়তো বাঁচার আশায় নৌকায় উঠে রওনা হয়েছিলো উপকূলের দিকে। কিন্তু ঝড়ের দাপটে এদিকে না এসে ফ্রাইডেদের উপকূলে চলে যায়।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আরো প্রশ্ন করলাম ফ্রাইডেকে। এখন ঠিক কি অবস্থায় আছে সাদা লোকগুলো, জানতে চাইলাম।

'আমার লোকদের সাথে আছে ওরা,' আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে বললো ও। 'এখনো আছে। প্রায় চার বছর আগে এসেছে। ওরা একা একা থাকে। মাঝে মাঝে খাবারদাবার দিয়ে সাহায্য করি আমরা।'

'ওদের মেরে খেয়ে ফেলেনি কেন তোমার লোকরা?'

'না, সাদা মানুষদের সাথে ভাই পাতিয়েছে ওরা।'

ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে না পারলেও, উচ্চবাচ্য করলাম না কোনো।

আঠারো

বেশ কিছুদিন পর। দ্বীপের পুব পাশের উঁচু একটা পাহাড়ে উঠেছি আমি আর ফ্রাইডে। পরিষ্কার দিনটা। স্পষ্ট দেখতে পেলাম মূল ভূখণ্ড অর্থাৎ আমেরিকা মহাদেশ! ফ্রাইডেও দেখলো। সঙ্গে সঙ্গে খুশিতে লাফাতে লাগলো ও।

'কি খুশি! কি আনন্দ! এ যে আমার দেশ। এ যে আমার দেশ।'

ওর চোখে মুখে অমন আনন্দের অভিব্যক্তি দেখে একটু দমে গেলাম আমি। এখনো বোধহয় নিজের দেশ-জাতির প্রতি টান রয়েছে ওর। সেটা অবশ্য অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু ওর স্বভাবের কি কোনো পরিবর্তন হয়নি এখনো? নিজের দেশে ফিরে গেলে কি আবার মানুষখেকো জংলীতে পরিণত হবে ও? এতদিন একটু একটু করে যে সত্য ধর্মের শিক্ষা দিয়েছি, ভুলে যাবে সব? আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ?

অস্বস্তিতে কাটলো কয়েকটা দিন। কোনো মতেই ভুলতে পারছি না ওর সেদিনকার আনন্দে উদ্ভাসিত মুখটার কথা। ফ্রাইডে আবার জংলী, মানুষখেকো হয়ে যাবে; কথাটা প্রায় বদ্ধমূল হয়ে গেছে আমার মনে। ভয়ের চেয়ে দুঃখই লাগছে বেশি। আবার নিঃসঙ্গ হয়ে যাবো আমি!

কিছুদিন পর আবার এ একই পাহাড়ে উঠেছি আমরা। দিনটা মেঘলা বলে দূরের মূল ভূখণ্ড দেখা যাচ্ছে না। তবু ফ্রাইডেকে বাজিয়ে দেখতে চাইলাম আমি। বললাম, 'তোমার নিজের দেশে, নিজের লোকদের ভেতর যেতে চাও না, ফ্রাইডে?'

'হ্যাঁ,' বললো ও, 'খুব খুশি হবো যেতে পারলে।'

'কি করবে ওখানে গিয়ে? আবার বুনো হয়ে যাবে? মানুষের মাংস খাবে?'

উদ্বিগ্ন চোখে আমার দিকে তাকালো ও। মাথা নেড়ে বললো, 'না, না। ফ্রাইডে ওদের ভালো হতে বলবে। ঈশ্বরের উপাসনা করতে আর রুটি, পশুর মাংস, দুধ খেতে বলবে। মানুষের গোশ না খেতে বলবে।'

'কেন? তাহলে ওরা মেরে ফেলবে না তোমাকে?'

কথাটা শুনে একটু গম্ভীর হয়ে গেল ও। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললো, 'না, ওরা মারবে না। শিখবে ওরা।'

তারপর জিজ্ঞেস করলাম, ও এক্ষুণি চলে যেতে চায় কিনা। একটু হেসে জবাব দিলো ফ্রাইডে, 'অতদূর সাঁতরে যেতে পারবো না যে।'

'তোমাকে যদি একটা ক্যানো বানিয়ে দেই?'

'আপনি যদি যান তাহলে যাবো।'

'আমি? ওরা খেয়ে ফেলবে না আমাকে?'

'না না। আমি ওদের করতে দেবো না অমন কাজ।' তারপর সবিস্তারে জানালো সতেরো জন দাড়িওয়ালা সাদা মানুষের সাথে কেমন ভালো ব্যবহার করেছে ওরা।

এ সময় থেকে আবার আমার মনে ঘুরপাক খেতে লাগলো চিন্তাটা—যেতেই হবে ওখানে। দাড়িওয়ালা লোকগুলো সম্ভবত স্প্যানিশ অথবা পর্তুগীজ। হয়তো মিলিত হতে পারবো ওদের সাথে। সবাই মিলে চেষ্টা করলে হয়তো পালানোর একটা উপায়ও করতে পারবো। এরকম ভেবে কয়েকদিন পর ফ্রাইডেকে নিয়ে রওনা হলাম দ্বীপের অন্য পাশের উদ্দেশ্যে। আমার নৌকাটা যেখানে ডুবিয়ে রেখেছি, সেখানে গিয়ে দুজনে মিলে নৌকাটা তুললাম পানি থেকে। উঠে বসলাম তারপর।

'এইবার, ফ্রাইডে,' বললাম আমি। 'যাবো তোমাদের দেশে?'

প্রস্তাবটা শুনে মোটেই উৎফুল্ল হলো না ফ্রাইডে। বললো, 'খুবই ছোট নৌকা। এত ছোট নৌকা নিয়ে অত দূর যাওয়া যাবে না।'

আগে যে একটা বড় নৌকা বানিয়েছিলাম ওকে বললাম সে-কথা। এবার একটু উজ্জ্বল হলো ওর দৃষ্টি।

পরদিন দু'জনে গেলাম প্রথম ক্যানোটার কাছে–যেটাকে পানিতে ভাসাতে পারিনি আমি। এতদিন পড়ে থেকে করুণ দশা হয়েছে ওটার। বাইশ-তেইশ বছর একটানা রোদে শুকিয়ে আর জলে ভিজে শেষ অবস্থায় পৌঁছে গেছে। হাত দিতে ঝুর ঝুর করে ভেঙে এলো পচা কাঠ। নৌকাটা দেখলো ফ্রাইডে। জানালো, এরকম একটা নৌকা হলে সম্ভব।

'ঠিক আছে,' বললাম আমি, 'এ রকম একটা নৌকা তৈরি করে ফেলবো আমরা। সেটাতে করে বাড়ি যেতে পারবে তুমি।'

কথাটা শুনেই গম্ভীর হয়ে গেল ফ্রাইডে। কথা বললো না অনেকক্ষণ। দুঃখ পেয়েছে যেন। আ র্য! ওর তো খুশি হওয়ার কথা।

'কি ব্যাপার, কথা বলছো না কেন তুমি?' জিজ্ঞেস করলাম।

'আপনি ফ্রাইডের ওপর রেগে গেছেন,' বললো ও। 'কি করেছি আমি?'

'আরে কি বলছো তুমি! আমি রেগে গেছি কে বললো?'

'রাগেননি! রাগেননি! তাহলে ফ্রাইডে চলে যাবে কেন?'

'কেন, তুমি না সেদিন বললে, দেশে যেতে পারলে খুব খুশি হবে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলেছি। কিন্তু ফ্রাইডে একা যাবে না। মাস্টার না গেলে ফ্রাইডে যাবে না। কোনো দিন যাবে না।'

'শোনো ফ্রাইডে,' নরম গলায় আমি বললাম, 'আমি ওখানে গিয়ে কি করবো?'

ঝট করে আমার দিকে তাকালো ও। 'কেন? অনেক ভালো কাজ করবেন আপনি। বুনো মানুষদের ভালো মানুষ হতে শেখাবেন, ঈশ্বরের উপাসনা করতে শেখাবেন।'

আমার ওপর ফ্রাইডের আস্থা দেখে আমি নিজেই অবাক হয়ে গেলাম। অপ্রস্তুত গলায় বললাম, 'কি বলছো তুমি যদি জানতে, ফ্রাইডে! আমি নিজেই তো কিছু জানি না, ওদের কি শেখাবো?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি আমাকে শিখিয়েছেন, ওদেরও শেখাবেন।'

'না, ফ্রাইডে, তুমি চলে যাও। আমি এখানেই থাকি। একা থাকতে কোনো অসুবিধা হবে না আমার।'

বেশ কিছুক্ষণ হতবুদ্ধির মত দাঁড়িয়ে রইলো ও। তারপর ছুটে গিয়ে একটা ছোট কুঠার এনে দিলো আমার হাতে।

জিজ্ঞেস করলাম, 'কি করবো এটা দিয়ে?'

'ফ্রাইডেকে মেরে ফেলেন,' হাঁপাতে হাঁপাতে বললো ও।

'কি আশ্চর্য! কেন তোমাকে মেরে ফেলবো?'

'ফ্রাইডেকে তাড়িয়ে দেবেন কেন? তার চেয়ে মেরে ফেলেন!'

চিকচিক করে উঠলো ওর দুচোখের কোনা। অভিভূত হয়ে গেলাম আমি। একটা জংলী বই তো নয়, এই কদিনে এতটা ভালোবেসে ফেলেছে আমাকে!

'ঠিক আছে, ফ্রাইডে,' বললাম আমি, 'তোমাকে একা যেতে হবে না। গেলে আমরা দুজনেই যাবো।'

অশ্রুভেজা চোখ দুটো খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো ওর। বুঝতে পারলাম, নিজের দেশ ও জাতির জন্যে ফ্রাইডের যতটুকু টান আমার জন্যে তার চেয়ে মোটেই কম না, বরং বেশি। আমি ওর দেশের লোকদের সভ্য করে তুলতে পারবো এমন একটা আশাতেই ও আমাকে নিয়ে যেতে চাইছে ওখানে।

ঠিক আছে, যাবো আমি। কিন্তু তার আগে বড় একটা ক্যানো তৈরি করতে হবে। দেরি না করে ফ্রাইডেকে নিয়ে কাজে লেগে গেলাম। প্রথম কাজঃ যুৎসই একটা গাছ খুঁজে বের করা। যথেষ্ট গাছ আছে দ্বীপে। ছোটখাটো একটা নৌবহর তৈরি করা যাবে। কিন্তু আমি চাইছি গাছটা যেন পানির খুব কাছে হয়। তা না হলে প্রথমটার মতো এটাও ডাঙার ওপর পচবে।

পানির কাছে অনেক গাছই আছে। কিন্তু প্রয়োজন মতো মোটা আর শক্ত না হলে হবে না। চলতে লাগলো খোঁজাখুঁজি। এ ব্যাপারে আমার চেয়ে ফ্রাইডে অভিজ্ঞ বেশি। শেষ পর্যন্ত ও-ই পছন্দ করলো গাছ। প্রথম ক্যানোটা যে গাছ দিয়ে বানিয়েছিলাম প্রায় সেটার মতোই মোটা।

ফ্রাইডেই কেটে শোয়ালো গাছটাকে। যে অংশ দিয়ে নৌকা হবে গাছের বাকি অংশ থেকে কেটে আলাদা করা হলো সেটুকু। দু'জনে মিলে কুড়াল আর বাটালি চালিয়ে বাইরের দিকটাকে নৌকার চেহারা দিলাম। এবার ভেতরটা গর্ত করতে হবে। আগুনে পুড়িয়ে করার পরামর্শ দিলো ফ্রাইডে। ওদের দেশে এভাবেই তৈরি হয় ক্যানোর খোল। বুদ্ধিটা ভালো, অনেক সহজে করা যায় গর্ত। কিন্তু একটু উল্টোপাল্টা হলে পুরো নৌকাটাই বরবাদ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। সুতরাং ঝুঁকি নিলাম না আমি। ফ্রাইডেকে বললাম, 'আগুন ছাড়াও গর্ত করা যাবে।'

কিছুক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে রইলো ও। কিছুই ঢুকছে না যেন মাথায়। হাতুড়, বাটাল, কুড়াল এ সব যন্ত্রপাতি দিয়ে কি করে কাজটা করা যাবে, ব্যাখ্যা করে বোঝালাম আমি। এতক্ষণে বুঝলো ফ্রাইডে। কিভাবে কি করতে হবে দেখিয়ে দিলাম প্রথমে। তারপর শুরু হলো কাজ। আমার চেয়ে অনেক দ্রুত কাজ করলো ফ্রাইডে। নতুন কিছু করার আনন্দে ওর হাত চলছে বেশি।

অবশেষে তৈরি হলো নৌকা। প্রথম ক্যানোটা বানাতে যা সময় লেগেছিলো তার প্রায় অর্ধেকেই হয়ে গেল। এবার পানিতে ভাসাতে হবে।

পুরো নৌকা তৈরি করতে যা খাটুনি গেছে তারচেয়ে অনেক বেশি খাটুনি লাগলো ওটা পানিতে ভাসাতে। বেশ কয়েকটা সোজা গাছের ডাল দিলাম তলে। তারপর ওগুলোর ওপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে ঠেলে নিঁয়ে গেলাম নৌকাটাকে। পরিশ্রম অনেক কম হলো এতে। কিন্তু যা হলো তা-ও খুব কম নয়। অবশ্য নৌকাটা পানিতে নামাতে পারার সঙ্গে সঙ্গে ভুলে গেলাম সব কষ্ট। অনায়াসে বিশজন লোক নিয়ে সাগর পাড়ি দিতে পারবে ওটা।

দু'জনে উঠলাম নৌকায়। আমি বসে রইলাম, চালানোর মকশো করতে

লাগলো ফ্রাইডে। এমন আশ্চর্য দক্ষতার সাথে ও একটা মাত্র বৈঠা দিয়ে নৌকাটা বাইতে, ঘোরাতে, নিয়ন্ত্রণ করতে লাগলো যে, অবাক না হয়ে পারলাম না আমি।

'কি, এই নৌকায় যাওয়া যাবে তোমার দেশে?' জানতে চাইলাম।

'হ্যাঁ।'

'চালিয়ে নিতে পারবে?'

'খুব পারবো। জোর বাতাস হলেও পারবো।'

কিন্তু, আমার মাথায় অন্য একটা বুদ্ধি আছে, যার বিন্দু-বিসর্গ জানে না ফ্রাইডে। পাল খাটানোর জন্যে নৌকাটায় এবার একটা মাস্তুল লাগাতে হবে। নোঙ্গরেরও ব্যবস্থা করতে হবে।

দু'মাস লাগলো মাস্তুল, পেছনে একটা হাল আর কাজ চালানোর মতো একটা নোঙ্গর লাগাতে। এগুলো করতে করতে পালতোলা জাহাজ বা নৌকা চালানোর কলাকৌশল সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিয়ে ফেললাম ফ্রাইডেকে। দাঁড় বা বৈঠা চালানোর কাজে খুব দক্ষ হলেও হাল বা পালের ব্যবহার সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা ছিলো না ওর। সামান্য কয়েকদিন অনুশীলনের পর কম্পাসের ব্যবহার ছাড়া আর সব শিখে নিলো ও। মোটামুটি একজন দক্ষ নাবিকে পরিণত হলো ফ্রাইডে। বেশ কয়েকদিন চেষ্টা করেও কম্পাস সম্পর্কে বিশেষ কিছু বোঝাতে পারলাম না ওকে।

দ্বীপে আটকে পড়ার সাতাশ বছরে পড়লাম। যদিও গত তিন বছর ধরে, অর্থাৎ ফ্রাইডেকে পাওয়ার পর থেকে একবারও মনে হয়নি এখানে আমি আটকে আছি, তবু আজকাল প্রায়ই মনে হয় মুক্তির দিন এসে গেছে। খুব দেরি নেই আর। সম্ভবত এ বছরটাই এখানে আমার শেষ বছর।

বর্ষাকাল এসে গেল। অন্যান্য বারের মতো এবারও বৃষ্টির সময় বাইরের চেয়ে ঘরেই থাকতে হচ্ছে বেশি। নতুন নৌকাটা আমরা দ্বীপের এপাশের খাঁড়িতে–প্রথমবার যেখানে ভেলা থেকে মাল নামিয়েছিলাম সেখানে এনে রেখেছি। দড়ি দিয়ে বেঁধে পানিতে ভাসিয়ে রাখার বুদ্ধিটা নিরাপদ মনে হচ্ছে না। ঝড়ে দড়ি ছিঁড়ে যদি একবার ভেসে যায় তাহলে সারা জীবন কপাল চাপড়ালেও আর ফেরত পাওয়া যাবে না। গোড়া থেকে শুরু করতে হবে আবার। কি করা যায় ভেবে পেলাম না প্রথমে। বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর একটা বুদ্ধি এলো মাথায়: খাঁড়ির একধারে নৌকাটা এঁটে যায় এত বড় একটা গর্ত করতে বললাম ফ্রাইডেকে। এমন জায়গায় করা হলো গর্তটা, যেখানে ভাটার সময় পানি থাকে না।

গর্ত তৈরি হলো। জোয়ারের সময় পানি এসে ভরে গেল জায়গাটা। আমি আর ফ্রাইডে নৌকাটা নিয়ে গেলাম সেখানে। ভাটার সময় পানি নেমে গেল। এবার দুজনে মিলে গর্তের শেষ প্রান্তে মজবুত করে বাঁধ দিয়ে দিলাম মাটি দিয়ে। জোয়ারের সময় আর পানি আসতে পারবে না ভেতরে। শুকনো জায়গায় রইলো নৌকা। বৃষ্টি যেন না লাগে সেজন্যে বড় বড় ডাল এনে ঢেকে দিলাম। নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে রওনা হবো ভাবছি। সে পর্যন্ত ওখানে, ওভাবেই থাকবে নৌকাটা।

ঝড়-বাদলের দিন প্রায় গেছে। আর ক'দিন পর পুরোদস্তুর শুকনো মৌসুম শুরু হবে। মানসিক প্রস্তুতি নেয়া হয়ে গেছে অনেক আগে। যাত্রার প্রস্তুতি নিতে

হবে এবার। খাবার-দাবার, পানি এবং আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র কি কি নিতে হবে না হবে ঠিক করে ফেলেছি। এখন সেগুলো সংগ্রহ করে নৌকায় বোঝাই দেয়ার অপেক্ষা।

এ সময় একদিন সকালে ফ্রাইডেকে সাগরতীরে যেতে বললাম, একটা কচ্ছপ পায় কিনা দেখতে। মাংস ছাড়াও প্রচুর ডিম পাওয়া যায় ওগুলো থেকে।

হঠাৎ দেখি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে ফ্রাইডে। বাইরের দেয়ালটা প্রায় উড়ে পার হয়ে এলো। 'ও মাস্টার! ও মাস্টার! দুঃখ! খুব খারাপ!' হাঁপাতে হাঁপাতে চিৎকার করলো ও।

'কি ব্যাপার, ফ্রাইডে? কি হয়েছে?'

'ওখানে! ওখানে! একটা, দুটো, তিনটে ক্যানো! একটা, দুটো, তিনটে!'

'তাতে কি হয়েছে?' ওকে সাহস দেয়ার ভঙ্গিতে বললাম আমি। 'অত ঘাবড়াবার কি আছে?'

আমার অভয়বাণীতে কাজ হলো না বিশেষ। রীতিমত আতঙ্ক ফ্রাইডের চেহারায়। যেদিন ওকে উদ্ধার করেছিলাম সেদিনকার মত। বার বার অভয় দেয়া সত্ত্বেও স্বস্তি বোধ করলো না ও। কেমন করে জানি ওর ধারণা হয়েছে ওকেই খুঁজতে এসেছে জংলীগুলো।

'শোনো, ফ্রাইডে,' একটু ঝাঁঝের সাথেই বললাম আমি, 'তোমার চেয়ে কি আমার বিপদ কম? আমাকে পেলে কি ছেড়ে দেবে ওরা? একটু শান্ত হও, ওদের সাথে লড়াই করতে হবে। তুমি লড়বে, ফ্রাইডে?'

'হ্যাঁ। কিন্তু, ওরা যে অনেক!'

'তাতে কি হয়েছে? আমাদের গুলির শব্দ শুনেই ওরা ভয়ে পালাবে।' তারপর জিজ্ঞেস করলাম, আমার পাশে দাঁড়িয়ে, আমার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করবে কিনা ও।

'নিশ্চয়ই, মাস্টার,' বললো ফ্রাইডে, 'আপনি বললে মরতে রাজি!'

দুটো ছোট বন্দুকে গুলিবারুদ ভরতে বললাম ওকে। আমি নিজে গুলি ভরলাম চারটে বড় বন্দুকে। বড় তলোয়ারটা খাপ খুলে ঝুলিয়ে নিলাম কোমরে। ফ্রাইডেকে দিলাম ছোট একটা কুঠার। ও-ও সেটা কোমরবন্ধের সাথে আটকে নিলো।

অস্ত্রসজ্জা শেষ। দূরবীনটা নিয়ে পাহাড়ের ওপর গিয়ে উঠলাম আমি। দেখলাম একুশ জন মানুষখেকো জংলী, তিনজন বন্দী আর তিনটে ক্যানো। মাত্র তীরে নেমেছে তারা। আমরা নৌকা রেখেছি যে খাঁড়িতে তার এপাশে। ঘন জঙ্গল জায়গাটায়। সাগর পর্যন্ত নেমে গেছে জঙ্গল, তার ওপাশেই নেমেছে ওরা।

পাহাড় থেকে নেমে দ্রুত। অস্ত্রগুলো ভাগা ভাগি করে ফেললাম। ফ্রাইডেকে দিলাম কোমরে গোঁজার জন্যে একটা পিস্তল আর কাঁধে ঝোলানোর জন্যে তিনটে বন্দুক। আমি নিলাম একটা পিস্তল আর বাকি বন্দুক তিনটে। পকেটে করে ছোট্ট এক বোতল রামও নিলাম আমি। ফ্রাইডেকে দিলাম গুলি-বারুদ ভর্তি বড় একটা থলে।

'আমার ঠিক পেছনে পেছনে থাকো, ফ্রাইডে, আমি না বলা পর্যন্ত কিছু করবে

না। গুলি ছুঁড়বে না। আর একদম মুখ বুজে থাকবে।'

নিঃশব্দে এগোতে লাগলাম আমরা। জঙ্গলটার প্রান্তে পৌঁছে ফ্রাইডের দিকে ফিরলাম আমি। একটা বড় গাছ দেখিয়ে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলাম, 'জংলীরা এখন কি করছে, গাছটায় উঠে দেখে আসতে পারবে?'

চলে গেল ফ্রাইডে। একটু পরেই ফিরে এসে জানালো, আগুনের পাশে বসে একজন বন্দীর মাংস খাচ্ছে ওরা। অন্য একজনকে বেঁধে শুইয়ে রাখা হয়েছে বালির ওপর। এরপর এ লোকটাকে মারবে ওরা। আরও জানালো, শুইয়ে রাখা বন্দীটা ওদের জাতের লোক না, সেই দাড়িওয়ালা সাদা মানুষদের একজন।

শুনে আর এক মুহূর্ত দাঁড়ালাম না আমি। নিঃশব্দে ছুটে গেলাম গাছটার কাছে। একটা ডালে উঠে দূরবীন দিয়ে দেখলাম, ফ্রাইডের কথা ঠিক। দাড়িওয়ালা একজন সাদা লোককে হাত-পা বেঁধে শুইয়ে রাখা হয়েছে বালির ওপর।

সামনে একটা ঝোপ। তার ওপাশে আরেকটা বড় গাছ। জংলীদের অলক্ষ্যে থেকে এ-পর্যন্ত চলে যেতে পারবো সহজে। ওখানে যেতে পারলে বন্দুকের পাল্লার অর্ধেকের মধ্যে চলে আসবে মানুষখেকোগুলো।

গাছ থেকে নেমে ঝোপের আড়ালে আড়ালে এগোতে লাগলাম। ফ্রাইডেকে বললাম অনুসরণ করতে। ঝোপের ওপাশের বড় গাছটার সামনে খানিকটা জায়গা একটু উঁচু হয়ে টিলার চেহারা নিয়েছে। সেটার ওপর উঠতেই চোখের সামনে ভেসে উঠলো দৃশ্যটা।

নষ্ট করার মতো এক মুহূর্ত সময় নেই হাতে। উনিশজন জংলী জড়ো হয়ে বসে আছে এক জায়গায়। অন্য দুজনকে পাঠানো হয়েছে হতভাগ্য খ্রীষ্টানটার ওপর কসাইগিরি করতে। জংলী দুটো ঝুঁকে পায়ের বাঁধন খুলছে তার।

ফ্রাইডের দিকে ফিরলাম আমি। ফিসফিস করে বললাম, 'এখন, ফ্রাইডে, আমি যা করি ঠিক তাই করবে। ফস্কায় না যেন।'

কাঁধের ওপর থেকে বন্দুকগুলো মাটিতে রাখলাম। আমার দেখাদেখি ফ্রাইডেও রাখলো। একটা বড় বন্দুক তুলে নিয়ে নিশানা করলাম জংলীদের দিকে। ফ্রাইডেকেও বললাম করতে। 'তৈরি তুমি, ফ্রাইডে?'

'হ্যাঁ!'

'তাহলে গুলি শুরু কর।'

প্রায় একই সঙ্গে গর্জে উঠলো আমার আর ফ্রাইডের বন্দুক।

লক্ষ্যভেদে আমার চেয়ে অনেক ভালো করলো ফ্রাইডে। দুজনকে মারলো আর তিনজনকে আহত করলো ও। আমি মারতে পারলাম একজনকে আর আহত করলাম দুজনকে। মুহূর্তে আকাশ ভেঙে পড়লো যেন মানুষখেকোগুলোর মাথায়। যারা এখনো আহত বা নিহত হয়নি তড়াক্ করে উঠে দাঁড়ালো তারা। তবে ঠিক বুঝে উঠতে পারলো না কোন্দিক ফেলে কোন্দিকে দৌড়াবে। এখনো টের পায়নি আসলে বিপদ এসেছে কোন্ দিক থেকে।

ফ্রাইডে তাকিয়ে আছে আমার দিকে পরবর্তী নির্দেশের জন্যে।

প্রথমবার গুলি ছোঁড়ার প্রায় সাথে সাথে বড় বন্দুকটা নামিয়ে রেখে একটা

ছোট বন্দুক তুলে নিয়েছি আমি। দেখাদেখি ফ্রাইডেও তুলে নিয়েছে একটা।

'তৈরি, ফ্রাইডে?'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে আবার!'

ভীত সন্ত্রস্ত জংলীগুলোর ওপর আবার গুলি চালালাম আমরা। ছোট বন্দুকগুলোয় ছররা ভরেছিলাম। মাত্র দুজন পড়লো। কিন্তু আহত হলো অনেক। পাগলের মতো চিৎকার করতে করতে ছুটোছুটি শুরু করলো হতভাগাগুলো। ছুটতে ছুটতেই তিনজন আহত লোক পড়ে গেল মাটিতে।

'এবার, আমার পেছন পেছন এসো।' আরেকটা বড় বন্দুক তুলে নিলাম আমি। ফ্রাইডেও তুলে নিলো অন্য বড় বন্দুকটা। শুধুমাত্র এই দুটো বন্দুকেই গুলি ভরা আছে এখন। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে এগোলাম আমরা মানুষখেকোগুলোর দিকে।

জঙ্গল পেরিয়ে সৈকতে পৌছার পরও আমাদের দেখতে পেলো না জংলীরা। আরো কয়েক পা এগোলাম। হ্যাঁ, এবার দেখেছে দু'এক জন। আমি যা করি তা করতে ইশারা করলাম ফ্রাইডেকে। গলার সবটুকু জোর দিয়ে চিৎকার করতে করতে ছুটলাম জংলীদের দিকে। ফ্রাইডেও আসতে লাগলো পেছন পেছন। ও-ও চিৎকার করছে হেঁড়ে গলায়। জংলীদের আতঙ্কের শেষ সীমায় নিয়ে যাওয়াই আমার উদ্দেশ্য।

হাত পা বাঁধা অবস্থায় সৈকতে শুয়ে থাকা দাড়িওয়ালা লোকটার কাছে পৌছুলাম। তার পায়ের বাঁধন খুলছিলো যে জংলী দুটো,গুলির শব্দে ভেগেছে তারা। সাগরের কাছে গিয়ে ঠেলাঠেলি করে জলে ভাসানোর চেষ্টা করছে একটা ক্যানো। আরো তিনজন জংলী গিয়ে হাত লাগিয়েছে তাদের সাথে। ওদের দিকে গুলি করতে ইশারা করলাম ফ্রাইডেকে। আমার ইশারার অর্থ বুঝতে দেরি হলো না ওর। ছুটে আরো কয়েকপা এগিয়ে গিয়ে গুলি করলো ও। দু'জন মরলো আর একজন আহত হলো। আহত লোকটা মরার মতো পড়ে রইলো ক্যানোর খোলের ভেতর। অক্ষত দুজন ততক্ষণে পানিতে ভাসিয়ে দিয়েছে ক্যানো। প্রাণপণে দাঁড় টানছে খোলা সাগরের দিকে। এই সুযোগে ছুরি বের করলাম আমি। ঝটপট কেটে দিলাম দাড়িওয়ালা লোকটার হাত পায়ের বাঁধন। হাত ধরে তুললাম লোকটাকে। পর্তুগীজ ভাষায় জিজ্ঞেস করলাম, 'কে তুমি?'

'খ্রীষ্টান,' ল্যাটিন ভাষায় জবাব দিলো সে।

দাঁড় করাতে গেলাম লোকটাকে। কিন্তু দাঁড়ানো দূরে থাক, বসা অবস্থা থেকেই গড়িয়ে পড়ে গেল আবার। ভীষণ দুর্বল আর আতঙ্কিত হয়ে আছে। পকেট থেকে রামের বোতলটা বের করে দিলাম তার হাতে। খেতে ইশারা করলাম। বিনা বাক্যব্যয়ে ছোট্ট বোতলটা প্রায় খালি করে ফেললো সে।

জিজ্ঞেস করলাম, 'কোন দেশের লোক তুমি?'

'স্পেন।' অনেক কষ্টে উচ্চারণ করলো লোকটা। এখনো কথা বলতে পারছে না ঠিকমতো। তারপর হাত-পা নেড়ে আকার ইঙ্গিতে কতটা কৃতজ্ঞ আমার কাছে তা বোঝানোর চেষ্টা করলো।

'সিনোর,' ভাঙা ভাঙা স্প্যানিশে বললাম আমি, 'পরে কথা বলবো তোমার সাথে, আগে জংলীদের সাথে বোঝাপড়াটা সেরে নেই। তুমি এই পিস্তল আর তলোয়ারটা রাখো। দরকার হতে পারে।'

কোথায় ক্লান্তি, কোথায় দুর্বলতা—অস্ত্রদুটো হাতে পাওয়ার সাথে সাথে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো লোকটা। তলোয়ার হাতে ঝড়ের বেগে এগিয়ে গেল জংলীগুলোর দিকে। মুহূর্তের মধ্যে ঘাড় থেকে আলাদা করে ফেললো দু'জন মানুষখেকোর কল্লা। বন্দুকের শব্দে এমনিতেই আধমরা অবস্থা জংলীগুলোর। পালানোর পথ খুঁজে পাচ্ছে না। তার ওপর সমানে আক্রমণ করে চলেছি আমরা।

আমি আর গুলি করলাম না। দরকার হলে জরুরী মুহূর্তে ব্যবহার করবো এই বন্দুকটা। ছ'টা বন্দুকের ভেতর এই একটাতেই গুলি-বারুদ ভরা আছে এখনো। ফ্রাইডের কাছে একটা থলেতে অনেকটা বারুদ আর গুলি আছে বটে, কিন্তু বন্দুকগুলোয় গুলি বারুদ ভরতে যে সময় লাগবে ততক্ষণে যাতে পরিস্থিতি আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে না যায় সেজন্যে এটা গুলি ভরা অবস্থায়ই রাখা দরকার।

ফ্রাইডেকে ডেকে বাকি বন্দুকগুলো নিয়ে আসতে বললাম। খুব তাড়াতাড়িই ও কুড়িয়ে আনলো সবগুলো। গুলি ভরাটা ফ্রাইডেকে দিয়ে অন্যগুলোয় গুলি ভরতে বসলাম আমি।

এরমধ্যে ভয়ানক এক দফা লড়াই হয়ে গেল একজন মানুষখেকোর সাথে স্প্যানিশ লোকটার। হঠাৎ একটা বিরাট কাঠের তলোয়ার নিয়ে তেড়ে এসেছিল এক জংলী। এরকম তলোয়ার দিয়েই মানুষের হাত পা আলাদা করে ওরা। প্রচণ্ড ক্লান্তি আর দুর্বলতা সত্ত্বেও সাহসের সাথে লড়লো স্প্যানিশটা। দুটো বড় বড় ক্ষত সৃষ্টি হলো জংলীটার মাথায়। কিন্তু সে-ও কম যায় না। যথেষ্ট শক্তিশালী আর দক্ষ তলোয়ার চালানোয়। বেশ কিছুক্ষণ লড়াই হলো। কেউ কাউকে হারাতে পারছে না। হঠাৎ স্প্যানিশটার একেবারে কাছে চলে এলো জংলীটা। প্রবল একটা ধাক্কা মারলো। দুর্বল শরীরে ধাক্কাটা সামলাতে পারলো না স্প্যানিশ। পড়ে গেল মাটিতে। এসময় ওকে মারার কথা ভুলে ওর তলোয়ারটা টানাটানি করতে লাগলো জংলী। তলোয়ার ছেড়ে কোমর থেকে পিস্তল খুলে গুলি ছুঁড়লো স্প্যানিশ। সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল জংলীটা।

এদিকে স্বাধীনতা পেয়েছে যেন ফ্রাইডে। সমানে তাড়া করে চলেছে ভীত সন্ত্রস্ত জংলীদের। ছোট কুঠারটা ছাড়া আর কিছু নেই ওর হাতে। তবু কি তেজ! একটা চোখের আড়াল হতেই আরেকটাকে তাড়া করছে। গুলিতে আহত কয়েকটা মানুষখেকোকে বাগে পেয়ে শেষ করে দিলো।

ইতিমধ্যে বন্দুকগুলোয় গুলি ভরে ফেলেছি আমি। স্প্যানিশ লোকটা চাইলো একটা বন্দুক। দিলাম ওকে। সেটা নিয়ে ছুটলো সে দুই জংলীর দিকে। দুটোকেই আহত করলো সে। কিন্তু আহত হলেও পড়ে গেল না লোক দুটো। ছুটতে ছুটতে গিয়ে ঢুকলো জঙ্গলে। এবার তাড়া করার ভার নিলো ফ্রাইডে। লোক দুটোর পেছন পেছন সে-ও ঢুকে পড়লো জঙ্গলে। একটাকে মারতে পারলো। অন্যটা ছুটতে ছুটতে পৌঁছে গেল সাগর তীরে। একটুও দেরি না করে ঝাঁপিয়ে পড়লো

পানিতে। আহত শরীরেই সাঁতরাতে লাগলো দূরে চলে যাওয়া ক্যানোটার দিকে। আশ্চর্য দ্রুত সাঁতরে ক্যানোর কাছে পৌঁছে গেল লোকটা। একুশজন জংলীর মধ্যে এই চারজন ছাড়া আর কেউ রেহাই পায়নি আমাদের হাত থেকে।

গুলির পাল্লার বাইরে চলে যাওয়ার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছে ক্যানোর জংলীগুলো। দু'তিনবার গুলি ছুঁড়লো ফ্রাইডে। কিন্তু মনে হয় না লাগাতে পারলো এক জনকেও।

নিঃসন্দেহে লোকগুলো ফিরে গিয়ে সব ঘটনা খুলে বলবে দলের অন্যদের। তখন যদি কয়েকশো ক্যানো নিয়ে হাজারখানেক জংলী এসে চড়াও হয় দ্বীপে তা হলে কি হবে? গুলি করে ক'জনকে মারবো? সুতরাং ঝুঁকি নেয়া চলবে না। এ ক'জনকেও মেরে ফেলতে হবে। জংলীদের ফেলে যাওয়া একটা ক্যানো নিয়ে তাড়া করবো, ঠিক করলাম।

ফ্রাইডেকে আসতে ইশারা করে দৌড়ে গেলাম একটা ক্যানোর কাছে। ক্যানোটার ভেতর তাকাতেই আশ্চর্য হয়ে গেলাম: স্প্যানিশটার মতো হাত পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে আরেকজন লোক। জংলী। স্প্যানিশটাকে প্রথম যে অবস্থায় দেখেছিলাম এর অবস্থাও সেরকম। ভয়ে আধমরা হয়ে আছে।

তাড়াতাড়ি হাত পায়ের বাঁধন কেটে দিলাম। দাঁড়ানো তো দূরের কথা একটা কথাও বলতে পারলো না লোকটা। দুর্বোধ্য স্বরে একবার গুঙিয়ে উঠলো শুধু। নির্ঘাত ভেবেছে, হত্যা করার জন্যেই ওর বাঁধন খোলা হয়েছে।

ফ্রাইডে পৌঁছুলো এতক্ষণে। লোকটার সঙ্গে কথা বলে একটু সাহস দিতে বললাম ওকে। পকেট থেকে রামের বোতলটা বের করে দিলাম ওর হাতে জংলীটাকে খাওয়ানোর জন্যে।

ফ্রাইডে দু'হাতে ধরে বসালো লোকটাকে। নিজের দিকে ফেরালো তার মুখ। এরপর যা ঘটলো তার জন্যে মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না আমি। লোকটার মুখের দিকে তাকিয়েই প্রচণ্ড এক চিৎকার করলো ফ্রাইডে। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়লো তার বুকের ওপর। জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে লাগলো গালে। একটু পরপরই তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠছে। তারপর লোকটাকে ছেড়ে দিয়ে নৌকার পাশে দাঁড়িয়ে লাফালো কিছুক্ষণ। আমার দিকে তাকিয়ে নিজের ভাষায় কি যেন বলে চললো অনর্গল। চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে এসেছে। পরমুহূর্তে একবার হাসলো, তারপর আবার গিয়ে জড়িয়ে ধরলো লোকটাকে।

পাগল হয়ে গেল নাকি ফ্রাইডে? অনেকক্ষণ লাগলো ওকে কথা বলার মতো অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে। জিজ্ঞেস করলাম, 'কি হলো, এমন করছো কেন, ফ্রাইডে?'

জবাব শুনে আমারও থ হয়ে যাবার দশা। ফ্রাইডের বাবা লোকটা!

উনিশ

একটু পরপরই ক্যানোটার কাছে যাচ্ছে ফ্রাইডে। বাবার কাছে কিছুক্ষণ

বসে থেকে ফিরে আসছে আবার। কি করবে না করবে বুঝতে পারছে না যেন। একবার গিয়ে বাবার মাথাটা কোলে করে বসে রইলো কিছুক্ষণ। আস্তে নামিয়ে রেখে ফিরে এলো আবার। একটু পরেই আবার গিয়ে ডলে দিতে লাগলো হাত পায়ের বাঁধনের জায়গাগুলো। এখনো ঠিকমতো জ্ঞান ফেরেনি লোকটার।

স্প্যানিশটারও এক অবস্থা। উত্তেজনা আর আক্রোশের বশে কিছুটা ছুটাছুটি করেছিলো লড়াইয়ের সময়। এখন নেতিয়ে পড়েছে একেবারে।

জংলীদের পেছনে ধাওয়া করার ইচ্ছাটা ত্যাগ করেছি। বাপের কাছ থেকে এখন কোনো ভাবেই নড়ানো যাবে না ফ্রাইডেকে। উচিতও নয় কাজটা। দৃষ্টিসীমার প্রায় বাইরে চলে গেছে জংলীদের ক্যানোটা। ভাগ্য ভালো, সত্যি সত্যিই আমরা ওদের অনুসরণ করতে শুরু করিনি। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই ভয়ানক ঝড় উঠলো। অনুসরণের চেষ্টা করলে নিঃসন্দেহে আর ফিরে আসতে পারতাম না দ্বীপে। জংলীরাও ক্যানো নিয়ে নিজেদের উপকূল পর্যন্ত পৌঁছুতে পেরেছে কিনা সন্দেহ।

যাহোক, ফ্রাইডের কাছে ফিরে আসি আবার। বাপকে খাওয়ানোর জন্যে একটুকরো রুটি এবং কয়েক থোকা কিশমিশ দিলাম ওকে। কাজে লাগতে পারে ভেবে একটা থলেয় করে খাবারগুলো নিয়ে এসেছিলাম আমি। ফ্রাইডে খাবারগুলো নিয়ে গেল বাপের কাছে। পরমুহূর্তে দেখি প্রচণ্ড বেগে দৌড়ে চলেছে ও। চিৎকার করে ডাকলাম আমি। কিন্তু থামলো না ও। একটু পরেই চলে গেল দৃষ্টির আড়ালে।

মিনিট পনেরো পরেই ফিরে এলো ফ্রাইডে। হাতে একটা পানির পাত্র। এতক্ষণে বুঝলাম ব্যাপারটা। পানি আনতে বাড়ি গিয়েছিলো। পিপাসায় খুবই কাতর হয়ে পড়েছে ওর বাবা। ঢক ঢক করে বেশ খানিকটা পানি খেয়ে নিলো বুড়ো।

ফ্রাইডেকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম আর পানি আছে কিনা।

'আছে,' বললো ও।

স্প্যানিশটাকে দিতে বললাম বাকিটুকু। একটা গাছের ছায়ায় বসে বিশ্রাম নিচ্ছে লোকটা। আমি উঠে গেলাম তার কাছে। একেও দিলাম একটা রুটি আর কিছু কিশমিশ। কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালো সে। উঠে দাঁড়াতে গেল। কিন্তু পারলো না। পায়ের গোছা দুটো ফুলে গেছে তার। এই পা নিয়ে কিভাবে অতটা ছুটাছুটি করলো তখন ভেবে অবাক না হয়ে পারলাম না। উঠতে নিষেধ করলাম লোকটাকে। ফ্রাইডেকে ডেকে ওর বাবার এবং স্প্যানিশটার হাত পা রাম দিয়ে মালিশ করে দিতে বললাম।

কিছুক্ষণের ভেতরেই একটু সুস্থ দেখাতে লাগলো দুজনকে। ফ্রাইডের কাঁধে ভর দিয়ে নৌকা পর্যন্ত যেতে বললাম স্প্যানিশ লোকটাকে। নৌকায় করে আমাদের ছোট্ট খাঁড়িটায় যাবো সেখান থেকে যাবো আস্তানায়। ক্লান্ত অবসন্ন লোক দু'টোকে অনেক কম হাঁটতে হবে তা হলে।

কাঁধে ভর দিয়ে কতক্ষণ ধরে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে নৌকা পর্যন্ত যাবে—অত ধৈর্য ধরার সময় নেই ফ্রাইডের। সোজা পিঠে তুলে নিলো লোকটাকে। নৌকার কাছে

গিয়ে সাবধানে পিঠ থেকে নামিয়ে বসিয়ে দিলো বাপের পাশে।

কি করতে হবে বুঝিয়ে দিলাম ফ্রাইডেকে। ক্যানো ছেড়ে দিলো ও। চলতে লাগলো উপকূলের ধার ঘেঁষে। এত দ্রুত বৈঠা চালাচ্ছে যে, আমি হেঁটে তাল রাখতে পারলাম না ওর সাথে। হাঁটা পথে খাঁড়ি পর্যন্ত পৌছানোর আগেই দেখি ফ্রাইডে নৌকা নিয়ে পৌঁছে গেছে সেখানে। লোক দুটোকে নৌকায় রেখেই আবার ছুটতে শুরু করেছে ও। আমার পাশ দিয়ে যখন যাচ্ছে তখন জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায় যাচ্ছো?'

'আরো নৌকা নিয়ে আসি,' ছুটতে ছুটতে জবাব দিলো ও।

একটু পরেই দ্বিতীয় ক্যানোটা নিয়ে খাঁড়িতে ফিরে এলো ফ্রাইডে। তারপর প্রথম নৌকা থেকে নামিয়ে আনলো আমাদের অতিথি দু'জনকে। কিন্তু দু'জনের একজনেরও হাঁটার ক্ষমতা নেই। হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো ফ্রাইডে।

চিন্তায় পড়ে গেলাম আমিও। কি করা যায়? বুদ্ধি এলো একটা। ফ্রাইডের সহায়তায় গাছের ডালপালা দিয়ে একটা খাটিয়া তৈরি করে ফেললাম। ফ্রাইডের বাবা এবং স্প্যানিশটাকে তার ওপর বসিয়ে আস্তানা পর্যন্ত বয়ে নিয়ে এলাম। কিন্তু এখন দেয়াল পেরুবো কি করে? দু দু'জন পূর্ণ বয়স্ক মানুষকে ঘাড়ে করে দেয়াল টপকানো এক কথায় অসম্ভব।

আবার ভাবনায় পড়ে গেলাম। লোক দু'টোর যা অবস্থা তাতে কোনো মতেই ওরা মই বেয়ে দেয়ালের ওপর উঠতে পারবে না। লাফ দিয়ে ভেতরে নামা তো আরো অসম্ভব। অনেক চিন্তা ভাবনা করে ঠিক করলাম, ভেতরে নেবো না ওদের। দেয়ালের বাইরে ছোট্ট একটু ফাঁকা জায়গা বেছে নিয়ে একটা তাঁবু খাটিয়ে ফেললাম পালের কাপড় দিয়ে। ভেতর থেকে খড় এনে তার ওপর কম্বল পেতে শুইয়ে দিলাম দুজনকে। যা গরম তাতে গায়ে দেয়ার কিছু লাগার কথা নয়। তবু যদি লাগে মনে করে আরো দুটো কম্বল এনে দিলাম।

এবার খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। অতিথিদের জন্যে, আমাদের জন্যেও। ফ্রাইডেকে বললাম একটা কচি ছাগল জবাই করতে। সঙ্গে সঙ্গে কাজে লেগে গেল ফ্রাইডে।

ঝোল তরকারি রান্না হলো। একটু চেখে দেখলাম—চমৎকার। একটা পাত্রে বেশ খানিকটা ঝোল এবং মাংস ঢেলে নিয়ে গেলাম নতুন তাঁবুতে। ফ্রাইডেকে বললাম গুহা থেকে হাল্কা-ছোট একটা টেবিল নিয়ে আসতে। খাবার দিলাম অতিথিদের। ফ্রাইডে এবং আমিও বসলাম খেতে। খাওয়ার পাশাপাশি আলাপ চললো। দোভাষীর কাজ করতে লাগলো ফ্রাইডে। ফ্রাইডের বাবা তো বটেই, স্প্যানিশটাও জংলীদের ভাষা ভালোই বোঝে।

খাওয়া দাওয়ার পর ফ্রাইডেকে বললাম অস্ত্রগুলো গুছিয়ে নিয়ে আসতে। এখনো লড়াইয়ের জায়গায় পড়ে আছে সেগুলো। পরদিন জংলীগুলোর মৃতদেহ এবং ওদের সেই ভয়ানক ভোজের অবশিষ্টাংশ মাটিচাপা দিয়ে আসতে বললাম। নিখুঁত ভাবে কাজটা করলো ও। আমি যখন গেলাম তখন হাড়গোড়, পোড়া মাংসের কোনো চিহ্নই আর নেই সেখানে।

এবার নিশ্চিন্ত মনে একটু আলাপ করা যায় অতিথিদের সাথে। পালিয়ে

যাওয়া জংলী ক'টা আমাকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। দলবল নিয়ে ওদের ফিরে আসার সম্ভাবনা আছে কিনা ফ্রাইডেকে জিজ্ঞেস করতে বললাম ওর বাবার কাছে। জবাবে ফ্রাইডের বাবা যা বললো তার মর্মার্থ হলো, তার বিশ্বাস কাল যে ঝড় উঠেছিলো তাতেই ডুবে গেছে ওদের নৌকা।

'যদি না ডুবে থাকে?' জিজ্ঞেস করলাম আমি। 'যদি ওরা নিরাপদে তীরে পৌঁছে থাকে?'

ফ্রাইডে তর্জমা করে বোঝালো তার বাবাকে।

'ঠিক জানি না,' বললো লোকটা। 'তবে যেরকম ভয় পেয়েছে ওরা–বিশেষ করে এ শব্দ আর আগুন দেখে–তাতে আমার মনে হয় দেশে ফিরে গিয়ে ওরা বলবে বজ্র আর বিদ্যুতের আঘাতে মারা গেছে দলের অন্যরা। ফ্রাইডে আর আপনার হাতে এ আগুনঝরা অস্ত্র দেখে ওরা ভেবেছে আপনারা মানুষ নন স্বর্গীয় আত্মা অথবা অভিশাপ। ওদের ধ্বংস করতে নেমে এসেছেন আকাশ থেকে।'

'ওরা যে এমন ভেবেছে তা কি করে বুঝলো তোমার বাবা, জিজ্ঞেস করো তো।'

'আতঙ্কে চিৎকার করতে করতে ওরা নিজেদের ভেতর বলাবলি করছিলো এসব।'

বৃদ্ধ জংলীটার কথাই সত্য হলো। এরপর আর একবারও মানুষখেকোদের চেহারা দেখা যায়নি দ্বীপে। আমার ধারণা বেঁচে গিয়েছিলো জংলী চারজন আর তারা প্রচার করে দিয়েছিলো, যে আসবে এই দ্বীপে ঈশ্বরের ছুঁড়ে দেয়া আগুনে মরতে হবে তাকে।

মূল ভূখণ্ডের দিকে রওনা হওয়ার কথা ভাবতে লাগলাম আবার। স্প্যানিশ লোকটার কাছ থেকে জানা গেল ওখানে আরো ষোল জন স্প্যানিশ আর পর্তুগীজ রয়েছে। প্রাণ বাঁচানোর জন্যে মানবেতর জীবন যাপন করতে হচ্ছে তাদের। জংলীদের সাথে থেকে থেকে ওরাও প্রায় জংলী হয়ে গেছে। কয়েকটা বন্দুক আছে বটে কিন্তু কোনো কাজে লাগছে না সেগুলো। কারণ বারুদ বা গুলি কিছুই নেই ওদের কাছে।

আমি যা ভেবেছিলাম তা-ই; ঝড়ের রাতে ডুবো পাহাড়ের সাথে ধাক্কা লেগে বিধ্বস্ত হওয়া সেই স্প্যানিশ জাহাজের নাবিক ওরা। জাহাজভর্তি রূপো নিয়ে রিও ডি প্লাটা থেকে হাভানায় যাচ্ছিলো। আরেকটা বিধ্বস্ত জাহাজ থেকে পাঁচজন পর্তুগীজ নাবিককে উদ্ধার করেছিলো ওরা। সেই পর্তুগীজ পাঁচজনও ছিলো জাহাজে। পরে যখন ওদের নিজেদের জাহাজই বিধ্বস্ত হলো তখন কোনোমতে একটা নৌকায় চেপে রওনা হয় সবাই। আমার আগুন দেখতে পেয়ে এই দ্বীপের দিকেই আসার চেষ্টা করে ওরা কিন্তু বাতাস ওদের তাড়িয়ে নিয়ে যায় জংলীদের উপকূলের দিকে।

তারা কখনো পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে কিনা বা পালানোর চেষ্টা করলে কোনো বিপদের সম্ভাবনা আছে কিনা জিজ্ঞেস করলাম। জবাবে লোকটা বললো, এ নিয়ে অনেক আলাপ-আলোচনা করেছে ওরা। কিন্তু আলাপ-আলোচনাতেই সীমাবদ্ধ থেকে গেছে সব। সাগর পাড়ি দেয়ার মতো কোনো জলযান নেই ওদের,

এমন কোনো যন্ত্রপাতিও নেই যা দিয়ে তেমন একটা কিছু বানিয়ে নিতে পারে।

আমার কাছ থেকে যদি পালানোর মতো যুক্তিসঙ্গত প্রস্তাব আসে তা হলে কি ভাবে নেবে ওরা, জানতে চাইলাম। বললাম ওরা সবাই যদি এখানে চলে আসতে পারে তা হলে হয়তো অসম্ভব হবে না ব্যাপারটা। তবে একটা কথা আছে–খোলাখুলিই আমি বললাম কথাটা, ওরা সবাই এখানে এসে পড়ার পর আমার প্রতি ওদের আচরণ কেমন হবে সে ব্যাপারে আমার সংশয় আছে। হয়তো এখানে পৌঁছেই দুর্ব্যবহার শুরু করবে আমার সাথে। সেটাই আমার সচেয়ে বড় ভয়। মুক্তি পেয়েই যদি আমাকে বন্দী করে নিউ স্পেনে নিয়ে যায়, আমার জন্যে তার চেয়ে খারাপ আর কিছু হবে না। নিউ স্পেনের লোকেরা একজন ইংরেজকে হাতে পেলে কি করবে তা ভালোই জানা আছে আমার। যে কারণে আর যে পরিস্থিতিতেই সেখানে গিয়ে পড়ুক না কেন, নির্ঘাত বলি হতে হবে তাকে। তার চেয়ে জংলীদের কাছে আত্মসমর্পণ করে ওদের খাদ্য হওয়াই পছন্দ করবো আমি। সঙ্গে সঙ্গে এটাও জানাতে ভুললাম না, ওরা সবাই যদি এখানে এসে আমার আনুগত্য স্বীকার করে নেয় তাহলে সবাই মিলে সবার মুক্তির একটা পথ করে নেয়া যাবে। এতগুলো হাতের মিলিত চেষ্টায় নিশ্চয়ই একটা সমুদ্রগামী জলযান তৈরি করা সম্ভব হবে। সেটায় করে ব্রাজিল অথবা উত্তরের কোনো স্প্যানিশ উপকূলে হয়তো পৌঁছাতে পারবো আমরা। কিন্তু তার পরে ওরা যে রুখে দাঁড়িয়ে সব অস্ত্রশস্ত্র দখল করে আমাকে আর ফ্রাইডেকে বন্দী করে বসবে না তার নিশ্চয়তা কোথায়?

জবাবে স্প্যানিশটা বললো, অবস্থা এমন শোচনীয় পর্যায়ে পৌঁছেছে যে এ ধরনের আচরণের কথা মনেও আসবে না ওদের। তা ছাড়া আমি চাইলে, বুড়ো জংলীটাকে নিয়ে সে যেতে পারে এ ব্যাপারে ওদের সাথে আলাপ করতে। জবাব নিয়ে ও ফিরে আসবে আবার। দরকার হলে আমার নেতৃত্ব মেনে নেয়ার শপথ নিতে বলবে ওদের। গসপেল ছুঁয়ে ওরা প্রতিজ্ঞা করবে–আমার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত থাকবে এবং আমার পছন্দমতো যে কোনো খ্রীষ্টান অধ্যুষিত দেশে যেতে স্বীকার করবে।

এর পর লোকটা নিজেই আমার সামনে প্রতিজ্ঞা করলো, কখনো আমার অবাধ্য হবে না এবং ওর দেশোয়ালী ভাইরা যদি শপথ ভঙ্গ করে আমার বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তাহলে দেহে শেষ রক্ত বিন্দু থাকা পর্যন্ত সে আমার পক্ষে থাকবে।

আমাকে দুশ্চিন্তা করতে বারণ করলো লোকটা। জানালো, নাবিকদের সাধারণ দু'একটা যে দোষ থাকে তা ছাড়া লোকগুলো এমনিতে ভালো, সৎ। তাছাড়া এখন যে বিপদে পড়েছে! খাবার নেই, কাপড় নেই, অস্ত্র নেই, পুরোপুরি জংলীদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করছে ওদের জীবন। 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, এই অবস্থা থেকে যদি ওদের মুক্তি দিতে পারেন, আপনার কেনা গোলাম হয়ে থাকবে সবাই।'

এ সব শোনার পর একটু ভরসা পেলাম আমি। ফ্রাইডের বাবাকে নিয়ে মূল ভূ-খণ্ডের দিকে রওনা হয়ে যেতে বললাম স্প্যানিশটাকে। নৌকা সাজিয়ে দিলো

ফ্রাইডে। পথে খাওয়ার জন্যে এবং মূল ভূ-খণ্ডে পৌঁছে অন্য স্প্যানিশদের দেওয়ার জন্যে প্রচুর খাবার দিয়ে দিলাম ওদের সাথে।

বিশ

দেখতে দেখতে চলে গেল আটটা দিন। এখনো আসেনি স্প্যানিশরা। এক দিন ভোরে–তখনো ঘুমিয়ে আছি আমি–চিৎকার করতে করতে দৌড়ে এলো ফ্রাইডে, 'মাস্টার, মাস্টার, ওরা আসে, ওরা আসে।'

ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম আমি। বাইরে এসে দেখলাম একটা নৌকা আসছে তীরের দিকে। ছোট একটা পাল। অর্ধেক গোটানো। কিন্তু মূল ভূ-খণ্ড যেদিকে সেদিক থেকে আসছে না নৌকাটা।

'ভেতরে চলে এসো, ফ্রাইডে!' বললাম আমি। 'যাদের আশায় বসে আছি এরা তারা নয়। বুঝতে পারছি না শত্রু না মিত্র।'

দূরবীন নিয়ে পাহাড়ের মাথায় গিয়ে উঠলাম। দরকার হলো না দূরবীনের। খালি চোখেই দেখতে পেলাম, একটা জাহাজ নোঙ্গর করে আছে উপকূল থেকে প্রায় দেড় লিগ দূরে। মনে হলো জাহাজটা ইংল্যাণ্ডের। এ জাহাজ থেকেই আসছে নৌকাটা।

সন্দেহ নেই খুশি হয়েছি জাহাজটা দেখে। ওটা যে ইংল্যাণ্ডের জাহাজ এবং ওতে যে আমার দেশের মানুষ রয়েছে তা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। কিন্তু তবু কেন যেন সংশয়মুক্ত হতে পারছি না। কেমন একটা সন্দেহের দোলায় দুলছে মন। অস্বাভাবিক কিছু একটা আছে এ জাহাজে এবং নৌকায়। প্রথমত, দুনিয়ার আর জায়গা ফেলে এখানে আসবে কেন ইংল্যাণ্ডের জাহাজ? ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক আছে এমন কোনো দেশে যাওয়া-আসার কোনো সমুদ্রপথ নেই এ জায়গার আশেপাশে। জাহাজটাকে তাড়িয়ে আনতে পারে এমন কোনো ঝড়ও হয়নি গত দু-তিন দিনে। তাহলে?

তীরে এসে ভিড়লো নৌকা। হ্যাঁ, ইংরেজই ওরা–অন্তত বেশির ভাগ। মোট এগারো জন। তিনজন বাদে সবাই সশস্ত্র। যদিও আগ্নেয়াস্ত্র নেই সবার হাতে, তবে ছোরা-ছুরি আছে। নিরস্ত্র তিনজনের হাত পিছমোড়া করে বাঁধা। কেন?

সশস্ত্র লোকগুলো লাফিয়ে নামলো তীরে। বন্দী তিনজনকে নামালো। এখনো কিছু বুঝতে পারছি না আমি। পাশ থেকে ফ্রাইডে বলে উঠলো, 'ও মাস্টার! দেখেন, সাদা মানুষরাও জংলী মানুষের মতো বন্দীদের খায়।'

'কেন, ফ্রাইডে,' বললাম আমি, 'ওরা ওদের খাবে একথা মনে হলো কেন তোমার?'

'হ্যাঁ, খাবে ওরা।'

'না, ফ্রাইডে, না। ওরা খাবে না। কিন্তু আমার সন্দেহ হচ্ছে বন্দী তিনজনকে খুন করবে ওরা।'

নিরস্ত্র লোক তিনটেকে নিয়ে কি করে অস্ত্রধারী লোকগুলো দেখার জন্যে

দাঁড়িয়ে রইলাম। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছে এই বুঝি খুন করলো বন্দীগুলোকে। কিন্তু না, লোক তিনটিকে খুন করলো না ওরা। ডাঙার ওপর নামিয়ে দিয়ে ঘুরে ফিরে বেড়াতে লাগলো। দ্বীপটার হাল হকিকত দেখতে চায় বোধহয়। দুজন নৌকার ওপর গিয়ে বসলো পাহারা দেয়ার জন্যে।

অনেকটা সময় পেরিয়ে গেছে। নৌকায় বসা লোক দুজন ঘন ঘন ব্রাণ্ডির বোতলে চুমুক দিচ্ছে। বাকি সবাই অদৃশ্য হয়েছে সৈকতের ওপর থেকে। যখন ওরা তীরে নামে তখন ভরা জোয়ার ছিল, এখন ভাটা লাগতে শুরু করেছে। দ্রুত নেমে যাচ্ছে পানি। একটু পরেই ডাঙায় ঠেকে গেল নৌকা।

পুরোপুরি মাতাল হয়ে গেছে পাহারাদার দুজন। নৌকাটা ডাঙায় ঠেকে যেতেই হুঁশ ফিরলো একজনের। হাউমাউ করে জাগিয়ে তুললো অন্যজনকে। এবার দুজনের সম্মিলিত চিৎকার। হাঁ হাঁ করতে করতে ছুটে এলো বেড়াতে বেরুনো লোকগুলো। নৌকাটার দুরবস্থা দেখে দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর সবাই মিলে লাগলো কোমর বেঁধে। ঠেলে নামাবে পানিতে। কিন্তু অনেক ওজন নৌকাটার। নড়লো না এক চুল।

এই অবস্থায় আবার কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো ওরা। তারপর একে একে দলছুট হতে শুরু করলো। একটু পরে দেখা গেল একজনও নেই জায়গাটায়। পাহারাদার দুজনও না!

বন্দী তিনজনের হাত বাঁধা হয়েছে শুধু। পাগুলো খোলাই আছে। তার মানে ইচ্ছে করলে যে কোনো জায়গায় যেতে পারে তারা। কিন্তু সে রকম কোনো আগ্রহ দেখা গেল না তাদের ভেতর। পোশাক আশাক আর চেহারা দেখে সম্ভ্রান্ত মনে হচ্ছে। তাহলে বন্দী কেন?

নেমে এলাম পাহাড় থেকে। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি, নিরস্ত্র লোক তিনটেকে বাঁচাতে হবে। প্রয়োজন হলে লড়বো। তবে অবশ্যই আগের চেয়ে সাবধানে করতে হবে যা করার। এরা জংলী নয় যে গুলির শব্দেই পালাবে। বন্দুক আর পিস্তলগুলোয় গুলি ভরাই আছে। দ্রুত হাতে কোমরে দুটো পিস্তল গুঁজে কাঁধে তুলে নিলাম দুটো বন্দুক। তলোয়ারটাও ঝোলালাম কোমরে। ফ্রাইডেকে দিলাম তিনটে বন্দুক। তারপর এগোলাম সৈকতের দিকে।

দেয়ালের বাইরে ঘন জঙ্গলটার শেষ মাথায় পৌঁছে একটা গাছের আড়াল থেকে উঁকি দিলাম। সশস্ত্র লোকগুলোর এক জনকেও দেখতে পেলাম না আশপাশে। বেরিয়ে এলাম জঙ্গলের ভেতর থেকে।

প্রায় নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছি আমি। আমার ঠিক পেছনেই ফ্রাইডে। ও-ও চেষ্টা করছে যথাসম্ভব নিঃশব্দে হাঁটতে। ঝোপ-ঝাড় আর বালি বা পাথরের ঢিবির আড়ালে আড়ালে থেকে পৌঁছে গেলাম লোকগুলোর কাছে। শেষ ঢিবিটার আড়াল থেকে যখন বেরিয়ে এলাম তখনো ওরা দেখেনি আমাকে। শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনারা কারা?'

ভয়ানক চমকে আমার দিকে ফিরলো তিনজন। নিজেদের চোখকেও যেন বিশ্বাস করতে পারছে না তারা। মনে হয় আমার পোশাকই ওদের হকচকিয়ে দিয়েছে বেশি। ছাগলের চামড়ার কোট, পাতলুন, টুপি পরে আছি আমি। লম্বা

লম্বা দাড়ি গোঁফে ঢাকা পড়ে গেছে মুখের বেশির ভাগ।

কোনো কথা সরলো না লোকগুলোর মুখে। আমিই আবার বললাম, 'আমাকে দেখে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। অপ্রত্যাশিত হলেও, আমি বন্ধু আপনাদের।'

'নিশ্চয়ই স্বর্গ থেকে প্রেরিত,' শুকনো মুখে বললো একজন। 'আমাদের যা অবস্থা তাতে একজন বা দুজন লোকের সাহায্য কোনো কাজে আসবে না।'

'অত নিরাশ হওয়ার কিছু নেই, ভাই। ঈশ্বর যার সহায় তার কোনো ক্ষতি কেউ করতে পারে না। দেখে মনে হচ্ছে বিপদে পড়েছেন আপনারা। আমাকে খুলে বলুন, দেখি কোনো সাহায্য করতে পারি কি না।'

দুচোখ থেকে জলের ধারা নামলো লোকটার। কথা বলতে পারলো না অনেকক্ষণ। আবেগে কাঁপছে একটু একটু। 'আমি কি ঈশ্বরের সাথে কথা বলছি না মানুষের সাথে?' বললো সে। 'আপনি মানুষ না ফেরেশতা?'

'না ভাই, আমি ঈশ্বরও নই, ফেরেশতাও নই। আপনাদের মতোই মানুষ। ইংরেজ। বুঝতে পারছি আপনারা বিপদে পড়েছেন। আমি সাহায্য করতে চাই আপনাদের। আমরা মাত্র দুজন যদিও, কিন্তু অস্ত্র আছে আমাদের, আছে গুলি-বারুদ। নির্ভয়ে খুলে বলুন সব কথা। কি হয়েছে আপনাদের?'

'সে লম্বা কাহিনী। অনেক সময় লাগবে বলতে। খুনীগুলো এত কাছে রয়েছে যে কি বলবো, বুঝতে পারছি না। সংক্ষেপে এটুকুই বলতে পারি, আমি এ জাহাজের ক্যাপ্টেন। আমার নাবিকরা বিদ্রোহ করে বন্দী করেছে আমাকে আর এই দুজনকে। এ হচ্ছে আমার মেট আর উনি একজন যাত্রী। প্রথমে আমাদের খুন করতেই চেয়েছিলো ওরা। পরে হঠাৎ এই দ্বীপটা দেখতে পেয়ে এখানে নামিয়ে দিয়েছে। ভেবেছে, এই নির্জন দ্বীপে অনাহারে মরবো আমরা। আর যদি না-ও মরি, সভ্য সমাজে ফিরে গিয়ে ওদের দুষ্কৃতির কথা কাউকে জানাতে পারবো না কোনোদিন।'

'কোথায় গেছে বর্বরগুলো, বলতে পারেন?'

'এ তো ওখানে ঘুমোচ্ছে।' ছোট্ট একটা ঝোপ ঝোপ মতো জঙ্গলের দিকে ইশারা করলেন ক্যাপ্টেন। 'আপনারা এই দ্বীপে আছেন তা জানতে পারলে ওরা নির্ঘাত খুন করে ফেলবে আমাদের। আপনারাও হয়তো রেহাই পাবেন না।'

'আগ্নেয়াস্ত্র আছে ওদের কাছে? ক'টা?'

'জাহাজে অনেকই আছে। তবে সাথে এনেছে দুটো।'

'বেশ বেশ। বাকীটা তা হলে আমার ওপর ছেড়ে দিতে পারেন। ওরা সব ঘুমিয়ে আছে, সহজেই ওদের মেরে ফেলতে পারি এখন। কিন্তু তা না করে ওদের বন্দী করলে কেমন হয়?'

ক্যাপ্টেন জানালেন, 'ওদের মধ্যে দু'জন অত্যন্ত মারাত্মক চরিত্রের। ও দু'জনকে ক্ষমা করার কোনো অর্থ হয় না। এ দু'জনকে অন্যদের থেকে আলাদা করে ফেললে আমার বিশ্বাস, বাকিরা আবার আমার পক্ষে চলে আসবে।'

'ঠিক আছে, আপনি শুধু দেখিয়ে দেবেন কোন দু'জন।'

'কিন্তু এত দূর থেকে কি করে দেখাবো। আর, কাছে গেলেই তো জেগে যাবে।'

'তা হলে আরেকটু ওপাশে সরে যাই চলুন। ওরা না জাগা পর্যন্ত অপেক্ষা করবো। তারপর দেখা যাক কি করা যায়।'

ফাঁকা সৈকতের ওপর থেকে সরে এলাম আমরা। এখন আর আমাদের কথা শুনতে পাবে না দস্যুগুলো।

এবার বললাম, 'দেখুন, আপনাদের মুক্তির উপায় করবো আমি। কিন্তু দুটো শর্ত আছে।'

'দুটো কেন, দুশোটা শর্ত হলেও রাজি,' বললেন ক্যাপ্টেন। 'একবার এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেলে হয়, আমার জাহাজের সম্পূর্ণ নেতৃত্ব তুলে দেবো আপনার হাতে।'

'তার কোনো দরকার হবে না। আমার শর্ত দুটো মানলেই চলবে। প্রথমত, যতক্ষণ এ দ্বীপে থাকবেন ততক্ষণ আমার নির্দেশ মেনে চলতে হবে; এব্যাপারে কোনো রকম দ্বিধা থাকলে চলবে না। আর দ্বিতীয়ত, আপনার জাহাজটা যদি বিদ্রোহীদের কবল থেকে উদ্ধার করা যায় তাহলে আমাকে এবং আমার এই সঙ্গীকে বিনা ভাড়ায় নিয়ে যেতে হবে ইংল্যাণ্ড পর্যন্ত।'

বিন্দুমাত্র ইতস্তত না করে রাজি হয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন।

ওদের তিনজনকে তিনটে বন্দুক দিলাম। তারপর বসলাম পরামর্শ করতে। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হলো, ক্যাপ্টেন তার দুই সঙ্গী সশস্ত্র হয়ে লোকগুলোর কাছে যাবেন। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। আমি আর ফ্রাইডে থাকবো পেছনে।

ইতিমধ্যে ওদের দু'একজনের ঘুম ভেঙেছে। দেখতে পাচ্ছি না এখান থেকে, তবে টুকরো টুকরো কথা ভেসে আসছে কানে। একটু পরেই দু'জনকে দেখতে পেলাম আমরা। ওদের ভেতর মারাত্মক দু'জনের কেউ আছে কিনা জিজ্ঞেস করলাম।

'না,' বললেন ক্যাপ্টেন।

'তা হলে ছেড়ে দিন এ দু'জনকে।' ভাগ্যই বোধহয় ঘুম থেকে জাগিয়ে বাঁচিয়ে দিলো ওদের। 'এবার এগোন,' বললাম আমি, 'কিন্তু সাবধান! অন্য লোকগুলো যেন পালাতে না পারে।'

ঘুমন্ত লোকগুলোর দিকে এগোল তিনজন। সঙ্গী দুজন সামনে, ক্যাপ্টেন পেছনে। আরো পেছনে আমি আর ফ্রাইডে। দেখতে পাচ্ছি মাটিতে শুয়ে থাকা লোকগুলোকে। সামনের দু'জনের কেউ বোধহয় শব্দ করেছিলো একটু। ঘুম ভেঙে উঠে বসলো একজন নাবিক। ক্যাপ্টেন আর তার সঙ্গী দু'জনকে আসতে দেখে চিৎকার করে জাগালো অন্যদের। কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে অনেক। গুলি ছুঁড়েছে ক্যাপ্টেনের সঙ্গী দুজন। নিখুঁত লক্ষ্যভেদ। বিদ্রোহের নেতাদের একজন মারা গেল সঙ্গে সঙ্গে। আহত হলো অন্যজন। ভয়ানক শক্ত জান লোকটার। মারাত্মক আহত হয়েও দমেনি, চিৎকার করে সাহায্য চাইছে অন্যদের কাছে। উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে।

এবার এগিয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন। 'চিল্লাচিল্লি করে লাভ হবে না, বাছা। ঈশ্বরের নাম নাও।' বলতে বলতে বন্দুকের বাঁট দিয়ে প্রচণ্ড এক বাড়ি মারলেন লোকটার মাথায়। এরপর আর কখনো কথা বলেনি লোকটা।

এবার আমি আর ফ্রাইডে পৌছুলাম ঘটনাস্থলে। দলের অন্য লোকগুলো ইতিমধ্যে বুঝে ফেলেছে গতিক সুবিধার নয়। কোনো রকম বাদ-প্রতিবাদে না গিয়ে মাফ চেয়ে বসলো ক্যাপ্টেনের কাছে।

ক্যাপ্টেন বললেন, 'যদি প্রতিশ্রুতি দাও জীবনে আর কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করবে না এবং আমার বিশ্বস্ত থেকে জাহাজ উদ্ধারে সাহায্য করবে তা হলে মাফ করতে পারি।'

হাত জোড় করে প্রতিজ্ঞা করলো লোকগুলো, আর কখনো করবে না অমন কাজ। ইতিমধ্যে ফ্রাইডে আর ক্যাপ্টেনের মেটকে আমি পাঠিয়ে দিয়েছি নৌকাটার কাছে। ওটা ঠিকমতো আছে কিনা দেখে পাল আর দাঁড়গুলো নিয়ে আসবে।

একটু পরে সঙ্গীদের থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া সেই দু'জনও ফিরে এলো। গুলির শব্দ শুনে ব্যাপার কি জানতে এসেছিলো তারা। এখন ঘটনা দেখে তো চোখ ছানাবড়া। সঙ্গে সঙ্গে আত্মসমর্পণ করলো ওরাও। বিজয় সম্পূর্ণ হলো আমাদের।

আলাপ করতে বসেছি আমি আর ক্যাপ্টেন। গড়গড় করে বলে গেলাম আমার আটাশ বছরের ইতিহাস। চমৎকৃত হয়ে শুনলেন ক্যাপ্টেন আর তাঁর দুই সঙ্গী। গল্প যখন শেষ হলো তখন একজনেরও মুখে কথা সরছে না।

আমার সাধের আস্তানায় নিয়ে এলাম তাঁদের। সাধ্যমতো খাতির যত্ন করলাম। খেতে দিলাম যবের রুটি, মাংস আর কিশমিশ। দেখালাম আমার সমস্ত ধন সম্পদ। বললাম আমার গ্রামের বাড়ির কথা। নিঃসঙ্গ একটা লোক জীবনের প্রায় অর্ধেক সময় কি কঠোর সংগ্রাম করেছে বেঁচে থাকার জন্যে তা দেখে, শুনে চোখ বড় বড় হয়ে গেল তাঁদের।

এবার জাহাজটা উদ্ধার করার কথা ভাবতে হবে আমাদের। ক্যাপ্টেন জানালেন, এখনো তেরজন লোক রয়েছে জাহাজে। ওদের হাত থেকে জাহাজটা উদ্ধার করা একটু মুশকিলই হবে। বিদ্রোহের আসল নায়ক সারেং এখনো রয়েছে জাহাজে। সহজে বোকা বানানো যাবে না লোকটাকে। আমরা মোট পাঁচজন—ক্যাপ্টেন, তার দুই সঙ্গী, আমি আর ফ্রাইডে। বন্দী নাবিক ক'জনকে কোনো কাজে লাগানো যাবে না আপাতত। ক্যাপ্টেন বা আমি, কেউই এখনো পুরোপুরি বিশ্বাস করে উঠতে পারছি না ওদের। পাঁচজনে মিলে তেরজনের হাত থেকে একটা জাহাজ উদ্ধার করা সোজা কথা নয়।

অনেকক্ষণ পর আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা, দ্বীপে যারা এসেছিলো তারা সময়মতো জাহাজে ফিরে না গেলে কি করবে ওরা? খোঁজখবর করতে আসবে নিশ্চয়ই?'

'হ্যাঁ মনে হয়,' বললেন ক্যাপ্টেন।

'তা হলে আপাতত অপেক্ষা ছাড়া আর কিছু করবো না আমরা। সৈকতের ওপর আপনাদের নৌকায় যে সব জিনিসপত্র আছে সেগুলো নিয়ে আসবো এখানে। নৌকাটা নিয়ে যেন ভাগতে না পারে সে জন্যে ওটার খোলে ফুটো করে দিতে হবে। তারপর ওরা এলে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা হবে।'

আমার কথায় রাজি হলেন ক্যাপ্টেন। পরিকল্পনা মতো নৌকা থেকে সব জিনিসপত্র–দাঁড়, মাস্তুল, পাল, হাল, বিদ্রোহী নাবিকদের আনা খাবার-পানীয় সব নিয়ে এলাম আমার গুহায়। এবার অপেক্ষার পালা।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেল। উৎকণ্ঠা নিয়ে বসে আছি, কিন্তু কিছুই ঘটছে না। কতক্ষণ সহ্য করা যায় এরকম উৎকণ্ঠা? অপেক্ষা করতে করতে অস্থির হয়ে পড়েছি সবাই। এমন সময় একটা গুলির শব্দ হলো জাহাজ থেকে। দ্বীপে আসা নাবিকদের ফিরে যাওয়ার সঙ্কেত দিচ্ছে। জাহাজের পেছনের পতাকাটা নড়লো কিছুক্ষণ। তীর থেকে কোনো নৌকা রওনা হলো না দেখে আবার কয়েকটা গুলি ছুঁড়লো ওরা।

শেষ পর্যন্ত ওদের কোনো সঙ্কেতে যখন কাজ হলো না, আরেকটা নৌকা নামালো ওরা। দূরবীন দিয়ে দেখলাম, এক এক করে দশজন লোক নামলো নৌকাটায়। প্রত্যেকে সশস্ত্র। দাঁড় টেনে আসতে লাগলো উপকূলের দিকে।

জাহাজ এবং তীরের মাঝামাঝি এখন নৌকাটা। পাহাড়ের ওপর থেকে লক্ষ করছি আমরা। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি লোকগুলোর চেহারা। ক্যাপ্টেনের হাতে দিলাম দূরবীনটা। ভদ্রলোক জানালেন, ওদের মধ্যে তিনজন ভালো লোক আছে। নিছক প্রাণ বাঁচানোর জন্যে যোগ দিয়েছে বিদ্রোহীদের সাথে।

জাহাজের সারেং নেতৃত্ব দিচ্ছে দলটার। বিদ্রোহের মূল নায়ক সে-ই। অন্যরা জাহাজের সাধারণ নাবিক। পানি যেদিকে গড়ায় ওরাও সেদিকে যাবে। আমরা জাহাজটা পুনর্দখল করতে পারলে হয়তো ওরা আবার চলে আসবে ক্যাপ্টেনের পক্ষে।

পাহাড় থেকে নেমে এলাম আমরা। মোকাবেলা করতে হবে বিদ্রোহীদের। কিন্তু কি ভাবে, সে সম্পর্কে কিছু ঠিক করে উঠতে পারিনি এখনো। দেখা যাক কি করা যায়।

প্রথমেই চারজন বন্দীকে হাত পা বেঁধে বসিয়ে রাখলাম গুহায়। বিশ্বাস নেই ওদের–ছেড়ে রাখলে আমাদের অবস্থা শোচনীয় দেখে আবার যদি যোগ দেয় বিদ্রোহীদের সাথে? অন্য দুজনের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই ক্যাপ্টেনের। প্রাণ গেলেও এখন ওরা তাঁর পক্ষে থাকবে। সঙ্গে নিলাম এ দু'জনকে। আমি, ফ্রাইডে, ক্যাপ্টেন ও তাঁর দুই সঙ্গী এবং আমাদের পক্ষে চলে আসা দুই বিদ্রোহী–মোট সাতজন আমরা। সবাই সশস্ত্র। নৌকায় করে যারা আসছে ক্যাপ্টেনের কথামতো ওদের মধ্যে যদি তিনজন ভালো লোক থেকে থাকে তাহলে ওরাও সাতজন। সমান সমান। সুতরাং খুব একটা ভয় পাওয়ার কিছু নেই। বেরিয়ে এলাম আস্তানা ছেড়ে। সামনের ছোট বনটার শেষ প্রান্তে গিয়ে দাঁড়ালাম গাছের আড়ালে।

তীরে ভিড়লো বিদ্রোহীদের নৌকা। আগের নৌকাটা যেখানে ভিড়েছিলো ঠিক সেখানে। নামলো লোকগুলো। টেনে হিঁচড়ে সৈকতের উপর তুললো নৌকাটা। তীর থেকে কিছুটা দূরে নোঙ্গর করে রাখেনি দেখে খুশি হয়ে উঠলাম মনে মনে।

নিজেদের নৌকা সৈকতে উঠিয়েই ওরা দৌড়ে গেল অন্য নৌকাটার কাছে। এত দূর থেকেও স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, ভীষণ অবাক হয়েছে ওরা ওটার দুরবস্থা দেখে। হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে আছে সবাই। একটু পরেই অবশ্য সংবিৎ ফিরে

পেলো। চিৎকার করে ডাকতে লাগলো সঙ্গীদের নাম ধরে। কারো কোনো সাড়া না পেয়ে গুলি ছুঁড়ে সঙ্কেত দেওয়ার চেষ্টা করলো ওরা। এবারো কোনো লাভ হলো না।

এরপর লোকগুলো নিজেদের নৌকার কাছে ফিরে গিয়ে নৌকা পানিতে নামানোর তোড়জোড় শুরু করলো। সম্ভবত ফিরে যাচ্ছে ওরা। বোধহয় ধরে নিয়েছে, যে কোনো কারণেই হোক নিখোঁজ হয়েছে ওদের সঙ্গীরা। কিন্তু ফিরে যেতে দেয়া চলবে না। আক্রমণ শুরু করতে হবে এখুনি। ক্যাপ্টেনকে বলতে যাবো কথাটা, এমন সময় দেখি নৌকা নিয়ে ঠেলাঠেলি বন্ধ করেছে ওরা। তিনজনকে নৌকার পাহারায় রেখে বাকি সবাই ফিরে আসছে। সঙ্গীদের খোঁজে দ্বীপের ভেতর দিকে যাবে বোধহয়।

আমাদের সামনে দিয়ে চলে গেল লোকগুলো। ইচ্ছে করলে এখনি গুলি করতে পারি। দমন করলাম ইচ্ছেটা। সঙ্গীদের মরতে দেখে নির্ঘাত পালাবে নৌকায় বসা তিনজন। একবার যদি ওরা জাহাজে গিয়ে উঠতে পারে তাহলে নিঃসন্দেহে পাল তুলে দেবে, সঙ্গীদের কথা ভাবার কোনো প্রয়োজন বোধ করবে না। তার মানে, এতদিন পরে মুক্তির যে উপায়টা আমি পেয়েছি তা বেরিয়ে যাবে হাতের মুঠো থেকে। তা হতে দেয়া যায় না। অপেক্ষা করবো। ওরা ফিরে এলে এক সঙ্গে ধরবো সব ক'জনকে।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে চললো, এখনো খোঁজ নেই বিদ্রোহীদের। কি করে কাবু করা যায় লোকগুলোকে তা নিয়ে নানান রকম পরামর্শ চললো আমাদের। কিন্তু মনমতো হলো না একটাও। তবে একটা ব্যাপারে সবাই একমত হলাম, রাতের আগে কিছু করা ঠিক হবে না। দ্বীপের ভেতর দিকে যাওয়া লোকগুলো যদি রাত নামার আগে ফিরে না আসে তাহলে আরো ভালো। সন্ধ্যার পরপরই অন্ধকারে নৌকার লোকগুলোকে কাবু করে ঘাপটি মেরে বসে থাকবো। আর যদি রাতের আগেই ওরা চলে আসে এবং ফিরে যেতে চায় জাহাজে তাহলে তো নাচার—লড়াই করতেই হবে।

অনেক-অনেকক্ষণ পর ফিরে এলো লোকগুলো। কিন্তু সন্ধ্যা হতে এখনো বেশ দেরি। এখনই যদি ওরা রওনা দেয় তা হলে মুশকিল। এসময় একটা বুদ্ধি খেলে গেল মাথায়। তাড়াতাড়ি ফ্রাইডে এবং ক্যাপ্টেনের মেটকে পশ্চিমের ছোট্ট নদীটার দিকে চলে যেতে বললাম। কি করতে হবে না হবে তা-ও বুঝিয়ে দিলাম সংক্ষেপে। ইতিমধ্যে বিদ্রোহী কজন পৌঁছে গেছে নৌকার কাছে। নৌকা পানিতে নামানোর তোড়জোড় শুরু করেছে।

রওনা হয়ে গেল ফ্রাইডে আর মেট। গাছ-পালা-ঢিবির আড়ালে আড়ালে থেকে কয়েক মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গেল ছোট টিলার মতো একটা জায়গায়।

নৌকা জলে নামানো হয়ে গেছে বিদ্রোহীদের। উঠে বসতে যাবে ওরা, এমন সময় নাবিকদের রীতি মাফিক চিৎকার করে উঠলো ফ্রাইডে আর মেট, 'অহোয়...'

এক সঙ্গে লোকগুলো ফিরে তাকালো খাঁড়ির দিকে। সারেং লোকটা হাত পা নেড়ে কি যেন বললো নৌকায় বসা তিনজনকে। একজন নেমে যোগ দিলো

তাদের সঙ্গে। বাকি দুজন নৌকা নিয়ে এগিয়ে আসতে লাগলো খাঁড়ির দিকে। শব্দ লক্ষ্য করে ছুটতে শুরু করলো সারেং ও তার দল। ইতিমধ্যে কিছু দূরে আরেকটা টিলার কাছে সরে গেছে ফ্রাইডেরা। বিদ্রোহী ক'জন আগের টিলার কাছে পৌঁছুতেই আবার চিৎকার করে উঠলো ওরা, 'অহোয়··

আবার ছুটলো নাবিকগুলো। আবার জায়গা বদলে চিৎকার করলো ফ্রাইডে আর মেট। একটু পরেই আমাদের চোখের আড়ালে চলে গেল ওরা।

এদিকে অন্য দুজন নৌকা নিয়ে এসেছে খাঁড়ির মুখে। এগিয়ে আসছে ভেতর দিকে। জোয়ারের তোড়ে অল্প সময়ের মধ্যেই নৌকা বেশ খানিকটা এগিয়ে এলো। নৌকা ভেড়ালো ওরা। একজন নেমে এলো তীরে, অন্যজন রইলো নৌকায়।

এটাই আমি চাইছিলাম। সারেং ও তার দল চোখের আড়াল হওয়া মাত্র রওনা হলাম আমরা। ওরা কিছু টের পাওয়ার আগেই পৌঁছে গেলাম নৌকাটার কাছে। ডাঙায় নামা লোকটা একটা গাছের নিচে বসে ঝিমুচ্ছে। আমরা একেবারে কাছে না পৌঁছা পর্যন্ত কিছু টের পেলো না সে। যখন পেলো তখন আর কিছু করার নেই তার।

তড়াক করে উঠে দাঁড়াতে গেল লোকটা। কিন্তু তার আগেই এগিয়ে গেছেন ক্যাপ্টেন। বন্দুকের বাঁট দিয়ে প্রচণ্ড একটা ঘা মারলেন তার মাথায়। কাটা কলা গাছের মতো ঝুপ করে পড়ে গেল লোকটা। নৌকায় বসা লোকটার দিকে ফিরলেন এবার ক্যাপ্টেন। 'আত্মসমর্পণ করবে না লাশ হয়ে যাবে?'

সঙ্গীর দুরবস্থা দেখেছে লোকটা। তাছাড়া এ হচ্ছে ক্যাপ্টেনের বলা সেই তিন ভালো লোকের একজন। সঙ্গে সঙ্গে আত্মসমর্পণ করলো সে।

এদিকে ফ্রাইডে আর মেট চমৎকার চালিয়ে যাচ্ছে খেলা। এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ের মাথায় উঠে চিৎকার করে আর সাড়া দিয়ে বহুদূরে নিয়ে গেছে সারেং আর তার চেলাদের। এতক্ষণে ক্লান্তি আর হতাশার শেষ সীমায় পৌঁছে যাওয়ার কথা ওদের। সন্ধ্যাও হয়ে এসেছে। আর একটু পরেই পুরো অন্ধকার হয়ে যাবে চারদিক। অতএব, আশা করা যায় শিগগিরই ওরা ফিরে আসবে খাঁড়ির কাছে।

অন্ধকার হয়ে গেছে অনেক আগে, ফ্রাইডে এবং মেট তাদের দায়িত্ব শেষ করে ফিরে এসেছে। কিন্তু সারেং ও তার স্যাঙাৎদের পাত্তা নেই। এই অন্ধকারে পথ চিনে খাঁড়ি পর্যন্ত আসা সোজা কথা নয়–বিশেষ করে পয়লা বার দ্বীপে এসেছে এমন লোকের পক্ষে। ইতিমধ্যে ভাটা লেগে গেছে। ওদের নৌকা এখন পুরোপুরি চরের ওপর উঠে আছে।

অবশেষে এলো ওরা। নৌকা চরে উঠে আছে, আর সঙ্গী দুজন অদৃশ্য হয়ে গেছে দেখে হতভম্ব হয়ে গেল। দু'একজন তো বলেই ফেললো, 'ভূতুড়ে দ্বীপ এটা, এখান থেকে যত তাড়াতাড়ি ভাগা যায় ততই মঙ্গল।'

নৌকার কাছে দাঁড়িয়ে আবার কিছুক্ষণ 'অহোয়···, অহোয়,' করে চিৎকার করলো বিদ্রোহীরা। সঙ্গী দুজনের নাম ধরে ডাকাডাকি করলো। কোনো জবাব না

পেয়ে হতাশ হয়ে নৌকায় উঠলো সবাই। সম্ভবত জিরিয়ে নিতে চায়।

এবার আমাদের পালা। আমি ছাড়া দলের আর সবাই এক্ষুণি আক্রমণ করার পক্ষে। কিন্তু আমার ইচ্ছে অন্যরকম। আমি চাইছি যথাসম্ভব কম লোক হত্যা করে জাহাজ দখল করতে। কারণ, চালানোর লোক না থাকলে জাহাজ দখল করাটা অর্থহীন হয়ে পড়বে। তাছাড়া আমার দলের এক জনকেও হারাতে চাই না আমি। ভাবছি, কোনো মতে যদি ওদের দলটাকে ভাগ করে ফেলা যায়।

ঝোপ ঝাড়ের আড়ালে আড়ালে কিছুটা এগোলাম আমরা। তারপর ফ্রাইডে এবং ক্যাপ্টেনকে বললাম, 'হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যান আপনারা। আমরা আসছি পেছন পেছন।'

বেশিদূর এগোতে পারেনি ওরা এমন সময় সারেং মশাই দুজন সঙ্গী নিয়ে নেমে এলো নৌকা থেকে। কিছু দেখেছে, নয়তো শুনেছে–নিদেনপক্ষে আন্দাজ করেছে। আসল বজ্জাতটাকে হাতের এত কাছে পেয়ে ধৈর্য ধরা কঠিন হয়ে পড়লো ক্যাপ্টেনের পক্ষে। ওরা আরেকটু এগিয়ে আসতেই ঝট করে উঠে দাঁড়িয়ে গুলি ছুঁড়লেন তিনি। ফ্রাইডেও বসে রইলো না।

সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল সারেং। অন্য একজন আহত হয়ে পড়ে গেল তার পাশে। আর তৃতীয়জন দে-দৌড়।

আর দেরি করা উচিত হবে না। পুরো সেনাবাহিনী নিয়ে রওনা হলাম আমি।

অন্ধকারের আড়াল নিয়ে এগোলাম। বিদ্রোহীরা যে দুজনকে নৌকায় রেখে গিয়েছিলো, তাদের একজন আত্মসমর্পণ করেছিলো আমাদের কাছে–ও এখন আমাদের পক্ষ হয়ে লড়ছে। ওকে নিযুক্ত করলাম আলোচনাকারী হিসেবে। কি কি বলতে হবে না হবে শিখিয়ে দিলাম।

'টম স্মিথ, টম স্মিথ,' জোর গলায় হাঁক দিলো সে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিলো টম স্মিথ। 'কে? রবিনসন নাকি?'

'হ্যাঁ, টম স্মিথ। অস্ত্র ফেলে দিয়ে আত্মসমর্পণ করো তোমরা। নইলে, ঈশ্বরের দোহাই বলছি, সব কজন মারা যাবে।'

'কাদের কাছে আত্মসমর্পণ করবো? কোথায় তারা?'

'এখানেই আছে। আমাদের ক্যাপ্টেন। পঞ্চাশ জন লোক রয়েছে তাঁর সাথে। সারেং মারা গেছে। উইল ফ্রাই আহত, আমি বন্দী। যা বলছি তা না করলে তোমরাও মরবে।'

'আমাদের কোনো ক্ষতি করা হবে না তো?'

'তুমি আত্মসমর্পণের প্রতিশ্রুতি দিলে আমি জিজ্ঞেস করতে পারি ক্যাপ্টেনকে,' বলে ক্যাপ্টেনের দিকে ফিরলো রবিনসন।

এবার গলা চড়ালেন ক্যাপ্টেন, 'স্মিথ, আমার গলা চিনতে পারছো? এক্ষুণি অস্ত্র নামিয়ে রাখো। উইল অ্যাটকিন্‌স ছাড়া আর কারো কোনো ভয় নেই।' উইল অ্যাটকিন্‌স বিদ্রোহের শুরুতে ক্যাপ্টেনের দিকে প্রথম অস্ত্র তুলেছিলো। দুর্ব্যবহার করতেও ছাড়েনি।

হাউ মাউ করে উঠলো উইল অ্যাটকিন্‌স, 'দোহাই, ক্যাপ্টেন, স্যার, মাফ করে দেন আমাকে। জীবনে আর কোনো দিন করবো না এমন কাজ। ওরাও তো

আমার মতোই খারাপ, ওদের মাফ করে দিলেন আমাকে করবেন না?'

'ঠিক আছে,' বললেন ক্যাপ্টেন, 'গভর্ণরের দয়ার ওপর ছেড়ে দিচ্ছি সেটা। উনি যা ভালো বোঝেন করবেন। এখন অস্ত্র সমর্পণ করো।'

গভর্ণর! গভর্ণর আসলো কোত্থেকে? ক্যাপ্টেনের চাল নাকি কোনো? না। একটু পরেই বুঝতে পারলাম, আমাকেই গভর্ণর হিসেবে উল্লেখ করছেন ক্যাপ্টেন।

অস্ত্র নামিয়ে রাখলো লোকগুলো। আলোচনাকারী লোকটার নেতৃত্বে দুজনকে পাঠালাম ওদের বেঁধে ফেলার জন্যে। কয়েক মিনিটের মধ্যে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে চলে এলো আমাদের।

এবার মেরামত করতে হবে নৌকাটা। তারপর যেতে হবে জাহাজে। ওখানে গিয়ে আবার কি পরিস্থিতির মখোমুখি হতে হয় কে জানে?

বন্দীদের সঙ্গে আলাপ করতে লাগলেন ক্যাপ্টেন, আমি সরে এলাম এক পাশে। আমার চেহারা এখনো দেখেনি ওরা। আমিও দেখাতে চাই না। গভর্ণরের পোশাক আশাক দেখে হয়তো ভিমরি খাবে।

মনে হচ্ছে আমার মুক্তির দিন এসে গেছে। বন্দী নাবিকগুলো যদি স্বেচ্ছায় সহযোগিতা করে তা হলে আর কোনো চিন্তা নেই। জাহাজ দখল করা কঠিন কিছু হবে না।

ক্যাপ্টেনকে ডাকার জন্যে পাঠালাম মেট-কে। দূর থেকেও স্পষ্ট শুনতে পেলাম লোকটার কথা। বলছে, 'ক্যাপ্টেন, গভর্ণর আপনাকে ডাকছেন।'

'হিজ এক্সেলেন্সিকে বলো, এক্ষুণি আসছি আমি,' জবাব শোনা গেল ক্যাপ্টেনের।

গভর্ণর সম্পর্কে আবছা একটা ধারণা পেয়েছে বন্দীরা। এবার বোধহয় ভাবলো, পঞ্চাশ জন অনুচর নিয়ে কোথাও বসে আছেন গভর্ণর। ভয়টাকে ভক্তিতে রূপান্তরিত করতে হবে। ক্যাপ্টেনকে খুলে বললাম আমার পরিকল্পনা—পরদিন রাতে আমরা জাহাজ দখল করতে যাবো, কিন্তু তার আগে আরেকটু ভড়কে দিতে হবে বন্দী নাবিকদের।

ঠিক হলো উইল অ্যাটকিন্‌স আর অন্য দুজন বদ নাবিককে আলাদা করে গুহায় নিয়ে যাবে ফ্রাইডে এবং মেট। কারণ হিসেবে ক্যাপ্টেন অন্যদেরকে জানাবেন, গভর্ণরের ইচ্ছায় কারাগারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওদের; সম্ভবত কাল সকালে ফাঁসি দেয়া হবে। বাকিদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে আমার গ্রামের বাড়িতে। জানানো হবে, এটাও গভর্ণরের ইচ্ছায় হচ্ছে। এবং ওখানে ওদের আচরণ দেখে ওদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবেন গভর্ণর। এই পরিকল্পনা অবিলম্বে বাস্তবায়ন করা হলো।

সকালে ক্যাপ্টেনকে পাঠালাম গ্রামের বাড়িতে। ওখানকার বন্দী ক'জনের সঙ্গে আলাপ করে আমাদের পক্ষ হয়ে জাহাজে উঠতে রাজি করাবেন ওদের। তা না হলে ওদেরকেও হয় বাকি তিনজনের মতো ফাঁসিতে ঝুলতে হবে নয়তো ইংল্যাণ্ডে নিয়ে গিয়ে কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেয়া হবে। সেক্ষেত্রেও ফাঁসি এড়ানো সম্ভব হবে না ওদের পক্ষে। কারণ বিদ্রোহের একমাত্র সাজা মৃত্যুদণ্ড। আর

গভর্নরের কথামতো চললে তিনি হয়তো মাফ করে দেবেন তাদের।

আনন্দের সঙ্গে রাজি হলো ওরা। আসলে এছাড়া আর কিছু করারও ছিলো না ওদের। তবু সাবধানের মার নেই, তাই ক্যাপ্টেনকে বললাম, 'আপনি যান, গিয়ে আপনার সঙ্গে কাজ করার জন্যে পাঁচজনকে বেছে নিন। দু'জনকে ওখানেই থাকতে বলবেন, যে কোনো মুহূর্তে গভর্নরের প্রয়োজন পড়তে পারে ওদের। আর তিনজনকে জিম্মি হিসেবে পাঠিয়ে দেবেন আমার দুর্গে। আর জানিয়ে দেবেন, অন্যরা ঠিক মতো কাজ না করলে, পালালে বা আবার বিশ্বাসঘাতকতা করলে ফাঁসি দেয়া হবে এই তিনজনকে।'

প্রস্তুতি পর্ব শেষ। ফুটো নৌকাটা মেরামত করা হয়ে গেছে। দুটো নৌকাই যাত্রার জন্যে তৈরি। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রও তোলা হয়ে গেছে। জাহাজ উদ্ধারে নেতৃত্ব দেবে ক্যাপ্টেন। আমি আর ফ্রাইডে থাকছি দ্বীপে। সাত-সাতজন বিদ্রোহী বন্দীকে বিনা পাহারায় রেখে যাওয়া ঝুঁকিপূর্ণ।

আমি যখন ওদের সামনে উপস্থিত হলাম তখন আমাকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো গভর্নরের পাঠানো লোক হিসেবে। জিম্মিদের পাহারা দেবো আমরা।

প্রায় মাঝরাতে রওনা হয়ে গেল নৌকাদুটো। একটু পরেই মিশে গেল রাতের অন্ধকারের সাথে। জাহাজ দখলের কাহিনী আমি পরে শুনেছি ক্যাপ্টেনের কাছে–

জাহাজের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে নৌকা দুটো। রবিনসনকে তাদের উপস্থিতি ঘোষণা করতে বললেন ক্যাপ্টেন। কি কি বলতে হবে তা-ও শিখিয়ে দিলেন। সেই মত রবিনসন চিৎকার করে উঠলো, 'অহোয়...আমরা এসে গেছি।'

জাহাজ থেকে জবাব এলো, 'এত দেরি হলো কেন?'

'ওদের খুঁজতে খুঁজতে দেরি হয়ে গেল।'

যতক্ষণ না নৌকা দুটো জাহাজের গায়ে ভিড়লো ততক্ষণ এরকম চিৎকার করে কথাবার্তা চলতে লাগলো। অবশেষে ক্যাপ্টেনের নৌকা ভিড়লো জাহাজের গায়ে। অন্যটা এগোলো সামনের দিকে।

ক্যাপ্টেন এবং মেটই প্রথম উঠলেন জাহাজে। দুজনের হাতে বন্দুক তৈরি। ডেকে পা দিতেই সামনে পড়লো সেকেণ্ড মেট আর জাহাজের ছুতোর মিস্ত্রী। দুজনকেই বাঁটের আঘাতে শুইয়ে ফেললেন তাঁরা। তারপর জাহাজে উঠে এলো অন্যরা। প্রায় নিঃশব্দে দখল করে নিলো মেইন কোয়ার্টার ডেক। নিচে আছে যারা তারা যেন ওপরে উঠতে না পারে সেজন্যে বন্ধ করে দিলো হ্যাচগুলো।

জাহাজের সামনে দিয়ে উঠলো অন্য নৌকার আরোহীরা। ফোক্যাসলটা দখল করলো। রান্নাঘরের চিমনিটাও বন্ধ করে দেয়া হলো। তিনজনকে বন্দী করা হলো সেখান থেকে।

ডেকের ওপরটা দখল হয়ে যেতে ক্যাপ্টেন রাউণ্ডহাউসটার দরজা ভাঙ্গার নির্দেশ দিলেন মেট এবং অন্য দুজনকে। জাহাজের নতুন বিদ্রোহী ক্যাপ্টেন অবস্থান নিয়েছে সেখানে। একটা শাবল নিয়ে রাউণ্ড হাউসের দরজা চাড় দিতে লাগলো মেট। একটু পরেই খুলে এলো দরজা। বিদ্রোহী ক্যাপ্টেন দুই সঙ্গী নিয়ে তৈরি ছিলো। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে গুলি করলো ওরা। আহত হলো মেট আর

তার সাথের দুজন। ভাগ্য ভালো মারা গেল না একজনও।

সাহায্যের জন্যে চিৎকার করে উঠলো মেট। একই সাথে পিস্তল খুললো কোমর থেকে। গুলি করলো নতুন ক্যাপ্টেনের মাথা সোজা। মুখের ভেতর দিয়ে ঢুকে কানের কাছ দিয়ে বেরিয়ে এলো গুলি। সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল লোকটা। আত্মসমর্পণ করলো বাকিরা। দখল হয়ে গেল জাহাজ। মারা গেল এ একজনই। আহতও এ তিনজন।

পর পর সাতটা গুলির শব্দ ভেসে এলো জাহাজ থেকে। বুঝলাম দখল হয়ে গেছে জাহাজ। ক্যাপ্টেনকে এরকমই নির্দেশ দিয়েছিলাম আমি–জাহাজ দখল হয়ে গেলে সাতবার গুলি ছুঁড়বে। আর কিছু করার নেই। গত দিনটা প্রচণ্ড পরিশ্রম গেছে। ক্লান্তিতে ভেঙে আসছে শরীর। মাটিতে শুয়ে ঘুমিয়ে গেলাম।

একটা গুলির শব্দে ঘুম ভাঙলো আমার। তারপর শুনলাম, কে যেন ডাকছে, 'গভর্নর, গভর্নর।' চিনতে পারলাম গলাটা। ক্যাপ্টেন। ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলেন আমাকে। বললেন, 'বন্ধু, এ যে আপনার জাহাজ। আমরা এবং ওতে যা যা আছে সবই আপনার।'

চোখ পিট পিট করে তাকালাম জাহাজটার দিকে। তীর থেকে মাত্র আধ মাইল দূরে নিয়ে আসা হয়েছে সেটাকে। আমার হাতের নাগালের মধ্যে এসে গেছে মুক্তি!

ডিসেম্বরের উনিশ তারিখে রওনা হলাম আমরা। জাহাজের ক্যালেণ্ডার দেখে জানতে পারলাম, সালটা ১৬৮৬। দ্বীপে ওঠার ঠিক আটাশ বছর দুই মাস উনিশ দিন পর। ফ্রাইডেও যাচ্ছে আমার সাথে। ভীষণ খুশি ও। ক্যাপ্টেনের সঙ্গে পরামর্শ করে, বিদ্রোহের সাথে মনে প্রাণে জড়িত কয়েকজনকে দ্বীপে রেখে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। অস্ত্রশস্ত্র, গোলা-বারুদ যথেষ্ট পরিমাণেই দিয়ে গেছি ওদের। কিছু খাবার-দাবারও দিয়ে গেছি। কয়েকদিন পরেই স্প্যানিশ লোকগুলোও হয়তো এসে পড়বে। আমার তো এক প্রস্থ যন্ত্রপাতি ছিলোই আরো কিছু যন্ত্রপাতি দিয়ে গেলাম।

১৬৮৭ সালের ১১ জুন, ইংল্যাণ্ডে ফিরে এলাম আমি।

একুশ

ত্রিশ বছর পর আবার ইংল্যাণ্ড! আমার সাধের ইংল্যাণ্ড! কিন্তু এর ভেতরে ...টা এত বদলে গেছে যে কিচ্ছু চিনতে পারছি না। আমি যেন কোনোদিন ... না এখানে! বাবা, মা, ভাইরা মারা গেছে অনেক আগে। দুই বোন আর ...র দুটো বাচ্চা ছাড়া আপনজন বলতে আর কেউ বেঁচে নেই। এক কথায়, ... করার মতো একটা লোকও নেই আমার সামনে। পরিবেশ পরিস্থিতি সব ...গছে। সবই কেমন যেন নতুন। এই নতুন পৃথিবীতে বসতি করতে হলে

আবার নতুন করে শুরু করতে হবে সব।

প্রথমবার আমাদের জাহাজে এবং পরে স্প্যানিশ জাহাজটায় যে টাকা পয়সা পেয়েছিলাম, সব নিয়ে এসেছি সঙ্গে। যে জাহাজে করে ফিরে এসেছি সে জাহাজের মালিকরাও কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ দুশো পাউণ্ড উপহার দিয়েছেন আমাকে। কিন্তু ক'দিন চলবে এই সামান্য টাকায়? সুতরাং লিসবন যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম আমি। ব্রাজিলে যে প্ল্যান্টেশনটা রেখে গিয়েছিলাম সেটার সম্পর্কে কোনো খোঁজ পাওয়া যায় যদি।

পরের বছর এপ্রিল মাসে লিসবনে পৌঁছুলাম। ফ্রাইডেও এসেছে আমার সাথে।

খোঁজখবর শুরু করলাম আমার সেই ক্যাপ্টেন বন্ধুর–যিনি উদ্ধার করেছিলেন যুরিকে আর আমাকে, যার জাহাজে ব্রাজিলে গিয়েছিলাম। অনেক খোঁজাখুঁজির পর পাওয়া গেল তাঁকে। বুড়ো হয়ে গেছেন ভদ্রলোক। ছেলেকে জাহাজের দায়িত্ব দিয়ে অবসর নিয়েছেন। আমাকে চিনতেই পারলেন না প্রথমে। সব কথা মনে করিয়ে দিতে অবশেষে চিনলেন।

বহুদিন পর আলাপ শুরু করলাম দু'বন্ধু। আমার সমস্ত কাহিনী শোনালাম তাঁকে। উনিও শোনালেন তাঁর কথা। শেষে আমি জিজ্ঞেস করলাম আমার খামারের খবর।

'শেষবার ব্রাজিলে গিয়েছি ন'বছর আগে', জানালেন বৃদ্ধ। 'তোমার বিষয়-আশয় দেখাশোনার জন্যে যাদেরকে ট্রাস্টি নিয়োগ করেছিলে, দু'জনই মারা গেছে। তবু আমার বিশ্বাস ভালোই চলছে তোমার প্ল্যান্টেশন। বহুদিন কোনো খোঁজ না পেয়ে সবাই ধরে নেয়, জাহাজডুবিতে মৃত্যু হয়েছে তোমার। তখন তোমার ট্রাস্টিরা সরকারী অর্থ-বিষয়ক কর্মকর্তার হাতে তোমার লাভের টাকার দায়িত্ব তুলে দেয়। কোনোদিন যদি তুমি তা দাবি না করতে তাহলে, এক-তৃতীয়াংশ যেতো রাজার তহবিলে আর বাকি দুই ভাগ খরচ করা হতো জনহিতকর কাজে।'

কথাগুলো শুনে অনেক স্বস্তি বোধ করলাম আমি। জিজ্ঞেস করলাম, 'আমি তো আপনাকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করে গেছিলাম। তবু ও রকম করলো কেন ট্রাস্টিরা?'

'কারণ তুমি যে মারা গেছো তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। প্রথম ছয় বছর অবশ্য তোমার ট্রাস্টিরা লাভের টাকা পুরোই দিয়েছে আমাকে। সব হিসেব আছে আমার কাছে। দেখাবো তোমাকে।'

কয়েকদিন পর, আমার এই প্রাগৈতিহাসিক বন্ধু হিসেবটা দেখালেন। দেখা গেল, চারশো দশটা সোনার মইদোর* পাই আমি তাঁর কাছে।

দেরাজ খুলে একটা থলে বের করলেন বৃদ্ধ। একশো ষাট মইদোর দিলেন আমার হাতে। বললেন, 'আপাতত এই ক'টাকাই আছে আমার কাছে। বাকিটা খরচ করে ফেলেছি। চিন্তা কোরো না, বন্ধু, আমার ছেলে ফিরে এলেই কড়ায়

(১ সোনার মইদোর=২৭ শিলিং প্রায়।)

গণ্ডায় শোধ করে দেবো সব।'

ভদ্রলোকের সততা দেখে মুগ্ধ হলাম আমি। প্রথমে তো চেনেননি, পরেও যদি না চিনতেন, কি করতে পারতাম আমি? চারশো দশ সোনার মইদোর, কম কথা নয়।

একশো মইদোর নিলাম আমি। বাকিগুলো ফিরিয়ে দিলাম তাঁকে। বললাম, 'বন্ধু, খামারটা যদি ফিরে পাই তাহলে এই একশো মইদোরও ফিরিয়ে দেবো আপনাকে।'

ব্রাজিলে না গিয়েও প্ল্যান্টেশন ফিরে পাওয়ার জন্যে কি নিয়মে দাবিনামা পেশ করতে হবে সে সম্পর্কে বিস্তারিত জানালেন বৃদ্ধ। সে মতোই কাজ করলাম আমি। সাত মাসেরও কম সময়ের মধ্যে পুরো হিসেব পাঠিয়ে দিলো আমার ট্রাস্টিদের উত্তরাধিকারীরা। একই সঙ্গে তারা বারোশো বাক্স চিনি, আর আটশো রোল তামাকও পাঠালো। অবশিষ্ট টাকা পাঠালো সোনার আকারে।

পাঁচহাজার স্টার্লিংয়েরও বেশি টাকার মালিক এখন আমি। তাছাড়া ব্রাজিলে বার্ষিক এক হাজার স্টার্লিং আয়ের একটা এস্টেটেরও মালিক। এত টাকা, এত আনন্দ আমি রাখবো কোথায়?

প্রথমেই আমি আমার ক্যাপ্টেন বন্ধুর একশো মইদোর ফিরিয়ে দিলাম। ভদ্রলোক এত ভালো আর সৎ যে, তাঁর জন্যে কিছু করার ইচ্ছে হলো আমার। আমার আয় থেকে জীবনের শেষ দিনটা পর্যন্ত যেন তিনি বছরে একশো মইদোর পান সে ব্যবস্থা করলাম। তাঁর মৃত্যুর পর তার ছেলে পাবে পঞ্চাশ মইদোর করে।

এরপর আমার চিনি এবং তামাক বিক্রি করে যে টাকা পেলাম তা নিয়ে ফিরে এলাম ইংল্যাণ্ডে। ভাইয়ের বাচ্চা দুটোকে মানুষ করার ভার নিলাম। বড়টার সামান্য কিছু ভূ-সম্পত্তি ছিলো। যথাযথ তদারকির মাধ্যমে পরিচালনা করতে লাগলাম সে-সম্পত্তি। ধীরে ধীরে চমৎকার একজন ভদ্রলোক হিসেবে গড়ে উঠলো ছেলেটা। নিজে থেকে আরো কিছু দিয়ে সংসারে প্রতিষ্ঠিত করলাম তাকে। অন্যজন একটু বড় হওয়ার পর একটা জাহাজে লাগিয়ে দিলাম। বছর পাঁচেকের মধ্যে দক্ষ নাবিক হয়ে উঠলো সে। একটা জাহাজ কিনে দিলাম ওকে। এই ছেলেটা বুড়ো বয়সে আমার অভিযানে যাওয়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নের সহায় হয়েছিলো।

ইতিমধ্যে বিয়ে করেছি আমি। তিনটে বাচ্চা হয়েছে, দুটো ছেলে আর একটা মেয়ে। কিন্তু কিছুদিন পরেই মারা গেলেন আমার স্ত্রী। প্রায় একই সময় একটা সফল যাত্রা শেষে স্পেন থেকে ফিরে এলো আমার ছোট ভাস্তে। ব্যবসার জন্যে পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে যেতে রাজি করালো আমাকে। ১৬৯৪ সালের কথা এটা। ওখান থেকে ফেরার আগে ইংল্যাণ্ডের নতুন উপনিবেশ, আমার সেই অভিশপ্ত দ্বীপে গেলাম একবার। দ্বীপে রেখে আসা বিদ্রোহী নাবিকগুলো আছে এখনো। স্প্যানিশগুলোও চলে এসেছে ফ্রাইডেদের দেশ—অর্থাৎ মূল ভূ-খণ্ড থেকে। আমরা চলে যাওয়ার পর কি কি ঘটেছে এ পর্যন্ত শুনলাম ওদের কাছে। হতভাগ্য স্প্যানিশগুলোর সঙ্গে কিভাবে দুর্ব্যবহার শুরু করে বিদ্রোহীরা; নিরস্ত্র স্প্যানিশগুলো সহ্য করতে করতে কি করে এক সময় হিংসার পথ বেছে নেয়, কি

করে মিত্রতা হয় ইংরেজ এবং স্প্যানিশদের ভেতর, আবার ঝগড়া, আবার মিত্রতা—রীতিমতো ইতিহাস একটা। বিশেষ করে ক্যারিবীয়দের সঙ্গে লড়াইয়ের ঘটনাগুলো—রোমহর্ষক একেবারে। কি করে ওদের পাঁচজন মূল ভূ-খণ্ডে অভিযান চালিয়ে এগারোজন পুরুষ এবং পাঁচজন মহিলা জংলীকে ধরে এনেছিলো সে কাহিনীও শুনলাম। এতক্ষণে বুঝলাম, দ্বীপে আসার পর পনেরো বিশটা বাচ্চা ছেলেমেয়ে দেখেছি কেন।

প্রায় কুড়ি দিন থাকলাম এখানে। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র—যেমন, খাবার-দাবার, গুলিবারুদ, অস্ত্রপাতি, কাপড়-চোপড় ইত্যাদি দিয়ে গেলাম সাধ্যমতো। ইংল্যাণ্ড থেকে আনা দু'জন কাজের লোককেও রেখে গেলাম—একজন ছুতোর মিস্ত্রী আর একজন কামার। তাছাড়া ওদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে দ্বীপের কোন্ অংশটার মালিক হবো আমি তা-ও ঠিক করলাম। খুশিমনেই ওরা প্রতিবেশী হিসেবে গ্রহণ করলো আমাকে।

ব্রাজিলে গেলাম তারপর। সেখান থেকে একটা ছোট জাহাজে করে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রসহ আরো কিছু লোক পাঠিয়ে দিলাম দ্বীপে। সাতজন মহিলাকে পাঠালাম। ঘরের কাজে সাহায্য করতে পারবে ওরা। অবিবাহিতরা ইচ্ছে করলে স্ত্রী হিসেবেও গ্রহণ করতে পারবে ওদের। পাঁচটা গরু—তার মধ্যে তিনটে বাছুরওয়ালা, কয়েকটা ভেড়া এবং শুকরও পাঠিয়ে দিলাম। পরের বার যখন আসি দ্বীপে তখন সংখ্যায় অনেক বেড়ে গিয়েছিলো এগুলো।

পরে আরো অনেকবার এসেছি দ্বীপে, আরো অনেক রোমহর্ষক ঘটনার মুখোমুখি হতে হয়েছে আমাকে। ভবিষ্যতে কোনো এক সময় হয়তো বলবো সেসব।

fgsgg